উপন্যাস

সূর্য-দীঘল বাড়ি

–আবু ইসহাক

সূর্য-দীঘল বাড়ি

আবু ইসহাক

ভূমিকা

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসের মৌলিকতা ও অভিনবত্ব সম্পর্কে আমাদের জানতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন উপন্যাস কাকে বলে বা উপন্যাস কী? এর গঠনকৌশল কী ইত্যাদি। সেই সঙ্গে আমাদের জানতে হবে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে। আবু ইসহাক 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' রচনায় কতটুকু সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তারও পরিচিতি জানতে হবে। এজন্যই পরবর্তী পাঠগুলি পরিকল্পিত হয়েছে।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- উপন্যাসের শব্দগত অর্থ এবং উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- উপন্যাসের গঠন কৌশল ও উপাদান সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিষয় ও আঙ্গিক ভেদে উপন্যাস কত প্রকার তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাস সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধের মতো উপন্যাসও একটি শিল্প আঙ্গিক বা Form। সাহিত্যে জীবনকে উপস্থাপন করা হয়। জীবনকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কারণেই আঙ্গিক বৈচিত্র্যের উদ্ভব।

আমরা প্রায় সবাই উপন্যাস পড়ি। এর কারণ উপন্যাসের প্রতি এক ধরনের সহজাত আকর্ষণ। এ আকর্ষণ গল্পের আকর্ষণ– মানব জীবনের গল্প শোনার আকর্ষণ। গল্প শুনতে এবং বলতে মানুষ ভালোবাসে সেই আদিম যুগ থেকেই। কিন্তু সেকালের আর একালের গল্পের রকমফের অনেক। মানুষ এক কালে যখন যৌথ জীবনে শিকারের সন্ধানে ফিরেছে তখন - শিকারের গল্প বলেছে এবং শুনেছে। সেই শোনা ও জানা গল্পকে পাহাড়ের গুহায় অঙ্কিত করে চিরকাল সে অভিজ্ঞতাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখেছে। তারপর সভ্যতার চাকা অনেকটা পথ অতিক্রম করলে মানুষ লিখতে ও পড়তে শিখেছে। মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে লিখে প্রকাশ করেছে। দেবতা-নির্ভর মানুষ দেবতার গুণকীর্তন করে কাব্য-কবিতা-নাটক ইত্যাদি লিখেছে। মানুষের ভয় যেমন দেবতাকে তেমন ভয় অপদেবতাকে। তাই এর সঙ্গে ভূত-প্রেত, জ্বীন, পরীর আলৌকিক কাহিনীও রচনা করেছে। আধুনিক বোধ ও মননের যুগে মানুষ দেব-দেবতা, ভূতপ্রেতের কেচ্ছা-কাহিনীর বদলে নিজের জীবনের কথা অর্থাৎ মানুষের কথা লিখেছে।

তবে মানুষের কথা বলার সময় প্রথমেই এসেছে রাজা-বাদশা আর ক্ষমতাবানদের কথা। কিন্তু তাদের কথাও চিরকাল মানুষের ভালো লাগেনি। অনিবার্যভাবে সাধারণ মানুষের কথা সাহিত্যে এসেছে। সাধারণ মানুষের প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, সুখ-দুখ, ঈর্ষা-এষণার কথা লিখতে গিয়ে জীবনবোধ প্রকাশের সুবিধাজনক নানা শিল্পরূপ বা Form-কে মানুষ উদ্ভাবন করেছে।

কবিতা, নাটক, ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস অনেক পরবর্তী কালের সৃষ্টি। উপন্যাসে জীবন পরিব্যাপ্ত ও বিস্তৃত। কবিতায় যেমন জীবনের মুহূর্তের ঘটনা অথবা উপলব্ধি হতে পারে বিষয় অথবা নাটকে দ্বন্দ্বময় জীবন সংঘাতের কারণটি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত হতে পারে, ছোটগল্পে জীবনের অনির্বাণ ও প্রদীপ্ত কিছু ঘটনা অথবা বোধকে বিকশিত করা যায়। সেক্ষেত্রে উপন্যাস জীবনের কোনো খন্ডাংশকে নয়, জীবনের সমগ্রতাকে ফুটিয়ে তোলে। জীবনের কোন্ দিকটি উপন্যাসের বিষয় নয়, তা বলা সম্ভব নয়।

উপন্যাস শব্দের অভিধানিক অর্থ উপাখ্যান, আনন্দদায়ক কাহিনী, বৃত্তান্ত, প্রস্তাব ইত্যাদি। উপন্যাস শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি এরকম– উপ-নি-অস+ঘঞ। উপন্যাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ Novel. Novel সম্পর্কে বলা হয়েছে "... the interpretation of human life by means of fictious narrative prose". অর্থাৎ নভেল হচ্ছে বিবৃতিমূলক গদ্যে সম্ভাব্য কল্পিত জীবনের ব্যাখ্যা।

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের কথা এ সমাজেরই মানুষের কথা। সমাজের এ মানুষের জীবন কথার অর্থ সমাজের অন্য মানুষদের সঙ্গে তার সম্পর্ক, নানা টানাপোড়েন ও বিচিত্র দ্বন্দ্ব। তাই মানুষের কাহিনী বা কথা বলতে গেলেই নানা রকম চরিত্রের কথা এসে যায়। এ কারণেই উপন্যাসে চরিত্র অঙ্কন একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

যে জীবনের কথা ঔপন্যাসিক বলবেন সে জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিকোণ বা দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের থাকে। সেই দৃষ্টিকোণ বা দৃষ্টিভঙ্গিই লেখকের জীবনাদর্শ। জীবনকে দেখার-উপলব্ধি করার অথবা বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির মধ্যেই লেখকের জীবন-আদর্শকে খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসের নেপথ্যে লেখককে এগুলোর মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ওপরের আলোচনাটিকে আমরা সংক্ষিপ্ত করলে উপন্যাসের চারটি উপাদানকে আমরা খুঁজে পাই। এগুলো হচ্ছে–

১) কাহিনী বা প্লট
২) চরিত্র বা Character
৩) ভাষা
৪) লেখকের জীবনাদর্শ

বিষয় ও আঙ্গিক বিচার করে উপন্যাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. সামাজিক উপন্যাস
২. ঐতিহাসিক উপন্যাস
৩. পৌরাণিক উপন্যাস
৪. রাজনৈতিক উপন্যাস
৫. আঞ্চলিক উপন্যাস

১. সামাজিক উপন্যাস– যে উপন্যাসে সমাজই প্রধান অর্থাৎ ঔপন্যাসিক যে উপন্যাসে সমাজের বিষয়, কাহিনী, চরিত্র ও তাদের পারস্পরিক ও সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেন –তাই সামাজিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' সামাজিক উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস– ইতিহাসের বিষয়, কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে যে উপন্যাস রচিত হয় তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের বিবরণ মাত্র নয়। ইতিহাসের মূল সত্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনবোধ ও কল্পনাকে প্রসারিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। রুশ ভাষায় লিখিত টলস্টয়ের 'ওয়ার এ্যাণ্ড পিস' একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৩. পৌরাণিক উপন্যাস– পুরাণের বিষয় ও কাহিনী অবলম্বনে যে উপন্যাস রচিত হয় তাকে পৌরাণিক উপন্যাস বলে।

৪. রাজনৈতিক উপন্যাস– যে উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনা ও কার্যকলাপ প্রাধান্য পায় তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে। সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।

৫. আঞ্চলিক উপন্যাস– কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষ, তাদের জীবন যাপনের বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে যে উপন্যাস লিখিত হয় তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উপন্যাসের এ বিভাগ ছাড়াও অনেক কৌশল ও জীবনবিন্যাসের রূপ-রীতি অনুযায়ী আরও বিভিন্নভাবে শ্রেণিভূক্ত করা যায়। যেমন– কাব্যধর্মী উপন্যাস, ভ্রমণ উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, রহস্যোপন্যাস ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাস

আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিতা থাকলেও বাংলা গদ্য কোন রূপ লাভ করেনি। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৮০১ সালে এ কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। তখন কোনো বাংলা গদ্য বই প্রচলিত ছিল না। পণ্ডিতদের দিয়ে বই রচনা শুরু হয়। ফলে বাংলা গদ্যচর্চার পথ প্রশস্ত হয়। সমসাময়িক কালে বাংলায় লিখিত সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতে থাকে। অচিরেই বাংলা গদ্যচর্চার বিস্তৃতি ঘটে।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থটি। এ গ্রন্থেই প্রথম উপন্যাসের কিছু লক্ষ্মণ প্রকাশিত হয়। এজন্যই 'আলালের ঘরের দুলাল'কেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়। তবে 'আলালের ঘরের দুলালে'র পূর্বে কিছু আখ্যায়িকাজাতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস', হ্যানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই উপন্যাসের লক্ষণ লক্ষ করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ ও সার্থক উপন্যাস রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সনে। ইংরেজি সাহিত্যমুগ্ধ বাঙালি পাঠক এই প্রথম বাংলায় লিখিত উপন্যাসের প্রকৃত মাধুর্য উপলব্ধি করলেন। কাহিনীর যথার্থ বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, আঙ্গিক সচেতনতা সর্বোপরি যথার্থ ভাষার প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেই প্রথম লক্ষ করা যায়। তবে সমকালের জীবন বঙ্কিমচন্দ্রকে কমই আকৃষ্ট করেছিল। দূর অতীতের কল্পনামণ্ডিত জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। তবে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সমকালীন জীবনকে আমরা লক্ষ করি। বিধবা রমণীর প্রণয় ও বিবাহ সমাজে কী সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে তারই কাহিনী আছে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল হলেও বাংলা উপন্যাস তাঁর হাতেই মুক্তি পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উপন্যাস হচ্ছে– 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২) প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাস রচনা করেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর উপন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস।

অন্যান্য শাখার মতো রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস-শাখাকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করলেও রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও নিজস্ব বিশিষ্টতার ছাপ রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রধান উপন্যাসগুলো হচ্ছে– 'চোখের বালি' (১৯০১), 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' ১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'চার অধ্যায়' (১৯৩০) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের পরে সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সহজ সরল, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের কথা বিশেষ করে অসহায় ও নির্যাতিত হিন্দু রমণীদের জীবনকাহিনী লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সমকালে যেমন তেমনি পরবর্তীকালেও শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা কমেছে বলে মনে হয় না। 'পল্লী সমাজ' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭-৩৩), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'পথের দাবী' (১৯২৬) শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অঙ্গন বহু বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে মূল্যায়নের চেষ্টা ও সময়ের অভিঘাতে বাংলা উপন্যাসে বৈচিত্র্য এসেছে। শরৎচন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রয়েছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), জগদীশ গুপ্ত (১৮৬৬-১৯৫৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), প্রমুখ।

ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলাদেশের উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে কিছুটা ভিন্নভাবে। ১৯৭১ সালে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তবে তার আগেই একটি বিশিষ্টধারার সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল। আমরা মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'র মতো অসাধারণ ও জনপ্রিয় উপন্যাসের সাক্ষাৎ পেয়েছি। নজিবর রহমানের 'আনোয়ারার' মতো উপন্যাস পেয়েছি। কাজী আব্দুল ওদুদের 'নদীবক্ষে', বেগম রোকেয়ার 'অবরোধবাসিনী' কাজী ইমদাদুল হকের 'আব্দুল্লাহ' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে পরবর্তীতে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন– আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮–১৯৭৯), আবুল ফজল (১৯০৩–৮৩), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১–৮৮), শওকত ওসমান (১৯১৭–১৯৯৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২–৭১), আব্দুর রাজ্জাক (১৯২৬–৮১), সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯২৩–৮৬), রশিদ করিম (১৯২৫–২০১১), আবু ইসহাক (১৯২৬–২০০২), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭–৭১), আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২–২০০৯), জহির রায়হান (১৯৩৩–৭২), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫–২০১৬), শওকত আলী (১৯৩৬), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৬–১৯৯৭), হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮–২০১২), ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫) প্রমুখ।

ঔপন্যাসিক পরিচিতি

আবু ইসহাক বৃহত্তর ফরিদপুরের শরীয়তপুর জেলার শিবঙ্গল গ্রামে ১ নভেম্বর ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ স্কলাশিপ নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৪৪ সালে আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর দীর্ঘ দিন পরে ১৯৬০ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন।

জনাব আবু ইসহাক দেশে ও বিদেশ বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন। একজন কূটনীতিক হিসেবে আবু ইসহাক ভাইস-কনসাল ও ফার্স্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।

আবু ইসহাক বাংলা সাহিত্যে একজন শক্তিমান ও স্মরণীয় কথা সাহিত্যিক। তাঁর রচিত উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর পরই উপন্যাসটি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য লেখক আবু ইসহাক বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে ১৯৮১ সালে তিনি সুন্দরবন সাহিত্য পদক ও ১৯৯৭ সালে একুশে পদক লাভ করেন। এ ছাড়া ২০০৪ সালে তিনি মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন।

'সূর্য-দীঘল বাড়ি' বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। দেশে ও বিদেশে চলচ্চিত্রটি প্রশংসিত হয়েছে ও বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'অভিশাপ' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায়। লেখকের ছোটগল্পগ্রন্থ 'মহাপতঙ্গ' ১৯৬৩ সালে ও 'হারেম' ১৯৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপন্যাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ–

ক. Novel　　খ. Prose
গ. Form　　ঘ. Character

২. পৌরাণিক উপন্যাসে প্রাধান্য দেয়া হয়–

ক. পুরাণের বিষয় ও কাহিনি　　খ. ইতিহাসের বিষয় ও চরিত্র
গ. সামাজিক দ্বন্দ্ব　　ঘ. রাজনৈতিক ঘটনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সাহিত্য জীবনকে ফুটিয়ে তোলে। হতে পারে এটা জীবনের কোনো খণ্ড অংশ কিংবা পূর্ণায়ত রূপ। তবুও তা এ সমাজেরই মানুষের কথা।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে সাহিত্য-রীতির–

ক. উপন্যাস　　খ. নাটক

গ. প্রবন্ধ　　ঘ. কবিতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

উপন্যাসে মানুষের জীবন পরিব্যাপ্ত ও বিস্তৃত। সাধারণত ঔপন্যাসিক যে উপন্যাসে সমাজের বিষয় এবং দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেন –তাই সামাজিক উপন্যাস।

৪. উদ্দীপকের বক্তব্য অনুযায়ী 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' কোন ধরনের উপন্যাস?

ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস　　খ. সামাজিক উপন্যাস

গ. রাজনৈতিক　　ঘ. আঞ্চলিক

সূর্য-দীঘল বাড়ি

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা বিবৃত করতে পারবেন।
- সূর্য-দীঘল বাড়ির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- সূর্য-দীঘল বাড়িতে জয়গুনের জীবনযাত্রার একটি চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

[এক]

আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।

অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিরমি খেয়ে গড়াগড়ি যায় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্যে বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। দৌলতদারের দৌলতখানার জাঁকজমক, সৌখিন পথচারীর পোশাকের চমক ও তার চলার ঠমক দেখতে দেখতে কেউ চোখ বোজে। ঐশ্বর্যারোহীর গাড়ির চাকায় নিষ্পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউ বা।

যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে বাঁচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে, কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মতো বাঁকা দেহ–শুষ্ক ও বিবর্ণ। তবুও তারা ভাঙা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। ধুক্‌ধুকে প্রাণ নিয়ে দেশের মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করে, শূন্য উদরে কাজ করে সকলের উদরের অন্ন যোগায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।

দুটি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে জয়গুনও গ্রামে ফিরে আসে। বাইরের ছন্নছাড়া জীবন এতদিন অসহ্য ঠেকেছে তার কাছে। কতদিন সে নিজের গ্রামে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেছে, স্বপ্ন দেখেছে। ছায়া-সুনিবিড় একখানি বাড়ি ও একটি খড়োঘর তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে কতদিন। কিন্তু বৃথাই ডেকেছে। তার সে বাড়ি, সে ঘর আর তার নয় এখন। দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে কোথায় গেল বাড়ি আর কোথায় গেল ঘর। বেঁচে নিঃশেষ করে দিল উদরের জ্বালা মেটাতে।

জয়গুন গ্রামে আসে একটি মাত্র আশা নিয়ে। ছাড়া ভিটে আছে একটা। সে তার আট আনা অংশের মালিক। বাকি আট আনার অংশীদার তার নাবালেগ ভাই-পো শফি। শফিকে নিয়ে শফির মা-ও আসে। তাদেরও মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। শেষে স্থির হয়–এই ছাড়া ভিটেটার ঝোপ-জঙ্গল সাফ করে দু-ভিটিতে দুখানা ঘর তুলে আবার তারা সংসার পাতবে।

কিন্তু এটা যে সূর্য-দীঘল বাড়ি!

জয়গুন ও শফির মা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

পূর্ব ও পশ্চিম–সূর্যের উদয়াস্তের দিকে। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ির নাম তাই সূর্য-দীঘল বাড়ি। সূর্য-দীঘল বাড়ি গ্রামে ক্বচিৎ দু'একটা দেখা যায়। কিন্তু তাতে কেউ বসবাস করে না। কারণ, গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস–সূর্য-দীঘল বাড়িতে মানুষ টিকতে পারে না। যে বাস করে তার বংশ ধ্বংস হয়। বংশে বাতি দেয়ার লোক থাকে না। গ্রামের সমস্ত বাড়িই উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী।

সূর্য-দীঘল বাড়ির ইতিহাস ভীতিজনক। সে ইতিহাস জয়গুন ও শফির মা-র অজানা নয়।

সে অনেক বছর আগের কথা। এ গ্রামে হাতেম ও খাদেম নামে দুই ভাই ছিল। ঝগড়া করে ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে যায়। খাদেম আসে সূর্য-দীঘল বাড়িটায়। বাড়িটা বহুদিন থেকেই খালি পড়ে ছিল।

এখানে এক সময়ে লোক বাস করত, সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বংশ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা কেউ জানে না। তবুও লোকের ধারণা, সূর্য-দীঘল বাড়িতে নিশ্চয়ই বংশ লোপ পেয়ে থাকবে। নচেৎ এরকম বিরান পড়ে থাকবে কেন?

যাই হোক, শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে খাদেম এসে সূর্য-দীঘল বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করে। কিন্তু একটি বছরও ঘুরল না। বর্ষার সময় তার একজোড়া ছেলে-মেয়ে পানিতে ডুবে মারা গেল। সবাই বুঝতে পারল—বংশ নির্বংশ হওয়ার পালা শুরু হল এবার। বুড়োরা উপদেশ দিলেন বাড়িটা ছেড়ে দেয়ার জন্য। বন্ধু-বান্ধবরা গালাগালি শুরু করল—আল্লার দুইন্যায় আর বাড়ি নাই তোর লাইগ্যা। সূর্যু-দীগল বাড়িতে দ্যাখ্ কি দশা অয় এইবার।

খাদেমের মনেও ভয় ঢুকে গিয়েছিল। সাতদিনের মধ্যে ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে সে অন্যত্র উঠে যায়। জয়গুনের প্রপিতামহ খুব সস্তায়, উচিত-মূল্যের অর্ধেক দিয়ে তার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নেয়। উত্তরাধিকারের সেই সূত্র ধরে জয়গুন ও শফি এখন এ বাড়ির মালিক।

ঐ ঘটনার পর অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। এতদিনের মধ্যে আর কোনো লোক ভুলেও এ বাড়িতে আসেনি। আকালের সময় জয়গুন ও শফির মা এ বাড়িটাই বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু সূর্য-দীঘল বাড়ি কেউ কিনতে এগোয়নি। তখন এ বাড়িটা বিক্রি করতে পারলেও জয়গুনের স্বামীর ভিটেটুকু রক্ষা করা যেত; ছেলে-মেয়ের বাপ-দাদার কবরে আজ আবার বাতি জ্বলত।

বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়ি। সর্বত্র হাঁটু-সমান ঘাস, কচুগাছ, মটকা ও ভাঁট-শেওড়া জন্মে অরণ্য হয়ে আছে। বাড়ির চারপাশে গোটা কয়েক আমগাছ জড়াজড়ি করে আছে। বাড়ির পশ্চিম পাশে দুটো বড় বাঁশের ঝাড়। তা ছাড়া আছে তেতুঁল, শিমুল ও গাবগাছ। গ্রামের লোকের বিশ্বাস—এই গাছগুলোই ভূত-পেত্নির আড্ডা।

অনেকদিন আগের কথা। সন্ধ্যার পর গদু প্রধান সোনাকান্দার হাট থেকে ফিরছিল। তার হাতে একজোড়া ইলিশ মাছ। সূর্য-দীঘল বাড়ির পাশের হালট দিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পায়—অই পরধাইন্যা, মাছ দিয়া যা! না দিলে ভালা অইব না।

প্রথমে গদু প্রধান ভ্রুক্ষেপ করেনি। পরে যখন পায়ের কাছে ঢিল পড়তে শুরু করে, তখন তার হাত থেকে মাছ দুটো খসে পড়ে যায়। সে 'আউজুবিল্লাহ' পড়তে পড়তে কোনো রকমে বাড়ি এসেই অজ্ঞান।

রহমত কাজী রাত দুপুরের পর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বার জন্যে ওজু করতে বরিয়ে ফুটফুটে জোছনায় একদিন দেখেছে—সূর্য-দীঘল বাড়ির গাবগাছের টিকিতে চুল ছেড়ে দিয়ে একটি বউ দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে দেখছিল। চোখের পলক ফেলে দেখে আর সেখানে বউ নেই। একটা ঝড়ো বাতাস উত্তর-পশ্চিম কোণাকুণি করম আলী হাজির বাড়ির ওপর দিয়ে চলে গেল। পরের দিনই করম আলী হাজির 'পুতের বউ' কলেরায় মারা যায়। দু'দিন পরে তার হালের তিনটা তরতাজা গরু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে খতম।

আরও অনেকের সাথেই নাকি অনেক বেশে ভূতের দেখা হয়েছে। সূর্য-দীঘল বাড়ির ভূতের গল্পের অন্ত নেই। তাই দিন-দুপুরেও পারতপক্ষে এ বাড়ির পাশ দিয়ে কেউ হাঁটে না।

বাড়িটার বড় আকর্ষণ একটা তালগাছ। এত উচুঁ তালাগাছ এ গাঁয়ের লোক আর কোথাও দেখেনি। কত শিশুর পরিচয় হল তালগাছটির সঙ্গে। তারা বুড়ো হল, জীবন-লীলা সাঙ্গ করল। তাদের কত উত্তরপুরুষও গেল পার হয়ে। কিন্তু তালগাছটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো। কালের সাক্ষী হয়ে শত ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথা উঁচু করে।

তালগাছটি এ-এলাকার গর্বের বস্তু। চর-অঞ্চলে বিশেষ করে বক্তবলীর চরে গেলে কথায় কথায় যখন কুল-কৌলীন্যের তর্ক ওঠে, তখন এখানকার লোক এ তালগাছটির নজির দেখায়। কেউ কেউ নিজেদের বনেদিপনা জাহির করে। তারা এরকম করে বলে—আমরা অইলাম গিয়া সাবেক মাডির ভর্দলোক, বুঝলানি মিয়া? আমাগো ঘর বহুত পুরানা। ঐ আসমাইন্যা তালগাছটা সাক্ষী। দেহাও দেহি, অতবুড়া আর ডাঙ্গর গাছ একটা তোমাগ মুল্লুকে? ও হো, ঠন্ ঠন্। তোমাগ এইদিগের বড় তালগাছ আমাগ গেরামের খাজুর অইব ক্যামনে? এইত হেদিনের চর এইডা। এইহানে আগে আছিল গাঙ। তোমরা অইলা চরুয়া ভূত—বাইল্যা মাডির তরমুজ, ইত্যাদি।

অপর পক্ষ রাগ করে না। তারা সব সময় এ সাবেক মাটির বাসিন্দাদের কৌলীন্য স্বীকার করে। বহু টাকা খরচ করেও এদের ছেলে-মেয়ের সাথে সম্বন্ধ করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে। এখানকার বহু কালো কুৎসিত মেয়ে চরের সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে বিকিয়ে যায় এ কারণেই।

জয়গুন ও শফির মা সাত-পাঁচ ভেবে এ বাড়িতে বাস করার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ছেলেমেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করেই নিরস্ত হয়েছিল বিশেষ করে। কিন্তু একদিন এক নামকরা ফকির—জোবেদ আলী এ সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করে। সূর্য-দীঘল বাড়ির চারকোণে চারটা তাবিজ পুঁতে এসে সে জানিয়ে দেয়—এই বার চউখ বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়িতে। আর কোনো ডর নাই। ধুলাপড়া দিয়া ভূত-পেত্নির আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি। চাইর কোণায় চাইড্যা আলীশান আলীশান পাহারাদারও রাইখ্যা আইছি। সব আপদ-বিপদ ওরাই ঠেকাইব। বাড়ির সীমানার মইদ্যে ভূত-পেত্নি; জিন-পরী, ব্যারাম-আজার—কিচ্ছু আইতে পারব না।

জয়গুন ও শফির মা খুশি হয় ফকিরের ওপর। শফির মা তার ভিক্ষার ঝুলি খালি করে সোয়া সের চাল দেয় তাকে। জয়গুন দেয় সোয়া পাঁচ আনা পয়সা। কিন্তু ফকিরের মন ওঠে না। শফির মা অনুনয় করে—আমরা গরীব-কাঙ্গাল মানু। এই এর বেশি আর কি দিতে পারি?

—বাড়িতে যখন ঠিকঠাক অইবা তখন একটা পিতলের কলসি দিও। আর হোন, তোমাগ বাঁশ ঝাড়ে বড়ড়া বাঁশ দ্যাখলাম। এক জোড়া বাঁশ দিও আমরারে। আমারে দিলে আখেরে কাম দিব।

জয়গুন ও শফির মা আপত্তি করে না।

ফকির আবার বলে— হোন, আর এক কথা। বচ্ছর বচ্ছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব। যেই চাইরজন এইবার রাইখ্যা গেলাম, হেইগুলা কমজোর অইয়া যাইব সামনের বচ্ছর। বোঝতেই পার, দিনরাইত ভূত-পেত্নির লগে যুদ্ধ করা কি সোজা কাণ্ড!

সূর্য-দীঘল বাড়ি মানুষের হাত লেগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। জয়গুন ও শফির মা আজেবাজে গাছ-গাছড়া বিক্রি করে টাকার আমদানি করে। তাতে অন্ধকার বাড়িটায় আলোর আমদানিও হয় বেশ। নিজেদের ঝাড়ের বাঁশ কেটে খুঁটি হয়। খড়ের চালা ও পাটখড়ির বেড়া নিয়ে দু'ভিটেয় দু'খানা ঘর ওঠে। ঘর নয় ঠিক—ঝুপড়ি। রোদ-বৃষ্টি ঠেকনোর আদিম ব্যবস্থা।

বছর বছর পাহারাদার বদলিয়ে তিনটি বছর কেটে গেল সূর্য-দীঘল বাড়িতে। কোনো বিপদ-আপদ আজ পর্যন্ত আসেনি। ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়া অসুখ-বিসুখও হয়নি ছেলেমেয়েদের। এ জন্যে ফকিরের দোষ দেয়া যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বর কোন্ বাড়িতে নেই?

এবার আবার পাহারাদার বদলাবার সময় হয়েছে। একদিন জয়গুনের ঘরে বসে শফির মা বলে—ফকিরের যে আর দ্যাহা মিলে না আইজকাইল। হেইযে কবে আইয়া গেছে। আর একবার হাত-হপনেও দ্যাহা দিয়া গেল না, আমরা বাঁইচ্যা আছি না মইর‍্যা গেছি। কেমুনতরো মানু। এদিকে বছর যে ঘুইরা গেল। কলসিডা না দেওনে বেজার অইছে বুঝিন্।

ফকিরকে তাদের প্রতিশ্রুত পেতলের কলসি দেয়া হয়নি এ পর্যন্ত। সাত-স্বপনেও তার দেখা না পাওয়ার কারণ এটা নয়। কারণ অন্য একটা। জয়গুন ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

কলসির তাগাদা দিতে ফকির মাঝে মাঝে আসত। জয়গুন ও শফির মা নিজেদের উপস্থিত অক্ষমতা জানিয়ে কিছুদিন সবুর করবার অনুরোধ জানাত। শফির মা বাড়ি থাকলে কখনো লাউ-কুমড়ো, কখনো শসা-বেগুন— যখনকার যা নিয়ে সে খুশি মনে ফিরে যেত। শফির মা বাড়ি না থাকলে সেদিন জয়গুনের ঘরের দোরগোড়ায় যেন শিকড় গেড়ে বসত সে। উঠবার নামও করত না। কোনোদিন সে বলত—এক খিলি পান দ্যাও বেয়ান।

জয়গুনকে 'বেয়ান' আর হাসুকে 'জামাই' বলতে শুরু করেছিল সে। প্রথম থেকেই লোকটার কথাবার্তা, ভাবগতিক জয়গুনের কাছে সুবিধের মনে হয়নি। সামান্য একটা পেতলের কলসির জন্যে এত ঘন ঘন কেন সে আসে? 'বেয়ান' বলে এত ঘনিষ্ঠতাই বা করতে চায় কেন? কী মতলব?

জয়গুনের মনে সন্দেহ। কিন্তু কিছু বলার উপায় ছিল না। যে লোকটা এত উপকার করল, তাকে কটু কথা বলতেও বাধে।

জয়গুন একটা আস্ত পানে সুপারি, চুন ও খয়ের দিয়ে এগিয়ে দিত। ফকির বলত, বেয়াইরে খিলি বানাইয়া দিলে বুঝিন জাইত যায়, না? কত দিন খোশামুদ কইর‍্যাও তোমার আতেও এক খিলি পান খাইতে পারলাম না। মইর‍্যা গেলেও হায়-আফসোস থাকব।

জয়গুন কোনো উত্তর দিত না।

পান খেতে খেতে ফকির নানা রকমের কথা বলতে শুরু করত। কখনো কোনো প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য হা করে থাকত। উত্তর না পেয়ে আবার শুরু করত। মাঝে মাঝে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠত লাগামছাড়া হাসি। জয়গুন এ অস্বস্তিকর হাসি-ঠাট্টায় জ্বলে উঠত মনে মনে। পিছ-দুয়ার দিয়ে এক সময়ে সরে পড়ত।

একদিন রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে কোথা হতে ফকির এসে হাজির। জয়গুন পান খেতে বসেছিল। ফকিরের আগমনে সে একটু সচকিত হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। শফির মা-ও বাড়ি নেই আজ।

ফকির দরজার ওপর বসে পান চিবোতে চিবোতে এক সময়ে বলে—বেয়ানের আতের পান খাইতে কি মুলাম! এক্করে মুখের সাথে মিশ্যা যায়। যেই আতের পান এত মুলাম, হেই আতখানও না জানি কেমুন। শরীলখানও বুঝিন তুলতুল করে তুলার মতন।

ফকির হাসে। জয়গুনের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। শক্ত একটা কিছু বলতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

—দেহি না, বেয়ান! বলতে বলতে সে এগোয়—দেহি না তোমার নরম আতহানে কি লেহা আছে।

জয়গুন পিছিয়ে যায়। বেড়ার সাথে গিয়ে ঠেকে।

—দেহি না আতহান। নওল মুরগির মতন পলাও ক্যান! ছিঃ ছিঃ!

ফকির হাত বাড়াতেই জয়গুন হাতের কাছের চুনের ঘট্‌টা ছুঁড়ে দেয় ফকিরের মুখের ওপর। চেঁচিয়ে ওঠে—কুত্তার পয়দা! বাইর অ, বাইর অ ঘরতন।

এ ব্যাপারের পর জোবেদ আলী ফকির আর তার চুন-কালির মুখ সূর্য-দীঘল বাড়িতে দেখায়নি।...

জয়গুন শফির মা'র কথার উত্তর দেয়— বেজার অইলে অউক গিয়া। দিমু না কলসি, কাম নাই আর পাহারাদারের।

শফির মা জয়গুনের ভাবান্তরের কারণ খুঁজে পায় না। জয়গুন এমন অকৃতজ্ঞ হল কেমন করে? আর পাহারাদার ছাড়া সূর্য-দীঘল বাড়িতে থাকবার সাহসই বা তার কেথেকে হল?

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

পঞ্চাশের মন্বন্তর– বাংলা ১৩৫০ সনে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৪৩ সনে তৎকালীন বাংলায় সংঘটিত দুর্ভিক্ষ। **বুইল্যা–** বলে। **প্যাট–** পেট। **ভইর‍্যা–** ভরে। **কইলাম–** বললাম। **আইয়্যা পড়ল বইল্যা–** এসে পড়ল বলে। **দ্যাহ–** দেখ। **সোন্দর–** সুন্দর। **আণ্ডা–** ডিম। **আঁসে–** হাঁসে। **ফুডাইমু–** ফুটাব। **দিয়া আবি–** দিয়ে আসবি। **মিডা মিডা–** মিষ্টি-মিষ্টি। **দ্যাশ–** দেশ।

সারসংক্ষেপ

দুর্ভিক্ষের জন্য গ্রাম ছেড়ে যে মানুষেরা শহরে পা বাড়িয়েছিল তারা আবার গ্রামে ফিরে আসে। শহর তাদের গ্রহণ করেনি। সেখানে তারা হারিয়েছে তার আত্মীয়-স্বজনকে, আপনজনকে। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেছে। দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে জয়গুনও গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে তাদের বসতবাটি নেই। তাই বাধ্য হয়ে উঠতে হয় সূর্য-দীঘল বাড়িতে। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারিত বাড়িকে গ্রামে বলে সূর্য-দীঘল বাড়ি। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস সূর্য-দীঘল বাড়ি– ভূতপ্রেতের আড্ডা। সেখানে বাস করলে বংশ নির্বংশ হয়। এক ফকির জয়গুন ও শফির মার জন্য সূর্যদীঘল বাড়ি বাসযোগ্য করে দেয়। সে সূর্যদীঘল বাড়ির চারকোণায় দোয়া-দরুদের তাবিজ পুঁতে দেয়। সূর্যদীঘল বাড়ির চারকোণায় দোয়া-দরুদের তাবিজ পুঁতে দেয়। তিন বছর নিরুপদ্রবেই তাদের কেটে যায়। কিন্তু ফকির আর আসে না পাহারাদার বদলাতে। শফির মা জানে না কিন্তু জয়গুন জানে কেন ফকির আর আসে না। ফকিরের লালসাকে জয়গুন দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. জয়গুন 'সূর্য-দীঘল বাড়ি'র কত অংশের মালিক?

ক. দুটি ভিটা
খ. সাত আনা
গ. আট আনা
ঘ. দুখানা ঘর

৬. সূর্য-দীঘল বাড়িতে মানুষ কেন বাস করতে চায় না?

ক. বংশ লোপ পাবে
খ. সামাজিক সংস্কার
গ. বাসের অযোগ্য
ঘ. জমির মালিকানায় দ্বন্দ্ব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলটির খুবই শোচনীয় অবস্থা। কারও ঘরেই খাবার নেই। ভাগাভাগি, স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে তারা শেষ হয়। তাই তারা দূরের টানে বাইরের পানে চেয়ে থাকে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে রচনার–

ক. অগ্নি-বীণা
খ. সূর্য-দীঘল বাড়ি
গ. বিসর্জন
ঘ. শাস্তি

৮. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে–

ক. জীবন সংগ্রাম
খ. জাতিভেদ
গ. পরশ্রীকাতরতা
ঘ. হিংসাপরায়ণতা

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দরিদ্র জয়গুনের পরিবারের আহার্যের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মায়মুনার সারাদিনের কাজের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- জয়গুনের জীবন সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।
- জয়গুনের প্রতি মসজিদের ইমামের বিরূপ আচরণের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কাসুর পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- জয়গুনের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

[দুই]

পাশাপাশি পিঁড়ে বিছিয়ে বসে দুটি ভাইবোন–হাসু ও মায়মুন। জয়গুন পান্তা বেড়ে ছেলে ও মেয়ের সামনে দুটো থালা এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা নিয়ে বসে। মায়মুন আড়চোখে হাসুর থালার দিকে চায়। রোজ সে এমনি চেয়ে দেখে। রোজই হাসুকে বেশি করে খেতে দেয় মা। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস তার হয় না। জয়গুন বুঝতে পেরে নিজের পাতের একমুঠো ভাত দিয়ে বলে–বিছমিল্লা বুইল্যা মোখে দে। দেখ্‌বি এই দুগ্‌গায়ই প্যাট ভইর‍্যা যাইব।

–বিছমিল্লা।

হাসুও বলে–বিছমিল্লা।

প্যাচপেচে পান্তাভাত। পোড়া মরিচ মেখে কালো করে নেয়। খেতে খেতে জয়গুন সারাদিনের কাজের ফরমাস করে যায় মায়মুনকে। ঘর ঝাঁট দেয়া, থালাবাসন মাজা, পানি আনা ইত্যাদি।

—ভাত আছে আর, মা? হাসু বলে।

ভাতের হাঁড়িটা হাসুর থালার ওপর উপুড় করে ঢেলে জয়গুন বলে—খাইয়া নে, পরাণ ঠাণ্ডা অইব।

শুধু পানিতে থালা ভরে যায়। মায়মুনের পাতে তার আধাটা ঢেলে দিয়ে লবণ দিয়ে ঘেটে চুমুক দেয় হাসু।

খাওয়ার পরে জয়গুন পানের ডিবা নিয়ে বসে। পেট ভরে দুটি ভাত খেতে না পেলেও পানটা একটু মুখে দিলে তবু ভালো লাগে।

হাসু কোষার পানি সেচে ডাকে—মা, শিগ্‌গির। গাড়ি কইলাম আইয়া পড়ল বইল্যা।

জয়গুন বাঁশের চোঙা থেকে পাঁচটা টাকা বের করে নেয়। এই টাকা ক'টিই তার মূলধন। ময়মনসিং থেকে সস্তায় চাল এনে সে গাঁয়ে বিক্রি করে। এই করে টাকা প্রতি এক সের সোয়া সের মুনাফা হয় প্রতি খেপে। আঁচলে সব ক'টি টাকা বেঁধে চটের দুটো ঝুলি হাতে বেরিয়ে পড়ে সে তারপর।

দশ বছরের মেয়ে মায়মুন। কিন্তু সাত বছরের বেশি বলে মনে হয় না। হাঁটতে গেলে পাক খেয়ে পড়ে যাবে মনে হয়। একা একা কাজ করতে ভালো লাগে না ওর। কিন্তু কাজের কোনোটা বাকি রাখলে চুল এক গাছও মাথায় থাকবে না, সে জানে। শীর্ণ শরীরটাকে টেনেটুনে কোনো রকমে মাজা-ঘসা করে, বদনা ভরে ভরে সাত আটবারে পানির কলসিটা ভরে সে।

আজ হাঁস দুটো ছাড়তে গিয়ে খাঁচার নিচে ডিম দেখে মায়মুনের আনন্দ আর ধরে না। তাদের হাঁস ডিম দিয়েছে আজ নতুন। কী সাদা আর বড় বড়! দু'হাতে দুটো ডিম নিয়ে সে নাচতে আরম্ভ করে। লাফাতে লাফাতে সে বাইরে আসে। দৌড়ে যায় শফির মা-র ঘরে। ডাকে—মামানি গো, অ-মামানি, দ্যাহ কী সোন্দর আণ্ডা। আমাগ আঁসে পাড়ছে। উল্লাস যেন সে ধরে রাখতে পারে না।

—দেহি দেহি—বলে মামি হাত পেতে ডিম দুটো নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর হেসে বলে— ভালো আণ্ডা অইত। পয়লা বারের অইলেও ডাঙর-ডোঙর অইছে! আষ্ট পয়সা কইর‍্যা বেচ্‌তে পারবি এক একটা।

—না গোঁ মামানি, এই আণ্ডা বেচ্‌তাম্ না।

—খাবি?

—ওহোঁ। বাচ্চা ফুডাইমু।

—বেইশ, বেইশ! মামি উৎসাহ দিয়ে বলে।

ডিম দুটো তুষের হাঁড়ির মধ্যে রেখে মায়মুন বাড়ির এদিক ওদিক খুঁজে গাছের শুকনো ডাল ভাঙে। আজ তার কাজ করতে খারাপ লাগে না। আর দিনের চেয়ে অনেক বেশি লাকড়ি যোগাড় করে ফেলল সে।

বিকেলবেলা মায়মুন বড়শি নিয়ে তেঁতুলতলা গিয়ে বসে। যাবার আগে আণ্ডা দুটো আর একবার দেখে যায় দুই চোখে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ও বসে থাকে বড়শি নিয়ে। পিঠালী সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মাছ ওঠে মাত্র একটা টেংরা, তিনটে পুঁটি আর কয়েকটা ডানকানা। মাছগুলো যেন ওর চেয়েও চালাক হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে সাঁঝ-বাতি দেখিয়ে আবার নিবিয়ে দেয় মায়মুন। আবছা অন্ধকারে বসে মাছ কয়টা কুটে লবণ দিয়ে রাখে।

রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত অন্ধকারে ওকে একা বসে থাকতে হয় প্রায়ই। মায়মুনের বড় ভূতের ভয়। কোনো কোনো দিন সে শফির মা'র ঘরে গিয়ে কেচ্ছা শোনে। তার পান ছেঁচে দেয়। কিন্তু আজ সে দুপুর বেলা বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। ভিক্ষে করে খায় সে। মাঝে বাড়িও আসে না। মায়মুন দোরের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে চুপ-চাপ পড়ে থাকে।

রাত গোটা নয়ের সময় হাসু আর হাসুর মা আসে। শব্দ পেয়ে মায়মুন মাথার ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে।

মায়মুন এবার লাফ দিয়ে ওঠে। খুশিতে আটখান হয়ে সে বলে—মা, মা, আমাগ আঁসে আণ্ডা পাড়ছে। বলতে বলতে সে বের করে আনে ডিম দুটো। হাসু খুশি হয়ে ওঠে। হাতে নিয়ে দেখে, কী সুন্দর সাদা আর বড়।

হাসু বলে—কাইল অই আণ্ডা বিরান খাইমু মা, পান্তা ভাত দিয়া।

—ই—স! বাচ্চা ফুটাইমু আমি। প্রতিবাদ করে বলে মায়মুন।

জয়গুন বলে—ওহোঁ। পয়লা দিনের আণ্ডা। আণ্ডা দুইডা জুম্মার ঘরে দিয়া আবি নামাজের দিন।

ভাই-বোন দুজনেরই মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

জয়গুন তাড়াতাড়ি চুলো ধরায়। রাতের জন্য মুঠ মেপে ছয়মুঠো ও ভোরের জন্য আরো ছয়মুঠো চাল নিয়ে সে হাঁড়ি বসায় চুলোর ওপর। ছেলেকে হুকুম দেয় কয়েকটা কুমড়ো পাতা তুলে আনতে। নিজে সে যায় না। বাচ্চা-কাচ্চার মা, রাত-বিরাতে গাছের ফল-পাতা ছিঁড়তে নেই।

ভাত ফুটিয়ে মায়মুনের ধরা মাছ কয়টা রাঁধতে দেরি হয় না।

তিনটি বাসনে ভাত বাড়ে জয়গুন, আর আন্দাজ করে—হাঁড়িতে কতটা আছে। ফেনটাও ভাগাভাগি করে নেয়। খেতে খেতে হাসু বলে— ফেনডাত খুব ঘন মা, মিডা মিডা লাগে।

—নয়া আউশ যে। এর লাইগ্যাইত আউশ চাউল আন্‌লাম। দরেও হস্তা। ফেনডাও অয় ভালা। কিন্তু ভাতে বাড়ে না এক্কেরেই। অ্যারে হাসু, নারাণগঞ্জে চাউল কী দর দেখলিরে আইজ?

—ট্যাহায় দেড় সের, মা।

—কী পোড়ার দ্যাশ দ্যাখ্ দেহি! উত্তুরে এডুক হস্তা না অইলে হুকাইয়া তেজপাতা অইয়া যাইতাম না? আইজ আড়াই সের ভাও আনলাম। আমন চাউল দুইসের কইর‍্যা।

—আমি একদিন তোমার লগে উত্তুরে যাইমু মা।

—ওহোঁ কাম কামাই দিয়া তোমার উত্তুরে যাওনের দরকার নাই বা'জান।

খাওয়া শেষ হলে জয়গুন হাঁড়ির ভাতগুলোতে পানি ঢেলে রাখে। ছেলেমেয়ের জন্যে তেলচিটে একটা লম্বা বালিশ নামিয়ে দেয়। হাসু ও মায়মুন শুয়ে পড়ে। জয়গুন পানের ডিবাটা নিয়ে বসে এবার। আজ আর পানের ডিবা নেয়ার কথা মনে ছিল না তার। গাড়ির মধ্যে ছমুর মা-র কাছ থেকে চেয়ে একবার মুখে দিয়েছে একটু। আর সারা দিনের মধ্যে সে পান খায়নি।

তবু হাসু অনুযোগ দেয়—পান খাওয়া ছাইড়্যা দ্যাও, মা। পান আর আনতাম না আমি। চাইর পয়সা কি কম?

পান খাওয়া সে অনেক কমিয়েছে। চার পয়সার পানে দু'দিন যায় আজকাল। পান চিবোতে চিবোতে সে সারাদিনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতে চেষ্টা করে।

রাত অনেক হয়েছে। কুপিটা নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

[তিন]

আজকের ডিম দুটো মায়মুনের। সে বাচ্চা ফুটাবে। মা রাজী হয়েছে। সারা রাত তার ভাল ঘুম হয়নি। তার ছোট মনে কত কল্পনা জেগেছে। হাঁসের বাচ্চা হবে, সেগুলো বড় হবে, ডিম দেবে—ফকফকে সাদা ডিম। সেই ডিমের থেকে আবার বাচ্চা হবে। নানা রঙের হাঁসে তাদের খাঁচা ভরে যাবে। স্বপ্নেও সে দেখে—রঙ-বেরঙের হাঁসের সারি চলেছে ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে। ডিম কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে একটা হাঁড়ি ভরে ফেলেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে হাঁস দুটো ছাড়তে যায়। ঠিক ঠিক দুটো ডিমই পেড়েছে আজো। ডিম দুটো তুলে সে তুষের হাঁড়ির মাঝে রেখে দেয় আলাদা করে। সেখানে আগের দু'দিনের আরো চারটে রাখা হয়েছে। এক দুই করে গুণে দেখে মায়মুন একবার। তাপর হাঁস দুটো ছেড়ে দিয়ে সে চেয়ে থাকে। দু'তিনবার ডানা ঝাঁপটা মেরে হাঁস দুটো ভেসে যায় ধানক্ষেতের দিকে। মায়মুনের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। হাত-মুখ ধুয়ে মায়মুন ঘরে আসে। ডিম দুটো সে বুকের সাথে চেপে ধরে খুশিতে। জয়গুন বলে—অই রহম কইর‍্যা ধইর‍্যা রাখলে অই বাচ্চা অইব? বেবাকগুলা আণ্ডা লইয়া আয় আমর কাছে। বাছাই কইর‍্যা দেই। যেই আণ্ডাডা লম্ফা, হেইডায় অইব আঁসা, আর যেইডা গোল হেইডায় অইব আঁসী, গোল দেখে দুটো ডিম বেছে মায়মুনের হাতে দিয়ে সে আবার বলে—অই পাড়ায় গিয়া দ্যাখ, কেউর মুরগির উমে দিতে পারস যদি। হাসুও যা ওর লগে। তোর আর এই বেলা কামে যাওন লাগত না।

এ কথায় রীতিমত খুশি হয়ে ওঠে হাসু।

জয়গুন আরো বলে—দুফরে যাবি জুম্মার ঘরে। আণ্ডা চাইড্যা দিয়া আ'বি।

—চাইডা অই! হাসু আশ্চর্য হয়ে যায়—তুমি না হেদিন কইলা, পয়লা দিনেরডা কেবল?

—দুইড্যা আণ্ডা জুম্মার ঘরে কেমন কইর‍্যা দেই, পাগল? এক আলির কমে—

—আমরা খাইমু না বুঝিন একটাও?

—তুই আছস তোর প্যাট লইয়া।

খেয়ে দেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ে।

বর্ষার সময় বাড়ির চারদিকে থাকে পানি। বিলের মাঝে একটা দ্বীপের মতো যেন। এ সময়ে নৌকা ছাড়া চলবার উপায় থাকে না। তারা সকলে তাদের কোষায় চড়ে ওপাড়ায় যায়। জয়গুন নামে মোড়ল বাড়ির ঘাটে। সেখানে সে মাঝে মাঝে মোড়লদের ধান ভানে, চিড়া কোটে, ঘর লেপে দেয়।

হাসু ও মায়মুন পাড়াময় ঘুরে শেষে দিয়ে এল ডিম দুটো।

সাতদিন পরে বসবে সোনা চাচির মুরগি। তার ফুটবে চৌদ্দটা ডিম। তবু সে বলেছিল—দুটো বাচ্চা হলে তাকে একটা দিতে হবে। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়েছে।

গ্রামের মসজিদ। জুম্মার নামাজ হচ্ছে। হাসু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে। সব লোক এক সঙ্গে উঠছে, বসছে, সেজদা দিচ্ছে। হাসুর কেমন ভয় হয়। তারও নামাজের বয়স হয়েছে। সে ভাবে—বারো বছরের হলেই তো নামাজ পড়তে হয়।

নামাজ শেষ হলে হাসু গামছায় বাঁধা ডিম কয়টা নিয়ে এগায়। একজন নামাজি শির্‌নি বিলিয়ে দিচ্ছিল সকলের মধ্যে। গামছা খুলে হাসু তার হাতে দিয়ে দেয় ডিম কয়টা।

ইমাম সায়েবের চোখে এড়ায় না। তিনি ডেকে বলেন—নিয়া আস আণ্ডা কয়ডা এদিকে। কাছে যেতে আবার বলেন—যাও, দিয়া আস গিয়া আমার ওখানে। কে দিল হে?

—ঐ যে ঐ ছ্যাঁড়া। আঙুল দিয়ে দেখায় সে।

একজন বলে—সূর্যু-দীগল বাড়ির।

আর একজন বলে—চিনেন না হুজুর? জব্বর মুন্সীর পোলা।

ইমাম সায়েব চমকে ওঠেন—ও-ওই! তওবা! তওবা! হারাম! হারাম!

তিনি ডিম কয়টার দিকে তর্জনীর নির্দেশ দিয়ে বলেন—নিয়া যাও জলদি আমার কাছ থ্যাইকা। মসজিদের মধ্যে কে আন্‌ল এই আণ্ডা? ফিরাইয়া দ্যাও অহুনি। বেপর্দা আওরতের চীজ। ছি! ছি! ছি! —তাঁর চোখে মুখে ঘৃণার তীব্রতা ফুটে ওঠে।

একজন ইঙ্গিত করে—একলা একলা সে ময়মনসিংহ যায় টেরেনে কইর‍্যা। কী হিম্মত!

ইমাম সাহেব বলেন— খলা মিয়ারা, ইমানদারকে খোদাওন্দ করিম হারাম থ্যাইকা কী ভাবে হেফাজত করেন।

আর একজন বলে—জব্বর মুন্সী কত পরহেজগার আছিল। খোদার এমন পিয়ারা আছিল। আর তার পরিবার—

হাসু রেগে ওঠে মনে মনে। একবার ইচ্ছে হয়—দেয় ছুঁড়ে ডিম কয়টা ইমামের মুখের ওপর। কিন্তু সাহস হয় না। ডিম ক'টা নিয়ে সে বেরিয়ে আসে।

কোষাটাকে সে জোরে বেয়ে নিয়ে যায়। আজ অনেকগুলো ট্রেন ও স্টিমার ফাঁকা গেল। দুটোর জাহাজ ধরা চাইই চাই। দুটো মোট পেলেও ছ'আনার কাজ হবে।

দুটোর জাহাজ, আর বিকেল পাঁচটার ট্রেন ধরে সে আসে বাজারে। ডিম চারটে সে বিক্রি করেই ফেলবে। কেন দেবে সে মসজিদে? মা জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে, জুম্মার ঘরে দেয়া হয়েছে।

ডিম ক'টা সাত আনায় বেচে সে পাঁচ আনায় চারগাছা কাঁচের চুড়ি কেনে মায়মুনের জন্যে, আর নিজের কোমরে পয়সা বেঁধে রাখবার জালি কেনে একটা। বাকি দু'আনার এক আনায় কেনে একটা চরকি ও এক আনায় চারটে তিলের কদমা।

সন্ধ্যার দিকে সে কোষা ভিড়ায় একটা বাড়ির ঘটে। চারদিকে চেয়ে সে চুপিচুপি ডাকে—কাসু, অ-কাসু!

বছর সাতেকের একটি ছোট্ট ছেলে লাফিয়ে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। হাসু ওকে কোলে তুলে নেয়। তারপর ওর মুখে একটা কদ্‌মা দিয়ে বলে—দ্যাখ, কেমুন মিষ্টু। এই চরকিডাও তোর লাইগ্যা আনছি। দ্যাখ, কেমুন সোন্দর ঘোরে।

কাসু খুশি হয় খুব। হাসু বলে—যাবি তুই আমার লগে? মা তোর লাইগ্যা কত কান্দে দিন-রাইত!

—ক্যার মা?

—তোর মা। আমার মা।

—হুঁ, মিছা কথা।

—না বলদ, সত্যই।

মা-র কথা শুনে কাসু যেন কেমন হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তার চোখ টলটল করে। কাসু কিছু বুঝে উঠতে পারে না। সে জানে, তার মা মরে গেছে। বাপ তো সেই কথাই বলে সব সময়।

—যাইমু তোমার মা-র কাছে—কাসু বলে।

—আমার মা যে তোরও মা অয়, বলদ।

—কে? কেডারে অইহানে? কাসুর বাপ করিম বক্‌শ চিৎকার করে ওঠে। তেড়ে আসে লাঠি হাতে।—খাড়া হারামির পয়দা, কান কথা দিতে আইছস আমার পোলারে!

কাসুকে কোল থেকে নামিয়ে বাকি কদ্‌মা তিনটে ওর হাতে দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড় দেয় হাসু। কোষাটা ঠেলে দিয়ে চড়ে বসে। প্রাণেপণে বেয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

কাসুর বাপ করিম বক্‌শ পানির কিনারা পর্যন্ত এসে বাধা পায়। চেঁচিয়ে বলে—আবার এই মুহি পাও বাড়াইলে আন্ডি গুড়া কইর‍্যা ফালাইমু। মানুষ চিন না বজ্জাতের বাচ্চা!

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কয়েকটা মাটির ঢেলা নিয়ে ছুঁড়তে থাকে ওর দিকে। একটা ডেলা এসে হাসুর পিঠের ওপর পড়তেই সে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে যায়। কোষার আবডালে থেকে আত্মরক্ষা করতে থাকে। করিমবক্‌শ চলে যেতেই কোষায় চড়ে জোরে লগির খোঁচ দেয়।

কাসুদের বাড়ি থেকে শব্দ শোনা যায়, সাথে সাথে গর্জনও—হারামজাদা, কদ্‌মা দিয়া ভুলাইতে আইছস। আবার আইলে বাপের মরণ দেহাইয়া ছাইড়্যা দিমু।

আবার শোনা যায়—চরকি! দ্যাখ্ অহন চরকিবাজি কেমুন লাগে।

হাসুর চোখে পানি আসে। পিঠের ব্যথার কথা ভুলে যায় সে। কাসু যে তারই ভাই, এক মা-র পেটের ভাই। হোক্ না বাপ ভিন্ন। কিন্তু মা-তো একজনই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে আর এ মুখো হবে না। তার জন্যেই কাসু আজ মার খাচ্ছে।

মোট বয়ে আজ ছ'আনা পেয়েছে হাসু। বাড়ি এসেই মা-কে দেয় তিনটে দু'আনি।

মা বলে—এই পাইলি আইজ?

—গেলাম তো দুফরের পর, আরঅ? বলেই হাসু বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মায়মুনকে ডাকে—দেইক্যা যা মায়মুন, কী আনছি।

নতুন কিছু দেখবার জন্যে মায়মুনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাসু চুড়ি চারগাছা ওর হাতে পরিয়ে দেয়। মায়মুনের মুখ আনন্দে ভরে যায়।

জয়গুন বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়ে বলে—চুড়ি কিনলি, পয়সা পাইলি কই?

—আইজ পথে যাওনের কালে একটা বোঝা পাইয়া গেলাম। আমতা আমতা করে হাসু।

—চুড়ি তোমারে কে কিনতে কইছে? রাগতস্বরে বলে জয়গুন। হাসু কোনো উত্তর দেয় না। তার এই চুপ করে থাকাটা জয়গুনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। দাঁত কিড়মিড় করে বলে—খাইতে নাই হুইতে রাঙ্গা পাড়ি। আইজ রাইতে ভাত নাই তোর কপালে।

মায়মুন মুখ কালো করে দূরে সরে যায়। হাসু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই থাকে।

জয়গুন আবার বলে—আণ্ডা কই?

—জুম্মার ঘরে দিয়া দিছি। বলেই হাসু শিউরে ওঠে।

—জুম্মার ঘরে! তুমি বুঝছ, আমি কিছুই জানমু না? মোড়ল বাড়ির তন বেবাক হুইন্যা আইছি। হুজুর ফিরাইয়া দিছেন আণ্ডা।

হাসুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। চাপে পড়ে সত্য কথাটাই বলে সে—বেইচ্যা ফালাইছি।

—পয়সা দে।

—চুড়ি কিনছি, পয়সা রাহনের জালি আর—

জয়গুন এবার বেরিয়ে আসে বাঘিনীর মতো।

—আর কাসুর লাইগ্যা চরকি আর কদ্‌মা।

বাঘিনীর তেজ মিলিয়ে যায় শুধু একটা নামে। কী মধুর নাম! কাসু! রাগের মাঝে বাৎসল্যের হঠাৎ আবির্ভাব সে সহ্য করতে পারে না। সরে যায় সেখান থেকে।

খাওয়ার সময় আবার তাদের কথা হয়। মা বলে—কাসু কতহানি ডাঙর অইছে রে?

—মায়মুনের মতো অত বড় অইছে।

একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। হাসু ও মায়মুন চকিত হয়ে মা-র দিকে চায়। হাসু এবার অন্য কথা পাড়ে—তুমি আর বাইরে যাইও না, মা। মাইন্‌ষে কত কতা কয়, বেপর্দা—

ছেলের পাকমি দেখে জয়গুন ধমক দেয়—বাইরে যাইমু না! ঘরে আইন্যা কে মোখের উপর তুইল্যা দিব?

—আমি যা পাই। না পাইলে না খাইয়া মইর‍্যা যাইমু। হেই অ ভালা, ত মাইনষের কতা আর সয় না।

হাসু সারাদিনে দশ বারো আনা পায় মোট বয়ে। এ দিয়ে তিনটি প্রাণির এক বেলাও চলে না। জয়গুন বাধ্য হয়েই ঘরের বার হয়েছে আজ অনেক দিন। সে বাড়ি বাড়ি ঘর লেপে, ধান ভানে, চিড়া কোটে। সস্তায় চাল কিনতে যায় উত্তরে। গাড়িতে করে যায়, ভাড়া লাগে না। গাঁয়ের লোকের কথায় তার গা জ্বালা করে। তাদের নিষেধ মেনে চললে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে, সে জানে।

জয়গুন এবার বলে—খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর‍্যাও খাই না, খ'রাত কইর‍্যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা'—

কঠিন তার কণ্ঠস্বর।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়—সে খোদার কাছে পাপ করছে। বাড়ির বার হয়ে খোলা রাস্তায় সে পুরুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। গাড়িতে কত বেগানা মানুষের মাঝে বসে সে চলে। বেপর্দা মেয়েলোকের কী আজাব হয়, সে জানে। তার প্রথম স্বামী-হাসুর বাপ মুন্‌শী ছিল। পুঁথি পড়ে শোনাত দোজখের শাস্তির বিবরণ। পুঁথির কয়েকটা লাইন তার আজো মনে পড়ে—

মুখের ছুরত যার পুরুষে দেখিবে,
বিছা, বিচ্ছু, জোঁকে তারে বেড়িয়া ধরিবে।
যে চুল দেখিবে তার পুরুষ অচিন,
সাপ হইয়া দংশিবে হাশরের দিন।
যে নারী দেখিবে পর-পুরুষের মুখ,
শকুনি গিরধিনী খাবে ঠোকরাইয়া চোখ।

জয়গুন শিউরে ওঠে। সাপ, বিছা, জোঁক....! তার প্রথম স্বামীর মুখখানাও মনে পড়ে যায়। কী সুন্দর চাপদাড়ি-শোভিত মুখখানা জব্বর মুন্‌শীর। বেহেস্ত-দোজখের কত কথাই সে বলত! বেহেস্তে কত সুখ! আর দোজখ! দোজখের নামে আর একবার আঁতকে ওঠে সে। তার বিশ্বাস, হাশরের দিন জব্বর মুন্‌শী কিছুতেই তাকে তার বেপর্দার জন্য নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না।

তারপর তার মনে পড়ে করিম বক্‌শের কথা। জব্বর মুন্‌শীর মৃত্যুর পর জয়গুন তার মান-ইজ্জতের ভার দিয়েছিল তার ওপর। কিন্তু সে তা রাখতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে সে জয়গুনকে তালাক দেয়।

পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।
কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।

সমাজের এই নীতি-নির্দেশে তিন বছরের ছেলে কাসু রয়ে গেল করিম বক্‌শের কাছে। আর মায়মুন ও কোলের মেয়েটির পরিত্যক্তা মায়ের কোল ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় রইলো না।

কোলের মেয়েটি দুর্ভিক্ষের বছর মারা যায়।

হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চলছিল জয়গুন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকূল পাথারে কূল সে পায়। লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাকে বাঁচতে হবে, ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে হবে—এই সঙ্কল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে।

আরো অনেক কিছু ভাবছিল জয়গুন। ছেলের ডাকে তার ধ্যান ভেঙে যায়।

—তুমি খাও না, মা?

ছেলেমেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মমতায় তার বুক ভরে ওঠে।

দুটি কচি মুখ। এদের বাঁচাতেই হবে। ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবন-ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আইরহম– ওই রকম। **কইর‍্যা–** করে। **ধইর‍্যা–** ধরে। **বেবাক–** সব। **লম্ফা–** লম্বা। **দুফরে–** দুপুরে। **চাইড্যা–** চারটা। **এক আলি–** এক হালি। **নামাজি–** যিনি নামাজ পড়েন। **থাইক্যা–** থেকে। **অহুনি–** এখুনি। **লগে–** সঙ্গে। **এই মুহি–** এই মুখে। **আড্ডি–** হাড্ডি। **কইর‍্যা ফালাইমু–** করে ফেলব। **দেইক্যা–** দেখে। **খাইতে নাই হুইতে রাঙ্গা পাড়ি–** খেতে নাই শোয়ার জন্য রাঙ্গা পাটি। **বেইচ্যা ফালাইছি–** বেচে ফেলেছি। **ঘরে আইন্যা–** ঘরে এনে। **তুইল্যা দিব–** তুলে দেবে। **বাইট্যা খাইমু–** বেটে খাব। **কেওরডা–** কারোটা। **খ'রাত–** খয়রাত, দান। **মাইয়াহান–** মেয়েটা। **রাহি–** রাখি। **মইদ্যে–** মধ্যে। **অদিষ্টে–** অদৃষ্টে। **আহালের–** আকালের। **এক্কই চোডে–** একই চোটে। **স্বাদীন–** স্বাধীন। **আপনের–** আপনার। **শাওন মাস–** শ্রাবণ মাস। **জর্মমাস–** জন্মমাস। **বিলাই–** বিড়াল। **ঘরতন–** ঘর থেকে।

সারসংক্ষেপ

হাসু ও মায়মুনকে খেতে দিয়ে জয়গুনও খেতে বসে। আহারের আয়োজন অল্প। পান্তাভাত আর পোড়া মরিচ। হাসু ও জয়গুন নৌকায় করে বের হয়ে যায়। জয়গুন যাবে ময়মনসিংহ। পাঁচ টাকা সম্বল করে সে চাল আনে। ওতে কিছু লাভ হয়। মায়মুন বাড়িতে সারাদিন কাজ করে। আজ হাঁসের দুটো ডিম পেয়ে খুব খুশি হয়। অনেকটা রাতে ফেরে হাসু আর জয়গুন। খুশিতে মায়মুনা তাদের ডিম দেখায়। সে চায় ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তুলতে– হাসু চায় খেতে। কিন্তু জয়গুন বলে প্রথম দিনের ডিম গাঁয়ের মসজিদে দিতে হবে। এতে ছেলে মেয়ের মুখ শুকিয়ে যায়।

হাসু ও মায়মুন অন্য এক বাড়িতে ডিম দুটো ফুটানোর জন্য দিয়ে আসে। হাসু বাকি চারটি ডিম নিয়ে এসেছে গ্রামের মসজিদের ইমামের জন্য। জয়গুন বেপর্দা চলাফেরা করে বলে ইমাম ঘৃণার সঙ্গে ডিম ফিরিয়ে দেয়। সে ডিম বিক্রি করে মায়মুনের জন্য চুড়ি কেনে, পয়সা রাখার জন্য জালি ও কাসুর জন্য চরকি আর তিলের কদমা কেনে। কাসু জয়গুনের আরেক সন্তান। কাসুর বাবা করিম বকশ। হাসুকে দেখে সে রাগ করে– ঢিল ছোঁড়ে। হাসু কোনোরকমে পালিয়ে আসে। জয়গুনেরও মনে হয় বেপর্দা চলাচল করে তার বহু পাপ হচ্ছে। কিন্তু কী করে তার সংসার চলবে! দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে করিম বকশ তাকে তালাক দেয়। কাসু থাকে পিতার কাছে। হাসু আর মায়মুনকে নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাকে বাঁচতে হবে– বাঁচাতে হবে ঐ দুটি শিশুকে। জীবন ধারণের অপরিহার্যতায় তুচ্ছ হয়ে যায় ধর্মের অনুশাসন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. হাসু মায়মুনার জন্য কী কিনেছিল?

ক. কাঁচের চুড়ি　　খ. চরকি

গ. তিলের কদমা　　ঘ. জালি

১০. মায়মুন কীভাবে হাসুর থালার দিকে তাকায়?

ক. বাঁকা চোখে　　খ. আড় চোখে

গ. আনন্দিত মনে　　ঘ. হতাশ মনে

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আবির রহমানের তাড়া খেয়ে তরুকে উঠোনে রেখেই চলে আসে মালব। মালবের চোখে পানি আসে। অপমনের কথা ভুলে যায় সে। তরু যে তারই ভাই, এক মায়ের সন্তান। হোক না বাপ ভিন্ন। মা-তো একজনই।

১১. উদ্দীপকের মালব চরিত্রটি 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. হাসু　　খ. কাসু

গ. মায়মুন　　ঘ. করিম

১২. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে–

ক. রিরংসা　　খ. ভ্রাতৃত্ববোধে

গ. প্রতিহিংসায়　　ঘ. জিঘাংসায়

পাঠ-৪

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- জয়গুনের ট্রেনে যাতায়াতের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- স্বাধীনতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- করিম বকশের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মাছ ধরার একটি চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।
- কাসু সম্পর্কে করিম বকশ ও জয়গুনের অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

[চার]

রেল-রাস্তার ধারে মা-কে নামিয়ে দিয়ে হাসু কোষা ডুবিয়ে রাখে। কেউ নিয়ে যেতে পারে এই ভয়ে সে তার ওপর কচুরি ঢাকা দিয়ে রাখে। এ-ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ার সে। কারণ, বর্ষার দিনে কোষাটা তাদের চলাফেরার একমাত্র সম্বল।

হাসু গাড়ির দেরি বুঝে রেল-রাস্তা ধরে দক্ষিণমুখি পথ নেয় নারায়ণগঞ্জের দিকে। রেল ও স্টিমারের বড় স্টেশন সেখানে। আজ তিন মাইল রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে। আর সব দিন গাড়ির পা-দানের ওপর দাঁড়িয়ে হাতল ধরে দিব্যি এতটা রাস্তা সে পার হয়ে যায়।

জয়গুন ফতুল্লা স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। ট্রেন আসার অনেক দেরি। সে এদিক ওদিক খুঁজে দু'জন সাথী যোগাড় করে নেয়। নয়টার ট্রেন আসে দশটারও পরে। এখানে এক মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না গাড়ি। ভিড়ের মাঝে সঙ্গিনীদের সাহায্যে জয়গুন কোনো রকমে উঠে পড়ে। মেঝেতে একটু জায়গা নিয়ে থলে বিছিয়ে বসে। জয়গুনের সাথী দুটি–গেদির মা, লালুর মা-ও বসে নিচে। গেদির মা-র সাথে পাঁচ বছরের গেদি। লালুর মা বিরক্ত হয়, বলে–মাইয়াহান বাড়িতে রাইক্যা আইতে পার না, গেদির মা?

–বাড়িতে কার কাছে রাহি বইন?

–ভিড়ের মইদ্যে নিজেরই চলন দায়, তুমি আবার–

—তুমি কি ফ্যালাইয়া দিতে কও মাইয়াডারে! গেদির মা রুষ্ট হয়ে বলে।

—না, না, হেউডা কইমু ক্যা? কইছিলাম তোর কষ্ট দেইক্যা।

—কষ্ট অইলে আর কি করমু বইন? অদিষ্টে কষ্ট থাকলে খণ্ডাইব কে?

—এক কাম কর না? মাইয়াডার বিয়া দিয়া দে!

—মোডে পাঁচ বচ্ছর বয়স। এত শিগ্‌গিরেই!

—এই আর কি এমুন? মাইয়াডাও খাইতে-লইতে পারব, তুইও নিভাবনায় থাক্‌বি।

জয়গুন রাস্তাঘাটে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। সে কথা বড় কয় না। এখনও লজ্জাকে সে জয় করে উঠতে পারেনি। তার কান অন্য দিকে। ওপাশে আলোচনা হচ্ছে—দেশ স্বাধীন হবে, চাল সস্তা হবে, এই সব।

চার-পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে তখন আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। জনকয়েক একটা বাংলা খবরের কাগজের দিকে ঝুঁকে আছে। বাকি সবাই শুনছে ওপাশের আলোচনা।

একজন বলে—এই বচ্ছর আহালের নমুনা দেহা যায়। চাউলের দর এক্কই চোডে আটতিরিশ অইছে।

আর একজন সায় দিয়ে বলে—আহাল অইব না আবার! মানুষ কি আর মানুষ আছে? পাপের ডুইব্যা গেছে দ্যাশ। দেইক্যো মিয়ারা আধা মানুষ মইর‍্যা যাইব এই বার। পাপ, পাপে বাপেরেও ছাড়ে না।

অন্য একজন বলে—পঞ্চাশ সনের চাইয়া বড় আহাল অইব এই বার।

একজন প্রতিবাদ করে—না মিয়া, দ্যাশ স্বাদীন অইব। আর দুকখু থাক্‌ব না কারুর, হুন্‌ছি আমি। স্বাদীন আইলে চাউলও হস্তা অইব। আগের মত ট্যাকায় দশ সের।

—ও মশাই আপনের খবরিয়া কাগজে কী লেখছে? জোরে জোরে পড়েন না, হুনি।

যে লোকটি খবরের কাগজ পড়ছিল, সে জোরে পড়তে আরম্ভ করে, ১৫ই আগস্টের মধ্যে ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে—

—ও মশাই, ওডা ক্যার ছবি? একজন জিজ্ঞেস করে।

—জিন্নাহ সা'বের। খবরের কাগজের পাঠক বলে।

আবার তর্ক। একজন বলে, জিন্না সা'বই রাজা অইব। খুব বড় মাথা লোকটার।

অন্য দিক থেকে আর একজন বলে—গান্ধী অইব এই দেশের রাজা।

এ নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক চলে। মাঝ থেকে একজন বলে—সুভাষ বসু থাকলে সে-অই রাজা অইতেন।

—আইচ্ছা মামু, স্বাদীন অইলে খাজনা দিতে অইবনি?

—না, না, খাজনা দিলে আবার স্বাদীন অইল কি?

অপর একজন বলে—না মিয়া, রাজার খাজনা মাপ নাই, দিতেই অইব।

জয়গুন মন দিয়ে শোনে সব কথা। একটি কথাই তার ভালো লাগে, আশা জাগে মনে—চাল সস্তা হবে, কারো কোনো কষ্ট থাকবে না।

—হাসুর মা!

জয়গুন তাকায়। লালুর মা বলে—মোখ বুইজ্যা বইয়া আছ যে, এই দিকে কত কী অইয়া গেল!

—কী? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে জয়গুন।

—আমার লালুর বিয়া ঠিক কইর‍্যা ফেললাম। এই দ্যাহো বউ।

লালুর মা গেদিকে আরো কাছে টেনে নেয়।

জয়গুন একটু হাসে শুধু। লালুর মা বলে—বউ কেমন অইব দ্যাখ দেহি।

—ভালা। জয়গুনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

লালুর মা খুশি হয়। সে গেদির মা-কে বলে—গয়নার লাইগ্যা অমন কইর‍্য না গো। আমিত কইছি—কানে কানফুল, নাকে নাকফুল আর বালি, আতে বয়লা, পায়ে ব্যাকখাড়ু দিমু। তয় রূপার দিতে পারতাম না, বইন!

-ওহোঁ, হেইডা অইব না। তুমি বেবাক কেমিকল আর বেলী দিয়া চালাইতে চাও। না বইন, রূপার একপদ জিনিস দিতেই অইব। আর গলার অড়কল আর কোমরের নাবীসঙ্গ। আমার গ্যাদা মাইয়া। নাবীসঙ্গ না অইলে কেমুন দ্যাহা যাইব।

ঢাকা স্টেশন। লোক নামে, লোক ওঠে। ভিখারিও ওঠে নানা রকমের—কানা, খোড়া, বোবা। একজন অন্ধ করুণ সুরে বলে যায়—

যে জন করিবে দান অন্ধ মিসকিনে
বকশিশ পাইবে সেই হাশরের দিনে।।
এক পয়সা যেই দিবে খুশি খোশালিতে।
সত্তুর পয়সা পাইবে আল্লার রহমতে।।
বরকত হইবে তার রুজি-রোজগারে।
বাল-বাচ্চা জিন্দা রবে সুখের সংসারে।।

আ—ল্লা—হ!

অন্ধ হাত পাতে—দ্যান বাবা একটা পয়সা।

একজন যাত্রী বলে—এক পয়সা কি আর আছে বাপু?

মসজিদের চাঁদার জন্য আসে লোক। রীতিমত বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে—জয়নগর মসজিদের জন্য দান করুন। এর ফল পাবেন কেয়ামতের দিন, পুলসেরাতের দিন। এই টাকায় বেহেস্তে ফুল-বাগিচা হবে, দালান-বালাখানা হবে।

দু'এক পয়সা কেউ দেয়, অনেকেই দেয় না। কেউ বলে—এদের এই একটা পেশা।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে লালুর মা আবার মুখর হয়ে ওঠে—নাবীসঙ্গ দিতে আরতাম না। বিয়াইন, গলার অড়কলও না। তয় খাড়ু না দিয়া পায়ের ঝুনঝুনি দিমু বউরে, ছোড বউ আমার আঁটব ঝুন্‌ঝুন্ কইর‍্যা!

জয়গুন ভাবছিল অনেক কিছু। সে নিজের ছেলের বিয়ে দেবে—বউ আসবে ঘরে। মেয়ের বিয়ে দেবে—পরের বাড়ি যাবে সে। লালুর মা-র শেষ কথায় সে একটু হাসে।

—হে অইলে শাওন মাসের পয়লা দিয়া-অই বিয়া অইব। কী কও বিয়াইন?

গেদির মা একটু চিন্তা করে বলে—ওহোঁ, শাওন মাস আমার মাইয়ার জর্মমাস।

—হে অইলে পরের মাসে?

—পরের মাসে? না না। ভাদ্দর মাসে বিলাই পার করে না ঘরতন। আর আমি বুঝিন্ মাইয়া পার করুম? কী যে তোমার আক্কল!

—সত্য অইত। আমার মনেই আছিল না ভাদ্দর মাস। হে অইলে পরের মাসেই অইব, কেমুন গো?

গেদির মা রাজী হয়।

একটা ছেলে সুর করে বলে যাচ্ছে—

খেয়ে যান মজার নাশ্‌তা,
নিয়ে যান সস্তা সস্তা,
এক আনায় দুই বস্তা।

ছেলেটার ছড়া বলার ভঙ্গি আর বস্তার বিরাটত্ব দেখে যাত্রীরা সব হো-হো করে হেসে ওঠে। কেউ কেউ দু'একটা প্যাকেট কিনে চানাচুরের মজাটাও পরখ করে। লালুর মা দুই পয়সা দিয়ে একটা প্যাকেট কিনে ভাবী বউকে দেয়। গেদি খুশি হয়।

একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। গাড়ি একটা স্টেশনে থামতেই জয়গুন, লালুর মা ও গেদির মা নেমে পড়ে। ময়লা কাপড়ে ভিখারি ভেবে টিকেট কালেক্টর দেখেও দেখে না।

এখান থেকে বাজার কিছু দূরে, প্রায় এক মাইল। লালুর মা তার বউকে কোলে করে নিয়ে বেয়ানকে সাহায্য করে।

বাজারে এসে তিনজনে তিন রকমের চাল কেনে তারা। কিন্তু একই দরের—টাকায় আড়াই সের করে।

তারপর বাজার থেকে বেরিয়ে তারা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে। ফিরে যাওয়ার গাড়ি আবার বিকেল চারটায়।

গাড়ির সময় আন্দাজ করে তারা ওঠে। রওয়ানা দেয়ার আগে তিনটা ঝুলির চাল মিশিয়ে ছয়টা ঝুলির মধ্যে ভরে। ঝুলিতে এক রকমের অনেক চাল দেখলে রেল-বাবুরা সন্দেহ করে, টিকেট চায়। এ রকম করে মিশিয়ে ভিক্ষার চাল বলে চালিয়ে দেয় তারা। টিকেটও লাগে না।

গেদিকে স্টেশনের বাইরে তিনটা ঝুলির পাহারায় রেখে তারা তিনজন তিনটা ঝুলি হাতে স্টেশনে আসে। কিন্তু সদর দরজা দিয়ে নয়, রেলে লাইন ধরে ধরে। টিকেট কালেক্টরকে এড়িয়েই যেতে চায় সব সময়। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও বাকি তিনটে ঝুলি নিয়ে আসার সময় প্ল্যাটফরমে রেল-পুলিশ তাদের আটকায়। বলে—দেখি, দেখি।

সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। লালুর মা বলে—ভিক্কার চাউল।

সেপাই চাল দেখে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে—ভিক্ক্যার চাওয়াল, এতনা! হামি কুছু বোঝে না! চল্ থানামে। জান্তি নেহি এক জিল্লাকা চাওয়াল দুসরা জিল্লামে যানে হুকুম নেহি আছে?

লালুর মা সাহসী। বলে—ছাইড়্যা দ্যাও, সিপাইজী।

সেপাই বলে—তব্ আয় হামার ছঙ্গে।

প্ল্যাটফরম থেকে দূরে গিয়ে সেপাই প্যান্টের বিরাট পকেট খুলে ধরে। বলে—দে হামার পাকিট ভরদে। রেশন মে চাওয়াল মিলতে আছে না, খালি খুদি।

লালুর মা তিনটা ঝুলির থেকে মুঠ ভরে আধ সের খানেক চাল সেপাইর দুই পকেটে ঢেলে দেয়। সেপাই এবার ছেড়ে দেয়।

জয়গুন পরিশ্রান্ত, ট্রেনের ঢুলানিতে ঝিমুনি আসে। কাঠের সাথে মাথা ঠেকিয়ে সে ঘুমিয়েই পড়ে। গাড়ি গেণ্ডারিয়া স্টেশন ছাড়লে গেদির মার ধাক্কায় তার ঘুম ভাঙে।

তাড়াতাড়ি তারা ঝুলিগুলোর মুখ দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। ট্রেনের হুইস্‌ল বাজে। ফতুল্লা স্টেশন এসে যাবে এক্ষুণি। তারা ঝুলি হাতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়! হাসু কোষাটা পানি থেকে তুলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। নির্ধারিত স্থানে কুল গাছটার কাছে গাড়ি আসতেই তারা সবক'টি ঝুলি জানালা দিয়ে দুপদাপ বাইরে ফেলে দেয়।

ফতুল্লা স্টেশনে নেমে তারা কুলগাছতলায় আসে। হাসু ঝুলিগুলো কুড়িয়ে জড়ো করেছে এক জায়াগায়। মা-কে দেখে বলে—আইজ গাড়ি বড় দেরি করল, মা? বেইল ঘরে যায় যায়, এমুন সময় আমি আইছি।

—কই আর এমুন দেরি?

জয়গুন ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে সময়ের টের পায়নি। আটটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

—কী দর আন্‌লা মা চাউল?

—আড়াই সের ভাও। কিন্তুক দর যেন চড়া চড়া ঠেক্‌লরে। তুই কত পালি, বা'জান?

—বার আনা। আমি কিন্তু দুই পয়সার চিনাবাদাম খাইছি, মা। এই কয়ডা আনছি মায়মুনের লাইগ্যা।

জয়গুনের মন প্রসন্ন হয় ছেলের ওপর। সে বলে—জলদি কইর‍্যা চল, যাই।

[পাঁচ]

বয়সের সাথে সাথে মানুষের মেজাজ পরিবর্তন হয়। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে করিম বক্‌শের মেজাজ ঠাণ্ডা না হলেও কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে বৈকি। তা না হলে তার শড়কির হাতল ঘুণে ধরতে পায়? চার বছর বোধ হয় লাঠিটায়ও তেল মাজা হয়নি। তেলের দামও বেড়েছে, আর লাঠির দরকারটাও কমেছে অনেক। মাটির ওপর পুরানো লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে তার নিজের ও লাঠির বিগত শৌর্যের কথা মনে পড়ে। পেতলে মুঠি-বাঁধা এই লাঠিটা যৌবন-কাল থেকেই তার পথ-চলার সাথী। কারণ, মেজাজের জন্যে শত্রু কম ছিল না তার। তাই বুড়োর মতো লাঠি হাতে সে চলত। এমন কি ঘুমোবার সময় পাশেই থাক্‌ত লাঠিটা। লাঠিটা হাতে নিলেই তার একদিনের কথা মনে পড়ে।

দুপুর রাত্রে যাত্রাগান শুনে এসেছিল সে। মেহেরনের দরজা খুলে দিতে দেরি হয়েছিল। তাকে হাতের এই লাঠিটা দিয়েই সে মেরেছিল। গর্ভবতী মেহেরন সে আঘাত সহ্য করতে পারেনি। তারপর গলায় রশি বেঁধে গাবগাছে লট্‌কিয়ে সে রেহাই পেয়েছিল। হাজারখানেক টাকা অবশ্য খরচ করতে হয়েছিল এ-ব্যাপারে।

তার আরো মনে হয় আজকাল, লাঠিটা হয়তো হাশরের দিন তার বিরুদ্ধেই সাক্ষী দেবে খোদার কাছে।

মেহেরন করিম বক্‌শের প্রথম স্ত্রী।

তারপর সে জয়গুনকে বিয়ে করে। তার ওপরও তার বাহুবলের কসরত চলে ছয় বছর। তার শরীরের কোনো অঙ্গ বোধ হয় তার প্রহারের কাছে রেহাই পায়নি।

জয়গুনের শাশুড়ী সান্ত্বনা দিত—ওয়াতে কি অইছে বউ! মরদগুনে যেই পিড়ে মারব, হেই পিড বিস্তে যাইব। যেই আতে, যেই পায় মারব, বেবাক বিস্তে যাইব। তুই বুঝিন্ কাড়ুরিয়ার বউর কিচ্ছা হোনস নাই? তয় হোন্ ঃ রসুল-করিম একদিন বিবি ফাতেমারে কইল- "অমুক জাগায় এক কাড়ুরিয়া থাকে। তার বউ আট বিস্তের বড় বিস্তে যাইব।" বিবি ফাতেমা জিগাইল— "ক্যান্ যাইব?" রসুল করিম কইল— "যাও, গিয়া দেইখ্যা আহ একদিন।" বিবি ফাতেমা কাড়ুরিয়ার বাড়ি গিয়া দ্যাহে কি, ওমা! ঘরের দুয়ারে হাজাইয়া থুইছে দাও, লাডি, ঠ্যাঙ্গা, দড়ি। বিবি ফাতেমা কাড়ুরিয়ার বউরে জিগাইল— "অত লাঠি ঠ্যাঙ্গা এমুন কইর‍্যা রাখছে কে?" সে জ'ব দিল— "আমি।" জিগাইল, "ক্যাঁ?" সে জ'ব দিল— "যদি সোয়ামীর খেজমতে তিরুডি অয়, তয় এই লাঠি দিয়া আমারে পিডাইব। কামের সময় কোতায় লাডি বিচরাইব? এই এর লাইগ্যা আতের কাছে আইন্যা রাখ্‌ছি। জিগাইল, "দাও রাখছ ক্যাঁ?" জ'ব দিল— "যদি মনে লয় কাট্‌ব।"

—দ্যাখ, কেমুন জমনা আছিল। জয়গুনের শাশুড়ী মাথা নাড়ত।

জয়গুন এ কেচ্ছা বহু আগেই শুনেছে। মুসলমান ঘরের বউ এ কেচ্ছা শোনেনি, তা অস্বাভাবিক।

জয়গুন হয়তো সহ্য করত। কিন্তু করিম বক্‌শ তাকে সে সুযোগ দেয়নি।

বছর দুই আগে করিম বক্‌শ আবার বিয়ে করেছে। তবে আঞ্জুমনের কপাল ভালো। আগের সে মেজাজ আর নেই। বিশেষ করে পয়লা ঘরের ছেলে রহিম বক্‌শ পাপের অত্যাচারে শ্বশুর বাড়ি উঠে যাওয়ার পর, তার মেজাজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে।

কিন্তু বাহুবল যত কমেছে, বাক্যবল তত নয়। ঝগড়া আর প্যানপ্যানিটাই আজকাল আছে। প্রতিপক্ষ ঝগড়ায় পিছপাও নয় বলে, খেতে বসতে ঝগড়া হয়। দিন বড় বাদ যায় না। যে দিন বাদ যায়, সেদিন পাড়ার সবাই সচকিত হয়। একজন আরেক জনকে জিজ্ঞেস করে—করিম বক্‌শ বুঝি বাড়িতে নাই আইজ?

সেদিন আঞ্জুমন এক বেদেনির কাছ থেকে মেয়ের অসুখের জন্যে কিসের তাবিজ রাখছিল! করিম বক্‌শ হাট থেকে এসে দেখেই আগুন। জিজ্ঞেস করে—কিয়ের তাবিজ, অ্যাঁ? আমারে টোনা করবি নি?

তার এই এক অকারণ সন্দেহ।

আঞ্জুমন রেগে যায়, বলে—হ, টোনা করমু। ভেড়া বানাইয়া রাখমু তোমারে।

—হারামী! বৈতাল মাগি! বলে সে উঁচু করে পুরানো লাঠিটা।

—আত উডাইও না কইতে আছি। খইয়া পড়ব আত। কুড়-কুষ্ঠ অইব।

করিম বক্‌শ লাঠিটা নামায়। তারপর বলে—জয়গুন তো তোর মতন আছিল না। মাইর‍্যা চ্যাবডা কইরা ফেলাইলেও উহুঁ করত না। আর তোর গায়ে ফুলের টোহা না দিতেই—

জয়গুনকে ছেড়ে দেয়ার পর কাসুকে নিয়ে করিম বক্‌শ বিব্রত হয়েছিল। একদিন করিম বক্‌শের এক নিঃসন্তান বোন এসে কাসুকে নিয়ে যাওয়ায় সে নিশ্চিন্ত হয়।

কাসু ফুপুর বাড়িতে এক রকম ভালোই ছিল।

কিছুদিন আগে ফুপু মারা যাওয়ার পর করিম বক্‌শ তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে এসেছে। কিন্তু এ বাড়ির ঝগড়াটে আবহাওয়ায় এসে কয়েক দিনেই সে মন-মরা হয়ে গেছে। এখানে আদর করে কেউ কোলে নেয় না তাকে। ডাকেও না কেউ। এখানে কারো মুখেই হাসি নেই। তাই ওর নিজের হাসিও কোথায় মিলিয়ে গেছে। কারো মুখের দিকে চেয়েই সে ভরসা পায় না।

শুধু একজনকেই তার পছন্দ হয়েছে। সে হাসু। তার এখানে আসবার পর সে তিনদিন এসেছে। কিছুদিন ধরে তারও দেখা নেই।

হাসুর দেওয়া কদ্‌মা করিম বক্‌শ পানিতে ফেলে দিয়েছিল। চরকিটা ভেঙে দিয়েছিল পায়ের তলায় ফেলে। কাসুকেও থাপ্পড় মেরেছিল পিঠের ওপর। ঐ দিন থেকেই কাসু আরো মুষড়ে পড়ে। করিম বক্‌শ সেদিন তাকে একটা মাটির ঘোড়া কিনে দিয়েছিল! কাসু তা ছোঁয়নি।

হাসু আর আসবে না, তার ছোট মনেই সে অনুমান করেছিল সেদিন। হাসুর আসার পথের দিকে চেয়ে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

করিম বক্‌শ ঐ দিন থেকেই হুঁশিয়ার হয়েছে। হাসুকে তার সন্দেহ হয়। ছোঁড়াটা ভারি ফেরেববাজ। ফুসলি দিয়ে কাসুকে নিয়ে যেতে পারে এই তার ভয়। তাই সে যেখানে যায়, প্রায় সাথে সাথেই রাখে কাসুকে। বড় ছেলেটা শ্বশুর বাড়ি পালিয়েছে। কাসুই এখন একমাত্র ভরসা।

খেত-পাথারে জোয়ারের পানি আসার সাথে সাথে করিম বক্‌শের মনে আসে এক জোয়ার। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সে কোঁচ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মাঠে মাঠে! তার ঐ এক ঝোঁক। তার যৌবনের হিংস্র স্বভাবের অবশিষ্ট এই মাছ শিকার। কয়েকদিনের চেষ্টাও অনেক সময় বিফলে যায়। তবু তার ধৈর্যের অভাব নেই। রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে সে ধান খেতের ভেতর মাছের সন্ধান করে বেড়ায়।

এ বছর তার সুবিধা হয়েছে আরো। আউশ ধান পেয়েছে মণ সাতেক। এ ধানে প্রায় আমন ধর ধর হবে। কারণ ছেলে ও ছেলেবৌ চলে যাওয়ায় খাবার লোক কমেছে। গাই দুই সের দুধ দেয়। আট আনা করে রোজ একটাকা পাওয়া যায়। সুতরাং তার আর ভাবনা নেই। সারাদিনে সে শুধু বাজারে গিয়ে দুধ বেচে! কাজ আরো আছে বটে। কিন্তু মাছ ধরার নেশায় সে সব কাজের খেয়ালই হয় না। ছেলে থাকতে সব কাজ সে-ই করত।

তিনদিন অবিরাম বৃষ্টিপাতের পর আজ দুপুরের দিকে রোদ উঠেছে। ভাত খাওয়ার পর করিম বক্‌শ ডাকে—ফুলির মা, এক ছিলিম তামাক দ্যাও দেহি জলদি। বাতাসের রাগ নাই আইজ। মাছ দ্যাখতে সুবিধা অইব।

আঞ্জুমন কল্কেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে আসে। করিম বক্‌শের হাতের হুঁকোটায় কল্কেটা বসিয়ে দিয়ে বলে—আর তো কাম নাই তোমার। পাডের জাগডা দ্যাখছ?

—হুঁ, দেখমু হনে আইজ। নিরাগ বাতাসে আইজ চকে যা মাছ দ্যাহা যাইব! —

—বাটনা বাইট্টা রাহুম হে-অইলে, কী কও?

করিম বক্‌শ খোঁচাটা নীরবে সহ্য করে। মাছ সে চার-পাঁচ দিনেও একটা পায় না। তাই এ টিটকারী।

কোঁচ-যুতি হাতে সে নৌকায় ওঠে। পাশের বাড়ির হারুনকে ডেকে নেয় নৌকা বাইতে। কাসুকেও রেখে যায় না বাড়িতে।

এদিকের পানি কালো, তাই স্বচ্ছ। মাছ মারতে অসুবিধা। শিকারী মাছ দেখবার আগেই, মাছ শিকারীকে দেখতে পেয়ে পালায়।

দাড়া-পথ বেয়ে তারা খালের ধারের একটা ধান খেতে ওঠে। নদীর পানি খাল দিয়ে এসে এখানকার পানি ঘোলা করে রাখে।

করিম বক্‌শ নিশ্চুপ ওঁত পেতে থাকে। চারিদিকে চোখ বুলায় একটা ধান গাছ নড়ে কিনা। কখনও কোঁচ নিয়ে, কখনও যুতি হাতে নিয়ে সে তাক করে।

মাছের কোনো লক্ষণ না পেয়ে হাতের ইশারায় সে আর এক খেতের দিকে নৌকা চালাবার নির্দেশ দেয়।

এক জায়গায় কয়েকটা ধান গাছ নড়ে ওঠে। আর যায় কোথা! ঝর্‌রর্ ঝপ্! কোঁচ দিয়ে কোপ দেয় করিম বক্‌শ।

আরো অনেক লোক জমা হয়েছিল মাছ মারতে। একজন বলে আইজ আর মিয়াবাই খালি আতে যাইব না, বোঝতে পারছি।

করিম বক্‌শ কোঁচটা তুলে নিরাশ হয়। বলে—দুশ্‌শালা! আইজ যাত্রাডাই খারাপ। আর কেওর কোঁচের নিচে পড়তে পারলি না? আমারডার নিচেই—

—কী মিয়া, কাছিম নাহি? একজন জিজ্ঞেস করে।

—আর কইও না মিয়া। আইজ যাত্রাডাই খারাপ।

—যাত্রা খারাপ! ক্যাঁ? বউর মোখ দেইক্যা যাত্রা কর নাই মিয়া?

হারুন ও কাসু দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। হারুন নিজের মাথা থেকে মাথলাটা কাসুকে দিয়ে বলে—ঘাম দিছেরে, ইস্! মাথলাডা মাথায় দে, রউদ লাগব না।

আরো কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে যখন আর মাছের সাড়া পাওয়া যায় না, তখন করিম বকশ্ বলে—কী জানি এইর'ম আইতাছে ক্যান্। তোরা কাপড় উল্ডা কইর‍্যা পিন্দা নে, দেহি কী অয়।

করিম বক্শ নিজেও গামছা পরে লুঙ্গি ছাড়ে। লুঙ্গির দিক পালটিয়ে নিয়ে আবার পরে।

এবার করিম বক্শ এক চাক গজার মাছের পোনার পেছনে লাগে। কিন্তু গজারটা খুবই চালাক। পোনার কাছাকাছিও ঘেঁষে না। মাছটা বড়ই হবে খুব, করিম বক্শ অনুমান করতে পারে। পোনাগুলিও বড় হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে পরে এক সঙ্গে ভেসে ওঠে। এক জায়গায় থাকলেও কথা ছিল। এই এখানে দেখা যায়, তারপর আর নেই। কোথায় গেল? কোথায় গেল? করিম বক্শ এদিক-ওদিক তাকায়। কিছুক্ষণ পরে ভুস্ করে ভেসে ওঠে। করিম বক্শ মুখে কিছু না ব'লে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। হারুন আস্তে আস্তে অনুসরণ করে।

পোনাগুলি খেতের পর খেত পার হয়ে চলেছে। ঘোলাপানি ছেড়ে আসে কালো পানিতে। করিম বক্শ তবুও হাল ছাড়ে না।

এবার একটা জলা খেত পার হয়ে পোনাগুলি ধানখেতে ঢোকে। করিম বক্শ কোঁচটা রেখে যুতি হাতে নিয়ে আবার মনোযোগ দেয়। পেছনে হাত দেখিয়ে নৌকার গতি মন্থর করার নির্দেশ দেয়। নিজেও সে নুয়ে এক হাতে ধানগাছের গোছা ধরে নৌকার গতিরোধ করে।

কাসু!

হাসুর ডাক। করিম বক্শ চমকে ওঠে। চেয়ে দেখে সে জয়গুনের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে।

জয়গুন, মায়মুন ও হাসু দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এদিকে। জয়গুন এখন গাছের আড়ালে চলে গেছে।

কাসু ডাক শুনে দাঁড়িয়েছিল। করিম বক্শ বলে—ব' হারামজাদা। বইয়া পড়! পইড়্যা যাবি।

তারপর হারুনের কাছ থেকে লগি নিয়ে জোর ঠেলায় সে নৌকা ছুটায় বাড়ির দিকে।

জয়গুন চেয়ে থাকে যতক্ষণ নৌকাটা দেখা যায়। কাসুকে তিন বছরের রেখে সে এসেছিল। এখন সে বড় হয়েছে। কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু দূর থেকে মুখখানা আদৌ দেখা গেল না। এখন বড় হয়ে সে মুখখানা কেমন হয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও মনে মনে তা গড়তে পারে না জয়গুন।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আতে– হাতে। **কাডুরিয়ার–** কাঠুরিয়ার। **ক্যা–** কেন? **খেজমতে–** খেদমতে। **জিগাইল–** জিজ্ঞাসা করলো। **তিরুডি–** ত্রুটি। **পিডে–** পিঠে। **ফেরেববাজ–** ফন্দিবাজ। **বিস্তে–** বেহেশতে। **বুঝিন–** বুঝিবা। **হাজাইয়া–** সাজাইয়া। **হাশরের দিন–** শেষ বিচারের দিন। **হেই–** সেই।

সারসংক্ষেপ

জয়গুন ও হাসু এক সঙ্গেই কাজে বের হয়। ট্রেনে নানান রকমের মানুষ দেখে জয়গুন। তাদের আলোচনায় জয়গুন স্বাধীনতার কথা শোনে। দেশ স্বাধীন হলে চাল সস্তা হবে– একথা শুনে জয়গুনের খুব ভালো লাগে। ট্রেনের কামরার মধ্যে জয়গুনের দুই সঙ্গী লালুর মা ও গেদির মা। বাজারে এসে তারা তিন রকমের চাল কেনে। তারপরে তিন রকমের চাল মিশিয়ে ছয় বস্তা করে। প্লাটফরমে সেপাইকে চাল ঘুষ দিতে হয়। স্টেশনে ট্রেন পৌঁছানোর আগে একটা নির্দিষ্ট স্থানে তারা চালের বস্তাগুলো ফেলে দেয়। হাসু সেগুলো কুড়িয়ে রাখে। হাসু আজ আয় করেছে বারো আনা। করিম বকশ কঠোর মেজাজের লোক। প্রথম স্ত্রী মেহরনকে সে লাঠিপেটা করে হত্যা করেছিল। মেহরনের অপরাধ ছিল দুপুর রাতে স্বামীকে দরজা খুলে দিতে দেরি হওয়া। তারপর সে বিয়ে করে জয়গুনকে। তাকেও মার-ধরের অন্ত ছিল না। করিম

বকশ তাকে তালাক দেয় দুর্ভিক্ষের সময়ে। কাসুকে রেখে দেয় নিজের কাছে। করিম বকশ আবার বিয়ে করে আঞ্জুমানকে।

করিম বকশ চায়না কাসু তার মায়ের কথা জানুক। তাই সব সময়ে আগলে রাখে। মারধর করিম বকশের এক দারুণ নেশা। সেদিন সে মাছ ধরতে যায়। ক'দিন থেকে বৃথাই মাছের পিছনে ফিরছে। মাছের পিছনে ছুটতে ছুটতে নৌকা কখন এসে গেছে জয়গুনের বাড়ির কাছে। কাসুকে ডাকে হাসু। শব্দে করিম বকশের মাছমারা নেশা ছুটে যায়। সে দেখে তীরে হাসু-মায়মুনকে। তৎক্ষণে জয়গুন সরে গেছে গাছের আড়ালে। তারপর দ্রুত নৌকা ফিরিয়ে নিয়ে চলে বাড়ির দিকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. দেশ স্বাধীন হলে চাউলের দাম কত হবে?

ক. টাকায় দশ সের　　খ. টাকায় আড়াই সের
গ. টাকায় দেড় সের　　ঘ. টাকায় দুই বস্তা

১৪. জয়গুন ও তার সঙ্গীরা তিন রকমের চাল একসঙ্গে মেশায় কেন?

ক. ভিক্ষার চাল বলা যায়　　খ. চালের দাম পাওয়া যায়
গ. বহন করতে সুবিধা　　ঘ. মানুষ সন্দেহ করে না

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শত শতাব্দীর অবগুণ্ঠিত আশা পূর্ণ করে–
মোছাব তোমায় মুখ তোমারই আপন পতাকায়।

১৫. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে বাক্যের–

ক. স্বাদীন অইলে চাউলও হস্তা অইব।　　খ. পাপে ডুইব্যা গেছে দ্যাশ।
গ. পাপে বাপেরেও ছাড়ে না।　　ঘ. রাজার খাজনা মাপ নাই।

১৬. যে চেতনায় বাক্যটি সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো–

ক. স্বপ্নপূরণ　　খ. প্রতিরোধ
গ. স্বাদেশিকতা　　ঘ. বিশ্বাসঘাতকতা

পাঠ-৫

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ১৯৪৭ এর স্বাধীনতায় সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- জয়গুনের পরিবারে স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।
- রোজা ও ঈদ সম্পর্কে শ্রমজীবী প্রায় নিরন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- জয়গুনের বাৎসল্য স্নেহের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

[ছয়]

১৫ই আগস্ট শুক্রবার, ১৯৪৭ সাল।

হাসু মা-কে মোড়ল পাড়ায় নামিয়ে দিয়ে রেল-রাস্তার পাশে আসে। রোজ সেখানে কোষা ডুবিয়ে রেখে সে কাজে যায়। রাস্তায় উঠেই সে চমকে ওঠে। চারদিক থেকে চিৎকারের ধ্বনি শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হল না ত!

রেল-রাস্তা ধরে সে ভয়ে ভয়ে পা ফেলে। মারামারি বাধলে কোনো কাজই হবে না আজ। গত বছর এমন দিনে মারামারি বেধেছিল। পনেরো দিন সে ঘরের বার হতে পারেনি। তিনদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।

একটা গাড়ি আসছে নারায়ণগঞ্জ থেকে। ইঞ্জিনের সামনে একটা নিশান পত্‌পত্‌ করছে বাতাসে। সবুজ রঙের বড় নিশান। মাঝে চাঁদ ও তারা।

গাড়ির মাঝেও চিৎকার। চারদিকের চিৎকারে আকাশ-বাতাশ মুখর হয়ে উঠেছে। গাড়িটা কাছাকাছি আসতে স্পষ্ট বোঝা যায়–

আজাদ পাকিস্তান–জিন্দাবাদ!

কায়েদে আজম–জিন্দাবাদ!

হাসুর গা রোমাঞ্চিত হয় আনন্দে। সে চেয়ে থাকে। গাড়ির প্রত্যেকটি লোক আনন্দ-চঞ্চল। অনেকের হাতেই নিশান। বাইরে মুখ বাড়িয়ে নিশান নেড়ে তারা চিৎকার করছে। প্রত্যেক কামরায় ঐ একই আওয়াজ।

হাসু হাত উচিয়ে গলা ফাটিয়ে আওয়াজ তোলে ঐ সাথে।

মানুষের বিরাট মিছিল চলছে শহরের রাস্তা দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান ছেলে বুড়ো–সবাই আছে মিছিলে।

হাসু দাঁড়িয়ে দেখছিল। মিছিল সে বহু দেখেছে। কিন্তু এরকম আর দেখেনি। একজন কাগজের একটা নিশান ওর হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় লাইনে। হাসু মিছিলের সাথে মিশে যায়। কাজের কথা তার মনেই হয় না।

মিছিল শহরের সমস্ত রাস্তা ঘোরে। চিৎকার করে জানায় স্বাধীনতার বার্তা।

মিছিল ভাঙে দেড়টায়। হাসু তাড়াতাড়ি স্টেশনে আসে। মেল স্টিমার এখনও আসেনি। হাসুর ভাগ্য ভালো। আর দিন আসে একটার মধ্যেই।

তিনটার সময় মেল আসে। জাহাজের সামনে ঠিক ছাদের ওপর উড়ছে সবুজ নিশান। জাহাজের ডেকে লোক ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। ছাদেও উঠেছে অনেক লোক, সেখান থেকে আওয়াজ ওঠে–

পাকিস্তান–জিন্দাবাদ!

কায়েদে আজম–জিন্দাবাদ!

পাড়ের থেকে একদল তাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে। জাহাজখানা যেন কেঁপে ওঠে। সমস্ত মিলে একটা নতুন অনুভূতির সঞ্চার হয় হাসুর মনে।

দুটো মোট বয়ে আজ দশ আনা পায় হাসু। অন্য দিন দর কষাকষি হয়। তিন আনা বড় জোর চার আনার বেশি মোট পিছু দিতে চায় না। কিন্তু আজ আর পয়সার দিকে যেন খেয়াল নেই কারো।

আজ আর কাজ করবে না হাসু।

পথে আসতে আসতে সে দেখে, শহরের প্রত্যেক বাড়িতে নিশান উড়ছে বড় বড়। সে তার হাতের কাগজের নিশানটার দিকে চায়, আবার চায় দুই পাশে। ডানে হিন্দু পাড়া, বাঁয়ে মুসলমান পাড়া। সব বাড়িতেই আজ সবুজ নিশান।

হাসু বাড়ি আসে। চিৎকার করে সে গলা ভেঙেছে আজ। ভাঙা গলায় সে সমস্ত দিনের কথা বলে যায় মা-র কাছে। জয়গুন হাসুর হাত থেকে নিশানটা নিয়ে দেখে আর শুনে যায় হাসুর কথা এক মনে।

হাসু বলে–আর আমাগ কষ্ট অইব না, কেমুন গো, মা? মাইন্‌ষে কওয়াকওয়ি করতে আছে ঘাড়ে পথে। দ্যাশ স্বাদীন অইল। এইবার চাউল হস্তা অইব। মানুষের আর দুক্‌খ থাকব না।

–হুঁ। জয়গুন সায় দেয়। সে-ও সেদিন গাড়িতে শুনেছে, দেশ স্বাধীন হবে। ভাত-কাপড় সস্তা হবে। কেউ না খেয়ে মরবে না।

জয়গুনের সুখের স্বপ্ন আজ সফল হলো। সত্যি সত্যি স্বাধীনতা এল আজ।

হাসু বলে–টাউনে আইজ বেবাক বাড়িতে নিশান ওড়তে আছে, মা। কী সোন্দর বড় বড় নিশান! তুমি একটা বানাইয়া দ্যাও, মা।

জয়গুন হাতের নিশানটা দেখিয়ে বলে–এই যে আছে একটা। আর দিয়া কী অইব?

—এইডা যে এক্করেই ছোড। গাছের ডাইলে বাইন্দা উপরে তুলতাম, মা। গেরামের বেবাক মাইন্ষে দ্যাখতে পাইব। টাউনে কত বড় বড় নিশান ওড়তে আছে আইজ!

জয়গুন ঘরে যায়। একটা গাঁট্রি নামায় মাচার ওপর থেকে। লাল কাপড়ের একটা টুকরো বের করে হাসুকে দেখায়।

উহুঁ, রাঙ্গায় অইব না, মা। এই রহম কচুয়া অওয়ন চাই। হাতের নিশানটা দেখিয়ে প্রতিবাদ করে হাসু।

—ক্যাঁ? রাঙ্গায় দোষ কী? কী সোন্দর খুনী রঙ! মীরপুরের শাহ সা'বের দরগায় দেইক্যা আইলাম লাল নিশান।

—টাউনের এক বাড়িতেও রাঙ্গা নিশান দ্যাখলাম না। বেবাক এই রহম কচুয়া।

আসমানী রঙ্গে অইব?

—উহুঁ, কইলাম যে এই রঙ।

তোর লাইগ্যা এই রঙ বানাইলে পারি অহনে। জয়গুন রাগ করে। সে আর একটা গাঁটরির জন্যে উঠতেই হাসু খুশি হয়।

গাঁট্রি খোলে জয়গুন। পুরাতন কাপড়ের গাঁট্রি। কালি-ঝুলি মেখে বিশ্রী হয়ে গেছে গাঁটরিটা। খুলতে খুলতে তার হাত অবশ হয়ে আসে। বুকের ভেতর স্পন্দন বেড়ে যায় অসম্ভব রকম। জীর্ণ পুরাতন কাপড় ভাঁজ করে করে সাজান। জয়গুনের বিগত জীবনের অনেক কাহিনী কাপড়গুলোর মধ্যে পুঞ্জীভূত। ভাঁজ খুলতে খুলতে তার স্মৃতির ভাঁজও খুলে যায়। এই টুপিটা তার প্রথম স্বামীর—হাসুর বাপের। ঢোলা পাঞ্জাবিটাও তার। জয়গুনের চোখে ভাসে, কিশতি টুপি মাথায় পাঞ্জাবি গায়ে জব্বর মুন্শীর চেহারাখানা। ...এই বোম্বাই শাড়িটা তার প্রথম বিয়ের। ঘোমটা-টানা বধু জীবনের সুমধুর স্মৃতি এখন শুধু ব্যথাই দেয়। ...এই ছোট্ট জামাটা কাসুর। এই জামা আর কানটুপিটা ছোট খুকির।

জয়গুনের চোখ আর বাঁধ মানে না। চোখের পানিতে গাঁট্রির কাপড়গুলো ভিজে ওঠে। ছোট খুকি!

তখন দুর্ভিক্ষ সবে দেখা দিয়েছে। দুর্নামের ভয়ে স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুন তখনও ঘরের বার হয়নি। খেতে না পাওয়ায় তার বুকে দুধ ছিল না। দুধের শিশু দুধ না পেয়ে শুক্নো পাটখড়ির মতো হয়েছিল। শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন মারা গেল। তাকে কবর দিতে কাফনের কাপড় জোটেনি। এই বোম্বাই শাড়ীটার অর্ধেক দিয়ে কাফন পরিয়ে যখন কবরে নামান হয় তখন জয়গুন বিলাপ করতে করতে বলেছিল— "আইজ তোরে বউ সাজাইয়া দিলাম।"

জয়গুন আর ভাবতে পারে না। একমাত্র সবুজ বোম্বাই শাড়ীটার অবশিষ্ট পাট্টা হাসুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে কাপড়গুলোর মধ্যে মুখ লুকায়।

হাসু ও মায়মুন অবাক হ'য়ে চেয়েছিল মা-র দিকে! তারা কিছু বুঝতে না পেরে শাড়ীর পাট্টা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

মায়মুন সুঁই নিয়ে আসে। সাদা কাপড়ের চাঁদ ও তারা কেটে নিশানের মাঝে জুড়ে দেয়।

বেশ সুন্দর নিশান হয়েছে। ঠিক সায়েব বাড়ির নিশানটার মতো। মায়মুন উৎফুল্ল হয়। হাসুর চোখে-মুখে হাসি ফোটে।

জয়গুন যখন বাইরে আসে, তখন হাসু আম গাছে উঠে নিশানটা বেঁধে দিয়েছে। মায়মুন ও শফি চেয়ে আছে ওপর দিকে।

গাছের থেকে হাসু ডাকে—মায়মুন! শফি! আমি যা কই আমার লগে লগে আওয়াজ করবি, কেমুন?

শফি বলে—কী কইমু?

—পাকিস্তান—জিন্দাবাদ!

হাসুর সাথে গলা মিলিয়ে শফি ও মায়মুন আওয়াজ তোলে। জয়গুনের মনে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে কথাগুলো।

জয়গুন নিশানটার দিকে তাকায়। সবুজ নিশান নতুন জীবনের আভাস দিয়ে যায়। মনে জাগে বাঁচবার আশা।

[সাত]

চারদিকে আনন্দ-কোলাহল। মায়মুন ডাকে—মা, চান ওঠছে বুঝিন, ঈদের চান।

মায়মুন দৌড়ে যায় বাড়ির পশ্চিম দিকে। শফি এসে দাঁড়ায় ওর পাশে। পশ্চিম দিগন্তের রঙিন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ওরা তন্ন তন্ন করে খোঁজে চাঁদ। জয়গুন এসে যোগ দেয়।

মায়মুন বলে—কই মা?

—অই সাঁঝুয়া তারাডার কাছ দিয়া দ্যাখ্। ওডার নিচে দিয়াই দ্যাহা যায় হগল বচ্ছর।

—অই, ঐ যে দ্যাহা গেছে, ঐ ঐ ঐ! শফি লাফিয়ে ওঠে আনন্দে, মায়মুনকে টেনে আঙুল দিয়ে দেখায়—ঐ যে তারাডার একটু নিচে। কালা মেঘডার পাশে।

মায়মুন দেখতে পেয়ে আনন্দে হাত তালি দেয়। জয়গুন এখনও দেখতে পায়নি। সে বলে—আমাগ কি হেই দিন আছে! তোগ নতুন চউখ। তোরা দ্যাখতে পাবি।

—তুমি অহনও দ্যাহ নাই মা! মায়মুন এবার মা-কে দেখাতে চেষ্টা করে। জয়গুন দেখতে পায় অনেক পরে। ভক্তিতে সে মাথা নোয়ায়, দু'হাত তুলে মোনাজাত পড়ে।

—এক্কেরে কাচির মতন চিক্কন এইবারের চান। সিদা অইয়া ওঠ্ছে। আর হগল বচ্ছরের মতন কাইত অইয়া ওডে নাই। মোনাজাত সেরে বলে জয়গুন।

চাঁদটা মেঘের আড়ালে চলে গেলে জয়গুন আবার বলে—চল, ইফতার খুলি গিয়া।

শফির মা-র ঘরের কাছে যেতে সে ডাকে—চান্ দেখলিনি, হাসুর মা?

—হ বইন। দ্যাখলাম। বড় ছোড এইবারের চান।

তোরাই দ্যাখ্ বইন, তোগ চইখ দিছে খোদায়। আমার একটা চউখ, হেইডাও বুঝিন্ বুইজ্যা গেল।

শফির মা নিশ্বাস ছাড়ে। এমনিতে-ই সে লবেজান। তার ওপর রোজা রেখে সে বিকালের দিকে খুবই কাহিল হয়ে যায়। সে আবার বলে—চাইর-পাঁচদিন পরে ছাড়া আমি দ্যাকতে পারমু না। চানডা সিয়ানা অউক। আ-গো হাসুর মা, —এইবার কোন্ মুহি কাইত অইয়া ওঠ্ছে গো চানডা? দহিণমুহি?

—এইবারে সোজাসুজিই ওঠ্ছে বইন। ব্যাকা-ত্যাড়া ওডে নাই। লক্ষণ ভালা, না?

—হ বইন, আর আহাল অইব না এইবার দেহিস্। যা কইলাম যদি না ফলে তহন কইস, কানা বুড়ি কী কইছিল।

শফির মা'র কুঁচকে যাওয়া শুকনো কালো মুখখানা খুশিতে ভরে ওঠে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সে মুখখানা দেখে জয়গুনেরও ভরসা হয়। ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই বিশ্বাস করে শফির মা'র কথাগুলো।

শফির মা বলে—হেই আকালের বচ্ছর পঞ্চাশ সনে দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া ঈদের চান উঠছিল। আমি নিজে দেক্ছি। চউখ তহন তাজা আছিল্। আমি দেইক্যা কইছলাম তহন—এইবার না জানি কী আছে কপালে।

—দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া ওঠ্লে আকাল অইবই। বুড়া-বুড়ির কাছে হুনছি, দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া চান যদি সমুদ্দুরের ওপরে নজর দেয়, তয় বান ডাইক্যা দ্যাশ-দুইন্নাই তলাইয়া যায়। দেখলি না অই বচ্ছর কেমুন—

—কত বচ্ছর পর এইবার সিদা ওঠ্ছে চান। খোদা বাঁচানেওয়ালা।

এফতারের সময় উৎরে গেছে। জয়গুন ঘরের দিকে পা দেয়। মায়মুন বলে—উত্তর মুহি কাইত অইয়া ওঠ্লে কী অয় মা?

—মড়ক লাগে। কলেরা-বসন্ত অয়। মানুষ মইর‍্যা সাফ অইয়া যায়।

মায়মুন শিউরে ওঠে।

ওজু করে জয়গুন ঘরে যায়। শেষ রোজার ইফতারের জন্য আজ একটু আলাদা আয়োজন—চার ফালি শশা ও এক খোরা গুড়ের শরবত। আর সব দিন এক মগ সাদা পানি সামনে করে সে বসে থাকত বেলা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত! এমন করে খাবার সামনে নিয়ে ইফতারের জন্য বসে থাকা অনেক পুণ্যের কাজ, সে জানে। মসজিদের আজান ইফতারের সংকেত জানালে সে এক ঢোক পানি খেয়ে রোজা ভাঙত।

জয়গুন একচুমুক সরবত খেয়ে মায়মুনের সামনে ঠেলে দেয় বাটিটা। মায়মুন বাটিটা নিয়ে চুমুক দিতেই জয়গুন বলে—মজা পাইয়া বেবাকহানি খাইয়া ফেলাইস না আবার। তোর মিয়াভাইর লাইগ্যা থুইয়া দিস।

শশার এক ফালি মায়মুনের হাতে দিয়ে জয়গুন এক ফালি তুলে নেয়। বাকি দুই ফালি রেখে দেয় হাসুর জন্যে।

শশা চিবোতে চিবোতে সে গত কয়েক বছরের কথা মনে করে। পঞ্চাশ সনের পর থেকে সে এ রকম পুরো তিরিশ রোজা রাখতে পারেনি। চার বছর পর এবার তিরিশ রোজা পুরিয়ে তার মনে শান্তির অবধি নেই। কিন্তু গত বছরগুলির চিন্তাও

তাকে পেয়ে বসে। পঞ্চাশ সনে একটা রোজাও রাখা হয়নি। তার পরের বছর ছয়টা, তার পরে পাঁচটা এবং গত বছর সাতটা রোজা ভাঙা হয়েছে– সে মনে করে রেখেছে! জয়গুন হিসেব করে দেখে, এ কয় বছরে সে দু' কুড়ি আটটা রোজা ভেঙেছে। নামাজ-রোজা সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি তার জানা। প্রথম স্বামী জব্বর মুন্‌শীর দৌলতেই তা সম্ভব হয়েছে। সে জানে, রমজানের একটা রোজা ভাঙলে তার বদলে তিনকুড়ি রোজা রাখতে হয় তবেই গোনা মাফ হয়।

জয়গুন হিসেব করতে চেষ্টা করে। আগেও সে করেছে কয়েকবার। একটা রোজার জন্যে ষাটটা হ'লে দু'কুড়ি আটটার জন্য কতদিন রোজা রাখতে হয়। সে হিসেব করতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে ফেলে। একশো পর্যন্ত সে ভালোমত গুনতে পারে না। 'এককুড়ি' 'দুই কুড়ি' করে সে হিসেব করে। সুতরাং সে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু তবুও সে আন্দাজ করে নিয়েছে–অনেক বছর, হয়ত বা বাকি জীবনভর রোজা রেখেও সে আটচল্লিশ দিনের রোজা শোধ করতে পারবে না। সে আরো জানে, একটা রোজার জন্যে আশি হোক্‌বা দোজখের আগুনে পুড়তে হবে। এক একটা হোক্‌বা ইহকালের আশি বছরের সমান।

জয়গুনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে নামাজ সেরে তসবিহ নিয়ে বসে। তসবিহ জপা এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। তার আবার মনে হয়, কেন? সে-ত জীবনভর রোজা রেখেই চলেছে। রোজা ছাড়া আর কী? বারো মাসের একদিনও সে পেট ভরে খেতে পায় না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আধপেটা খেয়ে থাকে। পেট ভরে কবে সে শুধু দু'টো ভাত খেয়েছে তার মনে পড়ে না। পঞ্চাশ সনের কথা মনে হয়। একটা রোজাও রাখা হয়নি। রোজা রাখার কথা মনেও হয়নি। এক বাটি ফেনের জন্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে কত জায়গায়, কত বাড়িতে বাড়িতে তাকে ঘুরতে হয়েছে। এক বাটি খিচুড়ির জন্যে লঙ্গরখানায় লাইন ধরতে হয়েছে।কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আধ-হাঁটু কাদার মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়েছে। মাথায় ওপর বৃষ্টি পড়েছে, রোদ জ্বলেছে। তার বেশি জ্বলেছে পেটের মধ্যে। যখন যেখানে যতটুকু পেয়েছে, খেয়েছে। পেট ভরেনি। পানি খেয়ে খেয়ে পেট ভরেছে। তার পরের বছরগুলিও চলেছে অতি কষ্টে। ছেলেমেয়েকে খাইয়ে কতদিন উপোস করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে সারারাত সারাদিন কেটেছে একটা দানাও পড়েনি পেটে। রমজান মাসের রোজার চেয়েও যে ভয়ঙ্কর এ রোজা। রমজানের একমাস দিনের বেলা শুধু উপোস। কিন্তু তার বারোমেসে রোজার যে অন্ত নেই।

কিন্তু তবুও জয়গুনের শান্তি নেই, সান্ত্বনা সে পায় না। তার অন্যায়ের জন্য সে খোদার কাছে প্রার্থনা করে।

হাসু আসে রাত আটটায়। মোট বয়ে বারো আনা পেয়ে সে চার আনা দিয়ে একটা নারকেল নিয়ে আসে। জয়গুন দেখে রাগ করে–তোর আর আক্কল অইব কোনোদিন! অত পয়সার নাইকল কিনতে গেলি ক্যান?

–ঈদের দিন এট্টু শিন্নিও খাইমু না?

–নাইকল বেগর আর শিন্নি অয় না! নোয়াবের পো নোয়াব! নাইকল বেগরই পাকাইমু আমি। অইডা বেইচ্যা ফালাবি কাইল।

হাসু ক্ষুণ্ন হয়। বলে–থাউক আর শিন্নি রানতে অইব না, পান্তা ভাত আর মরিচ-পোড়া খাওয়া কপাল। বচ্ছরের একটা দিন আর শিন্নি খাইয়া কী অইব!

জয়গুন চুপ করে। খানিক পরে আবার বলে–পরাণে খাইতে চায়, খাও। পয়সা কামাই করবা, খাইবা, আমার কী? দুই দিন বাদে যহন হুকাইয়া তেজপাতা হইয়া যাইবা, তহন বোঝবা শিন্নির মজা!

খাওয়ার পর জয়গুন বাঁশের চোঙাটা নামায়। পয়সা রাখবার একমাত্র আধার এ চোঙাটা। মাটির ওপর ঢালে সমস্ত পয়সা। আনি, দুয়ানি, সিকি আলাদা আলাদা সাজিয়ে হিসেব করে। হাসুর আজকের আট আনাসহ মোট তিন টাকা দশ আনা। চাল কিনতে হবে। তেল, মরিচ, আরো অনেক কিছুই নেই। অনেক কিছুর মধ্যে লবণটা না কিনলেই চলে না। লবণ একটু বেশিই লাগে তার সংসারে। পান্তা ভাত খেতেই বেশি খরচ হয় লবণ।

হাসু বলে–একটা টুপি কিনার পয়সা দিবা, মা? কাইল ঈদের ময়দানে কী মাথায় দিয়া যাইমু?

–তোর টুপি কিনন লাগত না। টুপি একটা দিমু তোরে, তয় কাসুর লাইগ্যা একটা টুপি–

হাসু সম্মতি-সূচক মাথা নেড়ে বলে–ওর একটা টুপি কিনতে আর কত লাগব? এই বড় জোর পাঁচ আনা, ছয় আনা।

মায়মুন একটু এগিয়ে মা'র দিকে চেয়ে ডাকে–মা।

–কী? থাইম্যা গেলি ক্যান? ক'।

পরিহিত কাপড়ের একটা ছেঁড়া জায়গা দেখিয়ে মায়মুন বলে—দ্যাহ মা, কেমুন ছিঁড়্যা গ্যাছে। ঈদের দিনে বেড়াইতে যাইমু না?

মেয়ের আবদার বুঝে রাগ হয় জয়গুনের। সে বলে—কী? কাপোড়?

—হ!

—হ! কাপোড়! কাপোড় দিয়া কবর দিমু তোরে শয়তান। ধাক্কা দিয়ে মায়মুনকে সরিয়ে ভেঙচিয়ে ওঠে জয়গুন।

হাসু মায়মুনের দিকে তাকায়। ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

মায়মুন তাড়া খেয়ে শুয়ে পড়েছে। জয়গুন ডাকে—হাসুর গামছাটা পিন্দা কাপোড় খুইল্যা দে মায়মুন, সিলাইয়া দেই। কাইল রাইত পোয়াইলে সোডা দিয়া ধুইয়া দিমুহনে।

জয়গুন সুঁই-সুতা নিয়ে বসে। নিজের ও মায়মুনের কাপড়ে জোড়াতালি লাগায়।

হাসু ও মায়মুন ঘুমিয়ে পড়েছে। মশার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে। জয়গুন ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে মশা তাড়ায়।

সেলাই সারতে অনেক রাত হয়। রাত্রির নীরবতা ভেঙে হঠাৎ ডাহুক 'কোয়াক—কোয়াক' করে ওঠে। চারদিকে পশুপাখির ঘুম-কাতর সাড়া পাওয়া যায়। ঘরের হাঁস দু'টোও প্যাঁক— প্যাঁক করে আবার ঠোঁট লুকায় পালকের মধ্যে। জয়গুন ভাবে—পইখ-পাখলার এক ঘুম হয়ে গেল।

জয়গুন কুপিটা নিবিয়ে মায়মুনের পাশ দিয়ে শুয়ে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। অভ্যাসবশে মায়মুনও মা-র গলার ওপর একখানা হাত লতিয়ে দেয় ঘুমের ঘোরে। জয়গুনের বুক স্নেহে ভিজে ওঠে। সে ভাবে এ মেয়েটি কোনো দিন তার কাছে আদর পায় না। আবদার করলে কিলথাপ্পড় খায়। কাপড় তার একখানা। তাও তালি দিয়ে দিয়ে এতদিন চলেছে। কিন্তু কাল ঈদ—বছরের সেরা দিন। এ কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করা চলে, কিন্তু কুটুম্ব-বাড়ি যাওয়া চলে না। আর কুটুম্ব আছেই বা কে?

হাসুর চাচা আছে দু'জন। কিন্তু তারা হাসুর মৃত্যুই কামনা করে। জব্বর মুন্‌শীর মৃত্যুর পর তার ভাগের তিন বিঘা জমি আর ঘরখানা পর্যন্ত হাসুর চাচা দু'জন জোর করে ভোগ-দখল করছে। এগুলোর আশা জয়গুন ছেড়েই দিয়েছে। হাসু বড় হয়ে যদি কোনোদিন আদায় করতে পারে।

জয়গুন আবার ভাবে—হাসু ও মায়মুনের কপালে কুটুম্ব-বাড়ির এক মুঠো ভাত লেখা নেই।

জয়গুন মায়মুনের চুলের কাছে হাত দেয়। আঙুলের সাথে জড়িয়ে আসে এক গোছা চুল।

মায়মুন কোনো কিছুর আবদার করলে বা কোনো অন্যায় করলে সে চুল ধরে টান মারত। টান্‌তে টান্‌তে সে-ই আলগা করে দিয়েছে চুলগুলো। চুলগুলোর জন্যে তার মায়া হয়। চুলের মুঠি ধরে টানাটানি না করলে তার চুল এতদিন হয়ত কোমর অবধি লম্বা হত।

জয়গুন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, মায়মুনকে আর সে মার-ধর করবে না। অন্ততঃ তার চুল ধরে আর সে টানাটানি করবে না।

মেয়ে ব'লে মায়মুনকে এতদিন সে অনাদর করেই আসছে। কিন্তু আর না। হাসু কোলের আর মায়মুন পিঠের—তাতো নয়! দু'জনকেই সে পেটে ধরেছে। আর মেয়ে হলেও মায়মুন লক্ষ্মী। সে বাইরে গেলে মায়মুনই সব কাজ করে। গায়ে এতটুকু জোর না থাকলেও কোনো কাজ সে বড় ফেলে রাখে না।

মায়মুনের জন্যে আর কোনো দিন জয়গুন এমন করে ভাবেনি। আজ হাসু ও মায়মুন তার চোখে সমান হয়ে গেছে।

অল্প কয়েকটা মাত্র চুল মায়মুনের মাথায়। বাঁদরের লোমের মতো লালচে। যত্ন ও তেলের অভাবে জট পাকিয়ে গেছে। জয়গুন অন্ধকারে মাথা হাতড়ে উকুন মারে। উকুনে গিজগিজ করছে মাথা। রাত্রে রাত্রে এমনি করে মেরে সে কমিয়ে রেখেছে। নয় তো উকুনের আণ্ডা-বাচ্চায় এতদিন মাথা ছেয়ে যেত। তার নিজের মাথায় উকুন টিকতে পারে না। নানা চিন্তা-ভাবনায় মাথা গরম থাকে বলেই বোধ হয়।

অনেক রাত হয়েছে। উকুন বাছতে বাছতে মায়মুনের মাথায় হাত রেখেই জয়গুন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আমাগ– আমাদের। **কচুয়া–** কচুর মতো। **লগে লগে–** সঙ্গে সঙ্গে। **চান–** চাঁদ। **এক্কারে–** একেবারে। **মুহি–** মুখে। **ডাইক্যা–** ডেকে। **নাইকল–** নারিকেল। **বেগর–** ছাড়া। **সাঁঝুয়া–** সাঁঝের, সন্ধ্যার। **লবেজান–** অস্থির। **কাইত–** কাত। **আহাল–** আকাল। **দুইন্নাই–** দুনিয়াই। **নোয়াব–** নওয়াব। **রাজা–** বাদশা অর্থে। **হুকাইয়া–** শুকাইয়া, শুকিয়ে।

সারসংক্ষেপ

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল। শহরে চারদিকে চিৎকার শুনে হাসু থমকে যায়। প্রথমে ভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের দিক থেকে ট্রেন আসতে দেখে সে। সামনে একটি পতাকা উড়ছে। সবুজ রং এর পতাকা– ভেতরে চাঁদ ও তারা। ট্রেনটি কাছে আসতে বোঝা যায়। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই এ পতাকা। ট্রেনের প্রতিটি কামরার মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত। শহরে বিরাট আনন্দ মিছিল বের হয়। হাসুও সে মিছিলে শরিক হয়। আজ কাজ করে দশ আনা আয় করে হাসু। অন্যদিনের মতো এত দরকষাকষি করতে হয়নি। সবাই যেন একটা আনন্দে ভাসছে। হাসু বাড়িতে এসে জয়গুন আর মায়মুনকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। দেশে কারো দুঃখ কষ্ট থাকবে না– চাল সস্তা হবে। শুনে জয়গুন অভিভূত হয়। হাসু তাদের গাছে শহরে দেখা পতাকার মতো পতাকা টাঙাতে চায়। জয়গুন কাপড়ের পুঁটলি খোলে। কিন্তু পতাকার রং এর মতো রং এক কাপড় পাওয়া কঠিন হয়। কাপড়ের পুঁটুলি খুলতে যেয়ে কত কথা মনে পড়ে জয়গুনের।

ঈদের চাঁদ উঠেছে। সবার মতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছে জয়গুনের পরিবার। ঈদের চাঁদ যেন সৌভাগ্যের প্রতীক। মায়মুনকে সঙ্গে নিয়ে শেষ ইফতার করে জয়গুন। হাসুর ভাগটা রেখে দেয়। জয়গুন ঠিকমতো গুনতেও জানে না। অনেক রোজা তার করা হয়নি। এজন্য আল্লাহর কাছে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়– সারাজীবনই তো সে রোজা রাখছে। হাসু আসে রাত আটটায়। আজ তার আয় হয়েছে বারো আনা। চার আনা দিয়ে সে একটা নারিকেল কিনে এনেছে। জয়গুন তা দেখে রাগ করে। গভীর রাতে মায়মুনের কাপড় সেলাই করে জয়গুন। ঘুমন্ত মায়মুনকে দেখে জয়গুনের বাৎসল্য স্নেহ তীব্র হয়ে উঠে। মেয়েটি কত কাজ করে তবু জয়গুন তাকে মারধর করে– চুলের মুঠি ধরে টান মারে। এসব কথা ভেবে জয়গুনের মন খারাপ হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. ঈদের চাঁদ কীভাবে উঠেছে?

ক. সিদা　　খ. ব্যাকা-ত্যাড়া
গ. দক্ষিণ মুহি　　ঘ. কাইত

১৮. 'কচুয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. কচু পাতার রঙ　　খ. খুনি রঙ
গ. আসমানি রঙ　　ঘ. বোম্বাই শাড়ির রঙ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রহিমা ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। মজিদের সাথে দীর্ঘ দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করলেও সে কখনো জোরে হাসার চেষ্টা করেনি। সালু-আবৃত মাজারের আশেপাশে যারা আসে তারাও কখনো হাসে না। পিরের খাদেম মজিদের নির্দেশ– মুসলমানের মেয়ের হাসি কেউ কখনো শুনে না।

১৯. উদ্দীপকের রহিমা চরিত্রের সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. জয়গুন　　খ. আঞ্জুমান
গ. মায়মুন　　ঘ. সালেহা

২০. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে–

ক. প্রতিবাদী সত্তায়　　খ. ধর্মভীরুতায়
গ. অনুপম চিত্রকল্পে　　ঘ. দুরন্ত সাহসে

পাঠ-৬

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- রেশন সামগ্রী ফাঁকি দেওয়ার একটি চিত্র আঁকতে পারবেন।
- জয়গুনের বাড়িতে ঈদ পালনের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দরিদ্র পরিবারের সন্তান মায়মুন ও শফির একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- জয়গুনের মানসিক বৈশিষ্ট্যের কিছু নমুনা তুলে ধরতে পারবেন।
- দরিদ্রতর জীবনের কিছু পরিচিতি তুলে ধরতে পারবেন।

মূলপাঠ

[আট]

খুরশীদ মোল্লা গ্রামের ফুড কমিটির সেক্রেটারি। ঈদের দিন ভোর হওয়ার সাথে সাথে তার বৈঠকখানার বাইরে জড় হয় অনেক লোক। কেউ কেউ ভেতরেও আসে।

খুরশীদ মোল্লা একটু দেরিতেই ঘুম ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে চৌকির উপর এসে বসে। তার মুখে বিরক্তির স্পষ্ট আভাস সবার চোখেই ধরা পড়ে। গ্রামের মোড়ল কাজী খলিল বক্‌শ ও গদু প্রধান চৌকির ওপর সেক্রেটারির পাশে বসে পড়ে।

খুরশীদ বলে–দেখুন তো কী ঝঞ্ঝাট। ভোর না হ'তেই বাড়ি মাথায় করে তুলেছে সব। ঈদের দিন এই উৎপাত কার ভালো লাগে? চিনি এসেছে মাত্র ক'মণ, আর গ্রামে লোক হচ্ছে দু'হাজার! এক তোলা করেও পড়বে না মাথা পিছু।

কাজী খলিল বক্‌শ উপস্থিত একজনকে উদ্দেশ করে বলে–আমাগ মতন গরীব মাইন্ষের আবার ঈদ কী? ঈদ অইল আপনেগ লাইগ্যা, বড়মিয়া সাব। হ্যা-হ্যা-হ্যা।

কাজী মোড়ল ভ্রূকুটি করে। আস্তে আস্তে সে সেক্রেটারিকে বলে–এ হারামজাদাকে এক কণা চিনিও দিতে পারব না, কইয়া রাখলাম।

গদু প্রধান এতক্ষণে কথা বলে–কি মোল্লার পো, চা অইব নি? তারপর নিজেই হাঁক দেয়–ওরে নসুয়া, চা দিয়া যা দুই কাপ।

রোজ ভোরে খুরশীদ মোল্লার বাড়িতে তাগাদা দিয়ে চা খাওয়ার অভ্যাস তার। ভুলেও তার একদিন বাদ যায় না। রোজার মাসে মুখ বন্ধ ছিল বলে এক মাস মোল্লা গদু প্রধানের হাত থেকেই রেহাই পেয়েছিল। মুখ খোলার সাথে সাথেই তার আগমনে খুরশীদ মোল্লা বিরক্ত হয়। সে খলিল বক্‌শের দিকে চেয়ে বলে–আপনি খাবেন না, কাজীর পো?

–হ, খাইমু। খাইমু না ক্যান? তুমি ত বা'জান চিনির রাজা।

খুরশীদ হাঁক দেয়–তিন কাপ–তিন কাপ ক'রো চা।

খলিল বক্‌শ বলে–আর যা কর কর–আমার ছয় সের চাই-অই। এইডুক না অইলেই অইব না। তুমি জ্ঞাত আছ, এক পাল পৈষ্যের সংসার আমার।

গদু প্রধান বলে–আর যা কর কর–আমার ছয় সের চাই-অই। এইডুক না অইলেই অইব না। তুমি জ্ঞাত আছ, এক পাল পৈষ্যের সংসার আমার।

গদু প্রধান বলে–আমার পাঁচ সের আগে রাইক্যা, তারপর ভাগ কর। পাঁচ সের না পাইলে ফাডাফাডি আছে তোমার লগে।

–কাকে রেখে কাকে দেই? আচ্ছা, দেখা যাবে। এ পাঁয়তারা আর কদ্দিন ভালো লাগে, বলুন! বিনে পয়সার চাকরি! ইচ্ছে হয় ছেড়ে দিই এই মহূর্তে।

–না না, ছাড়বা ক্যাঁ? তুমি না অইলে–

–ব্যাপার দেখুন না। এই খাটছি, তবু নাম নাই। সবাই বলে চোর।

—কোন্ শালা কয়? দেইক্যা নেই তার গর্দানে কয়ডা মাথা।

চা আসে। তিনজন তিনটা বাটি নিয়ে চুমুক দেয়। জমিদারের পাইক এসে এক টুকরো কাগজ সামনে ধরে। খুরশীদ মোল্লা পড়ে একটু ব্যস্ত হয়ে বলে—ভবানীবাবু বাড়ি এসেছেন নাকি? আর কে কে এসেছেন?

—না, তিনি একলাই আইছেন! দিন চাইরেক থাকবেন। চা খাওনের লাইগ্যা তাই—

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে বলতে হবে না আর। মাত্র পাঁচ সের ত? তুমি যাও। আমি নিজেই দিয়ে আসব' খন। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি আসব।

চা শেষ করে খুরশীদ মোল্লা দোয়াত কলম নিয়ে উবু হয়ে বসে। দুই টুকরো কাগজে দু'টো পারমিট লিখে খলিল বক্শ ও গদু প্রধানের হাতে দিয়ে বলে—চার সের করে লিখে দিলাম আপনাদের। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারদের দিতে হবে আবার।

বাইরের লোক এতক্ষণে উতলা হয়ে গেছে। কেউ কেউ চলেও গেছে এর মধ্যে।

এবার খুরশীদ মোল্লা উঠে তাদের উদ্দেশ করে বলে—আমি কী করতে পারি, বল তোমরা। গভরমেন্ট মোটে সাপ্লাই দেয় না, তার আর—হ্যাঁ শোন অল্প কিছু চিনি আছে হাতে। মাথা পিছু এক তোলা করেও পড়বে না। তার চেয়ে বরং এক কাজ করলে হয়, আবার যখন চিনি আসবে, তার সাথে মিলিয়ে ভাগ করে দেওয়া যাবে।

একজন আর একজনকে বলে—চল্ যাইগা। এই সব না দেওয়ার ছল-চক্কর। এইহানে হাত্তা ধইরা থাক্লে জামাত্ পাওয়া যাইব না।

সব লোক সরতে আরম্ভ করে। খুরশীদ মোল্লা আবার বলে—কী করবে আর। গুড় কিনে নাও গে।

একজন বলে—গুড়ের সের দ্যাড় টাকা। আমরা কি অত পয়সার গুড় কিন্যা খাইতে পারি মিয়া সাব? রেশনের চিনি অইলে তয়—

কথা শেষ না হতেই আর একজন বলে—আপনেরাই ঈদ করেন। আপনেগ দিন দিছে খোদায়—ঈদ করতে দিছে।

কথাগুলি কোনো রকমে হজম ক'রে খুরশীদ মোল্লা অন্দরে যায়। এক্ষুণি জমিদার বাড়ি যাওয়া তার দরকার।

হাসু এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। সে এবার বাজারের পথ ধরে।

বাজারের একটা জায়গায় সারি সারি গুড়ের হাঁড়া ও জালা সাজিয়ে দোকানদাররা বসেছে। আজ এদিকে খুব ভিড়। মাছি-মৌমাছিও ভিড় করেছে গুড়ের ওপর। কয়েকটা ভিখারি ছেলে গুড় কেনার নামে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সমস্ত হাঁড়ার গুড় চেখে বেড়াচ্ছে। এক দোকানির তাড়া খেয়ে একটি আধ-পাগলা ভিখারি ছেলে বলছে—অমন কর ক্যান? ঈদের দিন এটটু মিডা মুখ করি, মিয়া ভাই। হিঁ-হিঁ-হিঁ।

দোকানিরা খরিদ্দারের সাথে দর কষাকষি করে, গুড় মেপে দেয় আবার মাঝে মাঝে গামছা নেড়ে মাছি তাড়ায়।

হাসু একটা হাঁড়ি থেকে আঙুল দিয়ে একটু গুড় নিয়ে বলে—একটু কড়া জ্বালের। দ্যাট্টাকা কইর‍্যা দিবানি? হে অইলে দ্যাও এক পোয়া।

—উহুঁ। এক টাকা বারো আনার এক আধলাও কম না।

পেছন থেকে একজন হাসুকে টান দেয়। সে হাসুদের প্রতিবেশী কেরামত। সে বলে—মিডাই না কিন্যা চিনি লইয়া যা। এই দ্যাখ আমিও কিনলাম। দুই টাকা কইর‍্যা চিনি। মিডাইর তন ভালা বরকত দিব।

—কোন ঠাঁয়।

—লতিফ মোল্লার দোকানে। খুরশীদ মোল্লার ভাই লতিফ মোল্লা। পিছ-দুয়ার দিয়া যা চুপ্চাপ।

হাসু বলে—ওঃ ফুড কুমুড়ির চিনির এই দশা! হেইত আমরা কই, চিনিগুলা কই যায়?

—আর কইস না। ব্যালাক চালাইয়া ব্যাডা ফুইল্যা গেল।

হাসু একটু চিন্তা করে বলে—থাউকগা, মিডাই কিন্যা লইয়া যাই।

হাসু বাজার নিয়ে বাড়ি আসে।

খেতে বসে হাসু ও মায়মুন। খাওয়ার সময় সুড়ুত সুড়ুত শব্দ হয় ওদের মুখে।

হাসু বলে—শিন্নি পান্‌সা অইয়া গেছে মা, মিডা হয় নাই এক্কেরেই।

জয়গুন বলে—যেমন গুড় তেমন মিডা। তিন পোয়া চাউল এক পোয়া গুড়। মিডা অইব কেমনে?

—নাইকল দেওনে তবু একটু সোয়াদ আইছে, না মা?

—হ। আলাচাউল অইলে দেখতি কেমুন মজা অইত! সিদ্ধ চাউলে আর কী অইব?

—আরেট্টু দ্যাও, মা।

—উঁহু, অহন আর না। ঈদগার তন আইয়া খাবি।

—ঈদের দিনও এট্টু মনাচ্ছি মতন খাইমু না?

—তোগই পেট আছে, অ্যাঁ? আর কেঅর নাই? শফিডারে এটটু দিয়া আইতে অইব। ওগ ঘরে যে কিচ্ছুই পাক অয় নাই।

হাসু এবার চুপ করে। মায়মুনের পাতেরটা শেষ হয়ে গেছে। সে আঙুল দিয়ে তখনও চাট্‌ছে থালাটা।

জয়গুন বলে—অহন আত ধো। তুই দ্যাখতে আছি বাসনডা ভাইঙ্গা খাইতে চাস।

মায়মুন লজ্জিত হয়। থালায় পানি ঢেলে সে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে।

জয়গুন হাসুকে বলে—মাচার উপরতন কালা কাপড়ের গাট্টিডা নে। ওডার ভিতরে একটা টুপি আছে। ওডা তুই নে, আর নতুডা কাসুরে দিয়া আয়।

—আমি পারতাম না মা। হাসু বলে।

—ক্যাঁ?

ঐ দিনের চরকি দিতে যাওয়ার বিপদের কথা হাসু মা-কে বলেনি।

সে বলে—আমি ঈদগায় যাইমু, মা। নামাজের ওকত অইয়া গেছে। তুমি আর কেঅই রে দিয়া—

—আর কারে পাডাই? তুই-ই যাওনের কালে এট্টু ঘুইর‍্যা ওইহান অইয়া দিয়া আয়।

—হাসু আর গোপন রাখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলে সেদিনের সব কথা।

জয়গুন অসহায়ের মতো তাকায় ছেলের মুখের দিকে। শেষে বলে—আগে কস্ নাই ক্যাঁ? এত পয়সার টুপিডা ফালাইয়া দিমু? তোর মাতায়ও লাগব না।

—কানা মামানিরে দিয়া পাডাইয়া দ্যাও।

কথাটা জয়গুনের পছন্দ হয়। শফির মা বুড়ো মানুষ। সে নিয়ে গেলে করিম বক্‌শ লজ্জায় কিছু বলবে না হয়তো। রাখতে পারে। তা' ছাড়া ঈদের দিন। খুশির দিনে সে হয়ত রাগ করবে না।

হাসু গাঁটরি খোলে। বাপের কিশতি টুপিটা বের করে মাথায় দেয়। টুপিটা অনেক বড় হয়েছে। কান পর্যন্ত ডুবে যায় টুপির মধ্যে।

জয়গুন হাসুর দিকে এক নজর চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে আর তাকাতে পারে না।

হাসু গামছটা কাঁধে ফেলে কোষায় চড়ে। শফির মা এবং শফিও ওঠে কোষায়। হাসুকে ঈদগার রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে শফির মা শফিকে নিয়ে করিম বক্‌শের বাড়িতে যাবে। এখন যাওয়াই ভালো। করিম বক্‌শ এখন বাড়িতে নেই। নামাজ পড়তে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

শফির মা টুপিটা দিয়ে নিরাপদেই ফিরে আসে।

জয়গুন খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করে কাসুর কথা।

—টুপিডা ঠিক অইল নি মাতায়?

—হ, টুপিডা মাথায় দেওনে এমন সোন্দর দেহাইল কাসুরে! কী কইমু তোমারে—যেন একটা পরীর বাচ্চা!

শফির মা আবার বলে—সময় বুইঝ্যা গেছিলাম গো। করিম বক্‌শ বাড়িতে আছিল না। নামাজ পড়তে গেছিল। ওর বউরে তালিম দিয়া আইছ। টুপি যে তুমি দিছ, তা হে কইব না। হে কইব, হে-ই কিন্যা দিছে।

জয়গুন নিশ্চিন্ত হয়। তার ভয় ছিল করিম বক্‌শ হয়তো ছেলেটাকে মারতে শুরু করবে।

শফির মা বলে—করিম বক্‌শের বউ মানুষ ভালা, খুব হাসিখুশি। আমারে পিঁড়ি দিল বসবার। নিজেই এই এত বড় একটা আস্ত ধলডোগ পান ছেঁইচ্যা দিল।

জয়গুন বলে—কাসু কিছু কইল?

—উঁহু। ও আমার মোখের দিগে চাইয়া আছিল! এক্কেরে এতিমের মতন—যেন বাপ-মা নাই।

—তুমি কোলে নিলা না?

—নিলাম ত। আমার কোলের তন আর কি নামতে চায়! এক্কেরে বুকের লগে মিশ্যা আছিল। তারপর কত কোস্তাকুস্তি কইর‍্যা কান্দাইয়া নামাইয়া থুইয়া আইলাম। কী জানি, করিম বক্‌শ আইলে আবার কী কাণ্ড কইর‍্যা ফালায়।

জয়গুন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করবার চেষ্টা করে।

[নয়]

জয়গুন ও হাসু আজ সকাল সকালই বেরিয়ে গেছে।

মায়মুন হাঁস দুটো খাঁচা থেকে বের করে পানিতে ছেড়ে আসে।

এবার সে হাঁসের বাচ্চা দুটো বের করে ঘরের মেঝের ওপর ছেড়ে দেয়। নিজেও হাত দুটো মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে চেয়ে থাকে। হলুদ রঙের বাচ্চা দুটো কেমন সুন্দর হাঁটে আর চিঁপ-চিঁপ করে। মায়মুনের আনন্দ হয়।

কাল মায়মুন বাচ্চা দুটো নিয়ে এসেছে। সোনাচাচি বলে দিয়েছে—আমারে এক আলি আণ্ডা দিবি। আমারে না খাওয়াইলে পাতিহিয়ালে ধইর‍্যা লইয়া যাইব তোর আঁস, কইয়া রাখলাম।

মায়মুন স্বীকার ক'রে এসেছে। সোনা চাচিকে প্রথম প্রথম দুই দিনের ডিম সে দেবে। তাকে আগে না খাইয়ে নিজেরা ছোঁবেও না ডিম।

কাল বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আসার পর থেকে মায়মুন ওগুলোকে নিয়েই কাটিয়ে দেয়। কখনও মাটির ওপর ছেড়ে দেয়, আবার কখনো বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। রাতে শুতে যাওয়ার সময়ও সে বাচ্চা দুটো কাছ ছাড়া করতে চায় না।

জয়গুন ধমক দিয়ে বলে—সুখে থাকতে ভূতে কিলায়? খাঁচার নিচে রাইখ্যা আয় জলদি। না' লে চুল ছিঁড়্যা ফালাইমু টাইন্যা।

মায়ের ধমকের কাছে মায়মুন এতটুকু হয়ে যায়।

বাচ্চাদুটো খাঁচার নিচে রেখেই সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার ঘুম আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত সজাগ থেকে সে শুনতে পায় বাচ্চা দুটোর ডাক। মাঝে মাঝে চিঁপ্‌চিঁপ্ করে ওঠে ওগুলো। শিশুর কান্নায় অসহায় মায়ের মতো অবস্থা হয় মায়মুনের।

মা চলে যাওয়ার পর মায়মুনের পূর্ণ স্বাধীনতা। এবার তাকে বলবার কেউ নেই। বাচ্চা দুটোকে খাঁচার মধ্যে রেখে সে উঠানের দক্ষিণ পাশে লাউ মাচার নিচে একটা জায়গা বেছে নেয়। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চৌকা একটা গর্ত করে। পানি ঢেলে সেটাকে ভরে। তারপর বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দেয় তার মধ্যে।

হাঁসের বাচ্চা দুটোর নতুন অভিজ্ঞতা। জন্মাবার পর এই প্রথম তারা পানির পরশ পায়। সেজন্যে পানিতে ছেড়ে দিতেই ভয় পেয়ে ওপরে উঠে আসে। মায়মুন ভাবে—দু'দিন গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। বড় হাঁসের মতোই সাঁতরাবে তখন।

মায়মুন গর্তটার চারদিকে কতগুলো লম্বা পাটখড়ি পুঁতে দেয়। এমনি ভাবে লাউ মাচার সমান উঁচু করে সে একটা বেড়া বানিয়ে ফেলে। চিল বা বাজ ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে না পারে, সে জন্যে এ সতর্কতা।

মায়মুন বাড়ির চারপাশ ঘুরে ছোট বড় নানা রকমের শামুক কুড়িয়ে আনে। দা দিয়ে সেগুলোর খোসা ছাড়ায়। তারপর কুচি কুচি করে কাটতে কাটতে গান গায়—

শামুক খাজারে, আমার বাড়ি আয়,
কুচি কুচি শামুক দিমু হলদি দিমু গায়,

ওরে শামুক খাজারে।
তোর বাড়ি অনেক দূরে, সাত পাক ঘুইরে ঘুইরে
আমার বাড়ি আয়।

শফি এসে পাশে দাঁড়ালে মায়মুনের গান বন্ধ হয়ে যায়।

শফি বলে—এগুলা দিয়া কী করবি?

মায়মুন কিছু না বলে হাঁসের বাচ্চা দুটো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

—দে আমি কাইট্যা দেই।

—উঁহু আমিই পারি কত কাটতে।

মায়মুন একটা পাতায় করে কুচি কুচি করে কাটা শামুক নিয়ে বাচ্চা দুটোর সামনে ধরে। বাচ্চা দুটো কয়েকবার ঠোঁট দিয়ে নেড়ে খেতে শুরু করে।

শফি বলে—বাহ্ খাইতে শিখছে রে! কেমন ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ কইরা খায়! দ্যাখ্ চাইয়া।

—দেখছি।

মায়মুন বসে বসে দেখে।

শফি বলে—আমারে একটা বাচ্চা দিবি?

—ইশ্!

—পয়সা দিমু আষ্ট খান।

—উঁহু এক ট্যাহা দিলেও না।

—ফুলঝুরি দিমু। আর চুলের কিলিপ।

মায়মুন বলে—উঁহু সাত রাজার ধন মাণিক্য দিলেও না।

—না দিলে চুরি কইর‍্যা লইয়া যাইমু তোর আঁস, কইয়া রাখলাম।

মায়মুন এবার চেঁচিয়ে ওঠে—মামানি, ও মামানি, দ্যাখ তোমার পোলা কেমুন লাগাইছে। তারপর হাঁসের বাচ্চা রাখবার গর্ত থেকে পানি ছিঁটিয়ে দেয় শফির চোখেমুখে।

শফির মা-ও শফিকে ডাক দেয়—অ্যারে শফি, কী শুরু করলি? আমি আইলে ঠ্যাঙ ভাঙুম কিন্তু।

—না মা, ফাঁকিজু। দিলাম আমি।

কলাগাছের ভেলায় চড়ে শফি ও মায়মুন মোড়লদের ছাড়া ভিটেয় যায় লাক্‌ড়ি কুড়াতে। শফি জঙ্গলের ভেতর দিকে নিয়ে যায় মায়মুনকে। শফি গাছে উঠে শুকনো ডাল ভেঙে নিচে ফেলে। মায়মুন কুড়িয়ে জড়ো করে এক জায়গায়।

শফি গাছে চড়তে বেশ ওস্তাদ। এক গাছের ডাল বেয়ে সে আর এক গাছে চলে চায়। মায়মুন বলে—আর ওই মুহি যাইও না শফি ভাই, ওই গাবগাছে—

—কী ঐ গাবগাছে?

—আলেক মোড়লের বউ গলায় দড়ি দিছিল ঐ গাবগাছে, তুমি বুঝিন জান না?

—হেতে কী অইছে?

—উঁহু, আমার ডর করে। তুমি নাইম্যা আহ হবিরে।

শফি গাছ থেকে নেমে বলে—মায়মুন চাইয়া দ্যাখ দেহি, ঐ দিক ঐ গাবগাছে কালা একটা কী দ্যাহা যায়।

মায়মুন ঐ দিকে না চেয়েই ওগো মাগো বলে শফিকে জড়িয়ে ধরে। শফি জোরে হেসে ওঠে। বলে—আরে কিছু না, ফাঁট্‌কি একদম ফাঁটকি। দিনে-দুপেরে কিয়ের ডর? চাইয়া দ্যাখ্। দ্যাখ্ না ছেঁড়ি। কিছুই না, চউখ মেল এইবার।

মায়মুন তবু চোখ খোলে না।

শফি ওকে কোলে তুলে ভেলার কাছে নামিয়ে দেয়। মায়মুন এতক্ষণে চোখ মেলে। সে বলে—তুমি কী ফাজিল। খামাখা ডর দেহাইলা।

শফি হাসে হিঁ-হিঁ করে।

মায়মুন বলে—তুমি গিয়া লাকড়ি লইয়া আহ। আমি আর যাইতে পারতাম না।

শফি বাগানে যায়। শুকনো ডালগুলো একটা লতা দিয়ে বেঁধে মাথায় করে নিয়ে আসে। তারপর বাড়ি এসে দুটো ভাগ করে। নিজের ভাগের থেকে কয়েকটা ডাল মায়মুনকে দিয়ে বলে—তোরা মানুষ বেশি। এই কয়ডা বেশি নে তোরা।

বিকেল বেলায় মায়মুন তেঁতুল তলায় বড়শি নিয়ে বসে। তার কোলের কাছে হাঁসের বাচ্চা দু'টো। আবার শফি এসে জোটে সেখানে। একটা ঢিল ওর বড়শির কাছে ছুঁড়ে শফি তেঁতুল গাছের আবডালে পালায়।

মায়মুন কিছু দেখতে না পেয়ে দাঁড়াতেই হেসে ওঠে শফি—হিঁ-হিঁ-হিঁ!

মায়মুন বলে—তুমি বড় শয়তান। চাইঙ্গা মারলা ক্যান?

—কই চাইঙ্গা! মাছে লাফ দিল ছেঁড়ি। জবর মাছ অইবরে! বোয়াল মাছ।

মায়মুন মাথা নেড়ে বলে—হুঁ বোয়াল মাছ!

—হ রে হ। কি মাছ পাইছস?

—কিচ্ছুই না। একটা তিঁত্ পুডিও না।

—কিচ্ছুই না?

—উঁহু!

শফি আশ্চর্য হয়। তারপর গম্ভীরভাবে বলে—তোর বড়শিতে ক্যার জানি মোখ লাগছে রে! কেও নষ্ট না করলে এমুন অয়? আমার মনে অয়, কেও ডিঙ্গাইয়া গেছে তোর ছিপ। হেই-এর লাইগ্যা মাছ ওঠতে আছে না।

মায়মুন শফির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

শফি বলে—পোড়াইয়া নে আগুনে। ঠিক অইয়া যাইব।

শফি ও মায়মুন মাটির হাতায় আগুন নিয়ে বড়শিটা পোড়া দেয়।

তারপর একসঙ্গে সুর করে বলে—

বড়শি পুড়ি, বড়শি পুড়ি,
ট্যারা পড়শির মোখ পুড়ি,
মাছ ধরমু দুই কুড়ি।।
লোয়ার বড়শি সুতার ডোর
পুঁডি পাবদা, শিং মাগুর।।
বড়শি আমার প্যাদা
ধইর‍্যা আনব ভ্যাদা—
ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়,
পুঁডি মাছে পান চাবায়।
অ-হো-হো-হি-হি-হি-হি!

শফি ও মায়মুন দুজনে হেসে লুটোপুটি। শফি মাটি খুঁড়ে কেঁচো তুলে দেয়। মাছ কেঁচোর টোপ খায় ভালো।

মায়মুন আবার বড়শি নিয়ে বসে।

সন্ধ্যার পর সে শফির মা' র ঘরে যায়।

শফির মা বলে—আমার পানডা ছেঁইচ্যা দে তো, মায়মুন। তুই ভালা ছেঁচতে পারস। শফি পারে না। ও দিলে কোনোদিন খ'র বেশি অয়, আবার কোনোদিন চুনা বেশি পড়ে।

প্রশংসায় মায়মুন খুশি হয়। কলাপাতায় জড়ানো পান খুলতে খুলতে মায়মুন বলে—কতডুক্ নিমুগো, মামানি?

—আধ খান নে। তয় অডুকে গাল ভরে না। গাল না ভরলে কি পান খাইয়া সুখ আছে? কিন্তু কী করমু আর। গাছের পাতা, হেই-এর যে দাম! হোন্‌লে মাথা ঘোরে। দুইডা পান একটা পয়সা। আগে এক পয়সায় এক বিড়া পাওয়া যাইত।

মায়মুন ঠনর ঠনর করে পান ছেঁচতে আরম্ভ করে।

শফির মা আবার বলে—আইজ-কাইল বেবাক জিনিসই আক্রা। আগে এক ট্যাকায় আধামণ চাউল মিল্‌ত। আমার বয়সেই দেখ্‌ছি। আর অহন বেবাক জিনিসের উপর তন খোদার রহমত উইট্টা গেছে। আগে এক ট্যাকার বাজার কিনলে এক মরদের এক পোঝা অইত। আর অহন এক ট্যাকার বাজার আতের তালুতে লইয়া বোম্বাই শহর যাওয়ন যায়।

শফির মা বলেই বলে—তোর মামু একটা ইলশা মাছ আন্‌ছিল দুই পয়সা দিয়া কিন্যা। তহন শফি অয় নাই। শফি আমার পেডে। এই এ-ত বড় মাছটা। হেইডার একজোড়া আণ্ডা যা অইছিল—এই এক বিঘৎ লম্‌ফা। তখন আমার বুক জুইড়্যা ওরা ভাই বইনে চাইর জন। কত খুশি অইছিল হেই আণ্ডা দেইখ্যা!

শফির মা আর পুরাতন স্মৃতি ঘাঁটতে সাহস পায় না। সে সব সময় ভুলে থাকতেই চেষ্টা করে। কিন্তু কথায় কথায় বা একা বসে থাকলে যখন সে স্মৃতি এসেই পড়ে, তখন সে আর সহ্য করতে পারে না। বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতে শুরু করে। তার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে সে নয় সন্তানের জননী। কিন্তু একমাত্র শফিই বেঁচে আছে—বাকি আটটির চারটি আঁতুড়েই শেষ হয়। দুটি কলেরায় আর একটি বসন্তে মারা যায়। আর একটি—তার নাম মফি, শফির দুই বছরের বড় ছিল—দুর্ভিক্ষের বছর সে কোথায় হারিয়ে গেল! শফির মা আজও এ ছেলেটির আশা ছাড়ে নি। তার ধারণা মফি এখনও বেঁচে আছে।

মাঝে মাঝে শফির মা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বলে—আমার ওরা বাঁইচ্যা থাকলে এই দশা আমার? আইজ আমি খরাত কইর‍্যা খাই! ওরা বাঁইচ্যা থাকলে আমার বাদশাই কপাল আছিল। ওরা কামাই করত। ওগ বউ আইত ঘরে। ওরা রাইন্দা-বাইড়্যা সামনে ধরত। সোনার খাটে বইস্যা, রূপার খাটে পাও রাইখ্যা আমি সব দ্যাখতাম আর হুকুম করতাম। নাতি-নাতকুড় ঘিরা বইত চাইর পাশে। ক্যাঁচম্যাচ করত কিচ্ছা হোনরে লেইগ্যা।

শফির মা-র চোখ দিয়ে দরদর করে পানি গড়িয়ে পড়ে। মায়মুন দেখে আশ্চর্য হয় না। কারণ, এ আজ নতুন নয়। কখন সে কাঁদবে আর কখন কাঁদবে না—কেউ বলতে পারে না। মায়মুন ছেঁচনীর থেকে ছেঁচা পান তুলে ধরে। শফির মা মুখে দেয়।

মায়মুন এবার বলে—একখান কিচ্ছা কও না, মামানি?

—না লো। আইজ আর পরাণডা ভালা ঠেকে না।

মায়মুন আর অনুরোধ করে না। শফির মা বলে—তুই একটু দেইখ্যা আয় তো শফি কী দিয়া কী রান্‌দে। কয়ডা কলমির শাক রানব আর ভাত। কাইল ভাত ফুটছিল কম। চাউল চাউল ভাত গিল্যা গিল্যা খাইছি। দাঁত-দন্ত না থাকা আর এক জ্বালা।

মায়মুন রান্না ঘরে যায়। চুলোর ওপর বসানো ভাতের হাঁড়ি থেকে কয়েকটা ভাত তুলতে তুলতে শফিকে বলে—একটা শোলক ভাঙ্গাও দেহি শফি ভাই—

মাছ করে ঝক ঝক ছোট্ট এক ঝিলে
একটা মাছে টিপ দিলে বেবাকগুলা মিলে।

—ইশ, জবর শোলক ত। এইডা শিক্‌খা রাখছি কুট্টিকালে—ঝিল অইল আঁড়ি আর মাছ অইল ভাত! কেমুন? ইছে? এই বার একটা মাছে টিপ দিয়া দ্যাখ দেখি ফোট্‌লনি?

মায়মুন একটা ভাতে টিপ দিয়ে বলে—অইয়্যা গেছে। দ্যাখত কেমুন মজা! একটা ভাতে টিপ দিলে বুঝা যায় ফোট্‌লনি না ফোট্‌ল না।

—আর একটু ফোটতে দে। মা আবার শক্ত ভাত খাইতে পারে না।

—কাইল তুমি শক্ত শক্ত চাউল চাউল ভাত রানছিলা, মামানি কইছে। ভাত রানতেও জান না?

—আমি জানি না, কে জানে রে? টিক্কাদার সা'বের বাসায় এতকাল পাক করলাম আমি। আইজ তুই আমারে হিগাইতে আইছস?

রান্না সেরে শফি ও মায়মুন ঘরে এলে শফির মা বলে—তোর মা অহনো আইল না, মায়মুন? রাইত যে অনেক অইল!

বাইরে চ্যাবর চ্যাবর পায়ের শব্দ শোনা যায়। উঠানে কাদার মধ্যে দিয়ে কে যেন আসছে।

শফির মা ডাকে—হাসুর মা?

—হ ভাজ, আমি অই।

—আহো আমার ঘরে।

জয়গুন এসে দরজায় দাঁড়ায়। শফির মা বলে—তোর হায়াত আছে। অনেক দিন বাঁচবি তুই। এই এট্টু আগেই তোর নাম নিছিলাম।

—অহন যাই বইন। আখা ধরাইতে অইব আবার।

—আইচ্ছা যাও। আখা ধরাইয়া এট্টু এদিকে আইও, তোমার লগে কতা আছে।

—কী কতা?

—পরে কইমু। অহন যাও। চাউল কী দর আনলাগো?

—দুই সের, বইন। দর চইড়্যা গেছে। আর যা মছিবত আইজ কাইল। ট্যারেনে যা মানুষের ভিড়। জেরের এই দুই কিস্তি ধইর‍্যাই এই রহম। আগে এমন ভিড় আছিল্ না।

জয়গুন পাক চড়িয়ে শফির মার ঘরে আসে। শফির মা বলে—কয়দিন ধইর‍্যা একটা কথা কইমু কইমু করতে আছি। কিন্তু সময় মতো এট্টু একখানে বইতে পানি না। তুমি থাকলে আমি থাকি না, আমি থাকলে আবার তোমার দ্যাহাই মিলে না।

—কি কতা?

—কই, সবুর কর। পান খাইলে একটু খা, ঐ দ্যাখ তোর পিছে পাতার মধ্যে।

জয়গুন পান খেতে খেতে বলে—কী কতা এই বার কও দেখি ভাজ।

—রাখ্ না, কই। আমার এই কাপড়ডা একটু তালি দিয়া দিবি। আমি আবার সুঁইয়ে সূতা গাঁথতে পারি না। ছাই, চউখটা এক্কেবারে গেছে।

—আইচ্ছা।

—ছিঁড়া কাপড় পিন্দা বাইরে যাইতে লজ্জা করে। তুই একটু সিলাইয়া দিলে তবু বেড় দিয়া পিনতে পারমু। তোর আতে সিলাইডা অয় ভালা।

—শফিরে দিয়া পাডাইয়া দিও। এই এর লাইগ্যা বোলাইছিলা? জয়গুন উঠতে উদ্যত হয়।

—না, আরো কতা আছে, ব'।

-কও কী কতা।

—ফকিরের লগে তোর দেহা অয় না, অ্যাঁ? তোরা ত কত দূরে দূরে যাস। একদিনও চউখে পড়ে না?

—উঁহু।

—দ্যাখ দেখি কেমুন বে-য়াক্কেইল্যা! কতদিন গুজারিয়া গেল, বাড়ির পাহারা আর বদলাইয়া দিয়া গেল না। আমার ত রাইতে ঘুমই আহে না ডরে। তুইও আমল দিবি না।

—উঁহু, পাহারা বদলাইতে অইব না আর। পাহারা না ছাই। ফুক্কা দিয়া টাকা নেওনের ছল-চক্কর।

—ছল-চক্কর! তুই যে কী কস্! আইচ্ছা সূর্যু-দীগল বাড়িতে থাকতে তোর কি পরাণে ডর-ভয় লাগে না?

জয়গুন আবার উঠতে উদ্যত হয়।

শফির মা বাধা দেয়—ব'। আদত কথা তো অহনো কই নাই।

—কী আদত কতা, কও।

—তোরে আগেও কয়বার আমি কইছিলাম। তুই আমার কতা ঠেইল্যা দিলি।

—ঠেলমু না কী করুম?

—এইডা কি ঠেলনের মতো কতা!

—তয় কি?

—তোর ভাই বাঁইচ্চা থাকলে তার কতা ঠেলতে পারতি? ধইর‍্যা বাইন্ধা কবে তোর নিকা দিয়া দিত।

—তুমি মোখ বোজ দেহি। তোমার ঐ এক বুলি আমার আর কানে সয় না।

—হেইয়া সইব ক্যাঁ? আমি তোর ভালার লেইগ্যা কই কি না। বয়স ত অহনো তিরিশ অয় নাই। অহনো গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা-কাচ্চা পেডে ধরনের বয়স আছে।

জয়গুন শ্রান্ত। সে মুখ নিচু করে বসে থাকে।

শফির মা বলে—গদু পরধান মানুষ ভালা। তার পাঁচটা বলদ, তিনডা গাই। দশ মরাই ধান পায় বচ্ছর। জাগা-জমিনের ইসাব-কিতাব নাই। কাম আছে মানি। তয় আমি কই, যেইখানে কাম আছে হেইখানে ভাতও আছে। আর তোর ত একলা কাম করতে অইব না। আগের তিনডা জননা আছে পরধানের। চাইড্যা পোলার বৌ আছে। এক্কেরে সোনার বাগিচা হাজাইয়া রাখছে। ওরাই বেবাক কাম করব! তুই হুকুম দিয়া খাডাবি।

জয়গুনের মুখ ছাই-এর মতো ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে কিছু বলতে পারে না।

শফির মা আবার বলে—পরধান কাইলও আমারে ধরছিল। আমি কইলাম, পোলা আর মাইয়াডার লেইগ্যাই যত মুস্কিল। হে কইল, তা পোলা আর মাইয়াডারে আমার বাড়িতে লইয়া আইলেই ত অয়। কত মানুষ খাইয়া বাঁচে আমারডা। দুইডায় আর কী অইব! এইবার বিবেচনা কইর‍্যা তুই মোখ ফুইট্যা একটু হুঁ করলেই অইয়া যায়। সুখে থাকবি, কইয়া দিলাম।

খড়ের আগুনের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে জয়গুন—হুঁহ,. আমারে তাড়াইতে পারলে লুইট্যা-লাপইট্যা ফলার কইর‍্যা খাইতে পারবা। তা মনেও জাগা দিও না, কইয়া দিলাম।

—তোবা! তোবা! তোর চীজ ছুঁইলে যেন আত খইয়া পড়ে, তোগ গাছের একটা পাতা ছিঁড়লে যেন রাইত না পোয়ায় আমাগ।

জয়গুন যেমন জ্বলে উঠেছিল, শফির মা-র কথায় আবার নিবে যায়। সে তার স্বাভাবিক কণ্ঠে এবার বলে—না বইন, বিয়া ত দুই খানেই অইল। অনেক দ্যাখলাম, অনেক শিখলাম, আর না। পোলা মাইয়ার মোখ চাইয়া আর পারুম না, মাপ করো। পোলা আর মাইয়াডার বিয়া দেইখ্যা যেন চউখ বুজতে পারি, দোয়া কইর‍্যো।

শফির মা নিরাশ হয়ে বলে—তোর ময়মনের বিয়া দে এইবার। একটা সম্বন্ধ আছে আতে।

—না, এত শিগ্‌গির কি অইল! যাইক আর দুই বচ্ছর।

—না, না। মাইয়া তোর বিয়ার লায়েক অইছে। আর ঘরে রাখন ঠিক না।

জয়গুন একটু চিন্তা করে বলে—কোথায় সম্বন্ধ আছে?

—সদাগর খাঁরে তুই ত চিনসই। তার নাতি—সোলেমানের ব্যাডা, নামডা যেন কি! ভুইল্যা গেলাম বুঝিন অ-হো মনে পড়ছে, ওসমান। ওসমান।

—ওঃ, ওসমান। ওসমান ত বিয়া করছে!

—করছিল। বউ মইর‍্যা গেছে চৈত্ মাসে ভেদের ব্যারামে।

—কিন্তু পোলার বয়স যে অনেকখানি।

—তোর মাইয়াডার বয়সই কম কী।

—কম না? আমার মাইয়ার বয়স মোডে দশ, ধরতে গেলে দুধের মাইয়া আমার।

—দুধের মাইয়া! কী যে কস্ তোরা ছাই-মুণ্ড। মাইয়ারা এই বয়সে বাচ্চা বিয়ায়।

আমার মা-র এগারো বচ্ছরের কালে আমার জর্ম অয়।

শফির মা-র সাথে কথায় পেরে ওঠে না জয়গুন। সে বলে—আইচ্ছা ভাইব্যা চিন্তা দেহি। পরে কইমু। নছিবে যদি ঐখানে ভাত লেইখ্যা থাকে, তয় অইব। কার কোনখানে দানা-পানি লেহা আছে, খোদা জানে। অহন যাই। ওদিকে আবার ভাতের আঁড়ি না ভাইঙ্গা ফালায়।

বাইরে নামতেই চোখে পড়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সে চারদিকে চেয়ে বলে—উত্তরে আর পুবে যে মেঘ করছে, ভাজ! আইজ বুঝিন্ আসমান শুদ্ধা ভাইঙ্গা বড়ব। আইজ আর উপায় নাই। এই বষ্যাকালডা ভিজতে ভিজতে গেল। তোমার ঘরের চাল ত ভালা আছে। আমার চালে ছনই নাই।

—আমার চালে আর কই আছে? হেই কবে, গেল বচ্ছরের আগে ঠিক করছিলাম। তবু বিষ্টি পড়ে ছয় সাত জায়গায়।

—কী করমু আর! কপালে আছে ভিজতে অইব, ভিজমুই। পাঁচটা ট্যাকাও একখানে করতে পারলাম না। ঘরের চাল ছাওয়াই কী দিয়া। উদর লইয়া আর পারলাম না। উদরেই যায় বেবাক ট্যাকা।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। জয়গুন ঘরে যায়। মায়মুন রান্না শেষ করেছে।

—চালাক কইর‍্যা ভাত খা তোরা। আসমানের দিগে চাইছিলি? কাউয়ার আণ্ডার মতন কালা অইছে আসমান। আইজ আবার ঘরের মধ্যে সোত ছুটব। খাইয়া-লইয়া উত্তরমুখি বিছানা সরা।

অসংখ্য ছিদ্রপথে বৃষ্টির পানি ঝরতে থাকে ঘরের ভেতরে। তা ছাড়া দক্ষিণে বাতাসের জন্য বৃষ্টির ঝাপটা দক্ষিণ দিকটায় লাগে বেশি। তাড়াতাড়ি খেয়ে তারা বিছানা সরায় উত্তর দিকে।

জয়গুন বলে—একটা ক্যাঁথাও পাইড়্যা নেগ্যা। তারপর কুঁকড়ি মুকড়ি অইয়া শুইয়া থাক ভাই-বইনে।

বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে জোরে। সত্যি সত্যি আকাশটাই ভেঙে পড়ছে যেন। এশার নামাজ পড়ে ছেলেমেয়ের শিয়রের কাছে তসবি হাতে বসে জয়গুন। সে তসবির দানা গুণছে কি সময় গুণছে বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ কমে। কিন্তু বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয় না একেবারে। এখন যে রকম অলস বর্ষণ শুরু হয়েছে, তাতে সারা রাতেও বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। জয়গুন কাঁথার ওপর হাত দিয়ে দেখে, কাঁথাটা ভিজে গেছে। সে এক পাশে শুয়ে পড়ে।

হাসু হঠাৎ জেগে উঠে বলে—পায়ের কাছটা একদম ভিজ্যা গেছে, মা।

—তুই অহনো ঘুমাস নাই?

—উহুঁ।

আত-পা কাঁকড়ার মতো গুডিসুডি মাইর‍্যা পইড়্যা থাক।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

ছল চক্কর– ছল চাতুরী। **ফুড কুমুডি–** ফুড কমিটি। **দিনে দুপোর–** দিন-দুপুরে। **অহন–** এখন। **পেডে–** পেটে। **লমফা–** লম্বা। **খরাত–** খয়রাত। **ফুক্কা–** ফাঁকা। **নছিবে–** ভাগ্যে। **আক্রা–** বেশি দাম। **আহো–** এসো। **জর্ম–** জন্ম।

সারসংক্ষেপ

খুরশীদ মোল্লা ফুড কমিটির সেক্রেটারি। ঈদের দিন সকালে তার বাড়িতে প্রচণ্ড ভীড়। গ্রামের মানুষ রেশনের চিনি নিতে এসেছে। চিনি কম বলে– কাউকেই সে চিনি দেয় না। গ্রামের মাতব্বর জমিদার অবশ্য ঠিকই চিনি পায়। হাসু চিনি না পেয়ে বাজারে যায়। সেখানেই সে জানতে পারে চিনি কীভাবে কালো বাজারে চলে যায়। গুড় কিনে বাড়িতে ফেরে হাসু। মিষ্টিহীন পানসে যে খাবার জয়গুন তৈরি করে তাও ভাই-বোন পেটপুরে খেতে পায় না। জয়গুন ঐ খাবারেরই কিছুটা ভাগ দেয় শফিকে। কাসুর জন্য নতুন একটা টুপি পাঠায় জয়গুন। শফির মা গোপনে যেয়ে দিয়ে আসে সে টুপি।

হাঁসের বাচ্চা দুটো মায়মুনের খুব পছন্দ। সারাদিন সে সেগুলোর পিছনেই থাকে। শফিও মায়মুনের সঙ্গে থাকে। শফির মা পুরনো দিনের কথা বলে। তখনকার সস্তা চালের কথা বলে। অকস্মাৎ মৃত সন্তানদের জন্য কেঁদেকেটে আকুল হয়।

বেশ রাত করে জয়গুন বাড়ি ফেরে। শফির মার সঙ্গে কথা হয়। শফির মা জয়গুনের আবারও বিয়ে করার কথা বলে। গদু প্রধানের অনেক জমি-জিরেত, ধান-চাল। শফির মা তার সঙ্গেই জয়গুনের সম্বন্ধ করতে চায়। কিন্তু জয়গুন রাজী হয় না– বরং তেলে-বেগুনে জ্বলে যায়। শফির মা মায়মুনের বিয়ের কথাও বলে। তার কথায় মায়মুনের বিয়ের বয়স হয়েছে। সোলেমানের ছেলে ওসমান– সম্প্রতি যার বউ মারা গেছে, তার সঙ্গে মায়মুনের বিয়ের প্রস্তাব দেয় শফির মা। ছেলের বয়স অনেক। জয়গুন এ জন্য রাজী হতে চায় না। প্রবল বেগে বৃষ্টি শুরু হয়। অনেক রাত জেগে ছেলেমেয়ের কাছে বসে তসবিহ টিপে জয়গুন। বৃষ্টিতে ভিজে যায় হাসু।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. গ্রামের ফুড কমিটির চেয়ারম্যান কে?

ক. গদু প্রধান　　খ. খুরশীদ মোল্লা
গ. খলিল বক্‌শ　　ঘ. কাজী মোড়ল

২২. 'জাগা-জমিনের ইসাব-কিতাব নাই।' উক্তিটি প্রকাশ করে–

ক. সমৃদ্ধি　　খ. দারিদ্র্য
গ. হতাশা　　ঘ. আকাঙ্ক্ষা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

তরগাঁও গ্রামে একজন সাধুর আগমন ঘটেছে। তিনি আধ্যাত্মিক কেরামতি দেখাতে পারেন, নদীর স্রোতকে থামিয়ে দিতে পারেন, এমনকি মানুষের বয়সও কমিয়ে দিতে পারেন।

২৩. উদ্দীপকের সাধু 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. জোবেদ আলী ফকির　　খ. করিম বক্‌শ
গ. জব্বর মুন্সী　　ঘ. গদু প্রধান

২৪. এরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে বাক্যে–

ক. বাড়ির পাহারা আর বদলাইয়া দিয়া গেল না।　　খ. ফুক্কা দিয়া ট্যাকা নেওনের ছল-চক্কর।
গ. তুইও আমল দিবি না।　　ঘ. কী আদত কতা, কও।

পাঠ-৭

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সন্তানদের প্রতি জয়গুনের মাতৃস্নেহ ও উৎকণ্ঠার একটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- হাসুর আয়-রোজগার সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- রশীদ ঠিকাদারের অমানবিক চরিত্রটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্টেশনে হাসুর রাত্রিবাসের ঘটনার একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- রোগ-বালাই সম্পর্কিত সংস্কার সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- হাসুর নতুন কাজ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

[দশ]

এমন দিন পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্যেও সূর্যের মুখ দেখা যায় না। সারাদিন টিপিরটিপির বৃষ্টি পড়ে। হাসু ঘরের বার হয় না। শরীরটাও ভালো নেই। শরীরের সমস্ত গিঁঠে গিঁঠে বিশেষ করে ঘাড়ে টনটনে ব্যথা হয়েছে।

হাসু মা-কে বলে—গর্দানডায় বেদনা করেগো, মা। কেমুন শীত শীত লাগে।

হাসুর গায়ে হাত দিয়ে জয়গুন শঙ্কিত হয়। ছেলেটা জ্বরে পড়লে উপায় নেই আর। বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ছেলেটাকে যে ভাবে সে কাজে পাঠায় তাতে এই ছোট শরীরটার ওপর জুলুমই করা হয়। কচি ঘাড়টার ওপরেই জুলুমটা হয় বেশি। অথচ এই ঘাড়টা তাদের জীবন-মরণের কল-কাঠি। তিনটি প্রাণির জীবনের বোঝা মাথায় নিয়ে হাসুর এই কাঁচা ঘাড়টা মাঝে মাঝে ব্যথাকাতর হয়ে পড়ে।

জয়গুন নিষেধ করে—থাউক, আইজ আর কামে যাওন লাগব না। ক্যাঁথা গায়ে দিয়া হুইয়া থাক। তোরে পইপই কইর‍্যা নিষুধ করি ভারি পোঝা মাতায় নিস্ না। তা হুনবি না।

বেশি লোভ করার জন্য মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয় জয়গুন। তের বছরের এতটুকু ছেলে কামাই করে খাওয়ায় এই ত বেশি।

রোজগার করে সব পয়সা তার হাতে এনে দেয়। একটা পয়সাও এদিক-ওদিক করে না। এমন কি এক পয়সার চিনেবাদাম খেলেও তার হিসেব দেয় তার কাছে।

জয়গুন সর্ষের তেলের শিশি থেকে একটু তেল নিয়ে হাসুর ঘাড়ে মালিশ করতে করতে বলে—পায়ে তুঁইত্যার পানি দিছিলি কাইল?

—উহুঁ।

—হেইয়া দিবি ক্যান। দেহি কেমুন অইছে?

জয়গুন পায়ের ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে বলে—দ্যাখ, ক্যাদায় চামড়া খাইয়া ঝাঁজরা কইর‍্যা দি'ছে।

একটা নারকেলের মালায় তুঁতে গোলা নিয়ে আসে জয়গুন। হাঁসের পালক ভিজিয়ে হাসুর পায়ের তলায়, আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তুঁতের পানির পোচ্ দেয়।

হাসু উ-হু-হুঁ করে উঠে। বলে—আর দিও না, মা। পড় পোড়ায়।

—না দিলে চামড়া পইচ্যা যাইব এক্কেরে। আঁটতে পারবি না। রাস্তা-ঘাটে যেই ক্যাদা।

জয়গুন নিজের পায়েও তুঁতে গোলা দিয়ে প্রলেপ লাগায়। মায়মুনের পায়েও লাগিয়ে দেয়। বাড়ির উঠানে পর্যন্ত কাদা হয়েছে। পায়ের পাতা অবধি ডুবে যায় কাদায়। তুঁতের প্রলেপ দিলে পায়ের তলা অত হেজে যেতে পারে না।

পরের দিন চমৎকার রোদ ওঠে। জয়গুন হাসুর কপালে ও বুকে হাত দিয়ে দেখে। তার মুখের ওপর থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায়। প্রভাতী রোদের মত তার মুখ আনন্দে চিকচিক করে। হাসুকে ডেকে বলে, ওঠ্, দ্যাখ আইজ কেমুন রউদ ওঠছে!

হাসু উঠে বসে।

জয়গুন বলে, আমার ত ডরেই ধরছিলো। কাইল যেই রহম গরম আছিল শরীল। জ্বর ওডে নাই কপালের ভাগ্যি। কেমুন লাগছে রে শরীল?

—ভালা। আইজ কামে যাইমু, মা?

—আত-মুখ ধুইয়া আয়। খাইয়া তারপর চল্ যাই। আমিও যাইমু। চাউল ফুরাইছে। আইজ চাউল না আনলে ওই বেলা চুলা জ্বলব না।

হাসু, হাসুর মা কাজে বের হয়। হাসুর মা বার বার হাসুকে নিষেধ করে দেয়– খবরদার, ভারি বোঝা মাতায় নিবি না কিন্তুক। গর্দান ভাইঙ্গা যাইব।

কিন্তু হাসু দু'দিনের কাজ একদিনে করার সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কাল কাজ হয়নি। আজ বেশি কাজ করে অন্তত কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া তার চাই-ই।

হাসু নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে আসে।

আজকাল যাত্রীর সংখ্যা খুবই বেড়েছে। বাইরের থেকে যেমন বহুলোক আসছে, আবার বাইরেও যাচ্ছে তেমনি। বিশ্রামঘরে গাদাগাদি হয়ে আছে লোক। জাহাজে গাড়িতে জায়গা হয় না। অনেক যাত্রীকেই দু-তিন দিন স্টেশনে পড়ে থাকতে হয়। ছেলেমেয়ে মা-বউ নিয়ে আবার অনেক বিদেশি আশ্রয় নিয়েছে স্টেশনের চালা ঘরে।

হাসু মোটের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘোরে আর এদের দিকে চায়। তার অদ্ভুত লাগে এদের পোশাক। এদের কথাও বোঝা যায় না—হুসু কাছে দাঁড়িয়ে শুনেছে! এক জায়গায় একটি স্ত্রীলোক রুটি সেঁকতে শুরু করেছে। দুটি ছেলেমেয়ের লোলুপ দৃষ্টি তার ওপর। রেল লাইনের পাশেও এক জায়গায় সে এরকম আরো অনেক লোক দেখেছে আজ। হাসুর মনে পড়ে দুর্ভিক্ষের বছরের কথা। এরকম ভাবে মায়ের সাথে সাথে গাছতলায় কত রাত কেটেছে। বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় নিতে গিয়ে কত লোকের তাড়া খেয়েছে। হাসু অনুমান করে, নিশ্চয় ওদের দেশে আকাল এসেছে।

যাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও হাসু সুবিধা করতে পারে না। নম্বরি কুলিদের জন্যে মোট ধরবার যো নেই। যাত্রী বেড়ে যাওয়ায় বরং অসুবিধা হয়েছে। ভিড়ের জন্যে ঘাটে জাহাজ ধরবার আগেই জেটির গেট বন্ধ হয়ে যায়। নম্বরি কুলি ছাড়া অন্য কুলিরা ঢুকতে পারে না। সে পানি সাঁতরে স্টিমারে ওঠে। কিন্তু নম্বরি কুলিরা দেখতে পেলে মাথার ওপর গাট্টা মারে। হাসু এই কুলিদের খুবই ভয় করে।

ট্রেন ও স্টিমারের সময় হাসুর মুখস্থ হয়ে গেছে। একটা ট্রেন আসবে দশটায়। দশটা বাজবার এখনো দেরি। হাসু রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে যায়। এগারেটার জাহাজে যারা যাবার তারা সাধারণত এখানেই নামে রিক্সা থেকে।

এক ভদ্রলোকের মাল-পত্র নিয়ে দু'জন নম্বরি কুলির মধ্যে বচসা শুরু হয়েছে। হাসু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

একটা কুলি বলে—ছোড়দে। আপনি কিসকো লিবেন, বাবুজি?

আর একটা রিক্সা এসে থামে। চড়নদার ভদ্রলোকের সাথে ছোট একটা স্যুটকেস ও বিছানা। বোঝাটা বেশি ভারি হবে না। হাসুর মাথার পক্ষে উপযুক্ত বোঝাই। হাসু এগিয়ে যায়। স্যুটকেস ধরে জিজ্ঞাসা করে—কুলি লাগব নি, বাবু?

ঝগড়ায় রত কুলিদের একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বী কুলিকে বোঝাটা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে আসে। হাসুকে হাত দিয়ে সরিয়ে বলে—ভাগ ব্যাটা।

হাসু নিঃশব্দে সরে যায়। একটা লাইট-পোস্টে পিঠ্ ঠেকিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। রিক্সায় কোনো যাত্রী এলে সে আগেই আন্দাজ করে, ঘাড়ে কুলাবে কিনা। তার উপযোগী মোট না হলে সে এক পা নড়ে না, লাইট-পোস্টের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে সে দাঁড়িয়েই থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি বা মোট পাওয়া যায়, তাও নম্বরী কুলিদের ফাঁকি দিয়ে লওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দূরে হুইসিল শোনা যায়। একটা ট্রেন আসছে। হাসু স্টেশনে ঢোকে। ট্রেনেই যা কিছু সুবিধা করা যায়। এখানে নম্বরি কুলিদের ফাঁকি দেওয়া যায়। পেছনের দিকের গাড়িগুলোর থেকে মোট নিয়ে সরে পড়লে তারা দেখতে পায় না। কিন্তু এখান থেকে মোট বয়ে রিক্সায় তুলে মোট পিছু দু'আনার বেশি পাওয়া যায় না। পথ কম বলে দু'আনার বেশি আশাও করা যায় না। জাহাজের মোটে পয়সা বেশি। মোট পিছু চার আনা। এখানকার দুই মোটের সমান। কিন্তু খাটুনিও ডবল।

ট্রেন থামতেই হাসু চটপট উঠে পড়ে পেছনের একটা গাড়িতে। একটা মোট দু'আনায় ঠিক করে। যাদের মাল-পত্র কম তারা এ রকম ছোট কুলিই খোঁজে। এদের দু'আনা দিলেই খুশি হয়। বড় কুলিরা চার আনার কমে রাজি হয় না।

হাসু গাড়ি থেকে নেমে দেখ-না-দেখ সরে পড়ে।

বারোটার মেল ও একটার স্পেশাল জাহাজ ধরে হাসু রোদে এসে দাঁড়ায়। তার সমান আকারের আরো পাঁচ-ছ'টি কুলিও গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে আসে। ওভারব্রিজের রেলিং-এ সকলে সারি সারি গামছা রোদে দেয়।

গামছা পরে সাঁতার দিয়ে স্টিমারে উঠতে হয় তাদের। নম্বরি কুলি ছাড়া জেটির দরজা দিয়ে অন্য কুলিরা ঢুকবার সুযোগ পায় না। তারা সাঁতার দিয়েই অনেক সময় স্টিমারে ওঠে।

হাসু ও অন্যান্য খুদে কুলিরা বসে বসে গল্প করে। একজন একটা বিড়ি ধরায়, কয়েকজন তার দিকে হাত বাড়িয়ে চেয়ে থাকে, কে কার আগে নিয়ে টানবে।

একজন বলে—শীত লাগছেরে। দে দেহি বিড়িডা, একটা টান দিয়া লই।

আর একজন বলে—ওয়াক থু ওর মুখের বিড়ি টানিস না। ছি! ও মেথরের পোলা।

—মেথর বুঝি মানুষ না? রমজান বলে। —পয়সা পাইলে মেথর-গিরিও করতে পারি। চাই পয়সা। রমজান হাতে তুড়ি দিয়ে দেখায়।

জনপ্রতি দুটো করে টান দেয়ার পর ফেলে দেয়া হয়েছিল বিড়িটা। যে ছেলেটা মেথর বলে থুক ফেলেছিল, সে এবার বিড়িটা তুলে টানতে আরম্ভ করে।

একটা ছেলে গলা ছেড়ে সিনেমার গানে টান দেয়—মালতি লতা দোলে—

রমজান হাসুকে ডাকে—ও দোস্ত খুব ভালা একটা সিনেমা আইছে। যাইবেন নি আইজ?

হাসু বলে—না দোস্ত মা রাগ করব।

—চলেন না আইজ। তিন আনার পয়সা মোডে। আমার গাঁটের পয়সায়ই না অয় দেখবেন।

—উহুঁ।

রমজান আর পীড়াপীড়ি করে না।

রমজান হাসুর বন্ধু ও খুদে কুলিদের সরদার। রমজানকে সবাই ভয় করে। তার কথামত সবাইকে চলতে হয়। তবে হাসুকে খুবই খাতির করে সে।

রমজান বলে—তরশুর তন তোরা আমার লগে এক জায়গায় কামে লাগবি।

হাসু জিজ্ঞাসা করে—কোন্‌খানে দোস্ত?

—হোসেন দালালের নাম হোন্‌ছেন? নতুন ধনি হোসেন দালাল?

একজন বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনছি। পাডের দালালি কইর‍্যা বস্তাবস্তা ট্যাকা করছে ব্যাডা।

রমজান বলে—হ্যাঁ, হেই হোসেন দালাল! খানপুরে তেতলা দালান খিঁচব এইবার। হেই জায়গায় কাম আছে।

—কি কাম?

—ইট ভাঙ্গবি, ইট টানবি, পানি তুলবি। এক ট্যাকা কইর‍্যা রোজ।

সবাই রাজী হয়।

রমজান আবার বলে—আমারে মাথা পিছু সরদারি দিবি এক আনা কইর‍্যা। দ্যাখ, যদি মনে খাডে লাইগ্যা যা তোরা সবাই।

এখানে সারাদিনে দশ বারো আনার বেশি পাওয়া যায় না। কোনোদিন তার চেয়েও কম পওয়া যায়। সুতরাং কেউ অমত করে না।

ছয়টার ট্রেন ধরে হাসু পয়সার হিসাব করে। মাত্র তেরো আনা হয়েছে। একটা টাকার কাজও হল না। কোমরে-বাঁধা জালির মধ্যে পয়সাগুলো গুঁজে সে এক জায়গায় বসে। হাসুর সাথীরা সব চলে গেছে। রোজ এমন সময় সেও বাড়ির দিকে পথ নেয়। কিন্তু আজ সাতটার স্টিমারটা দেখেই যাবে সে। মা হয়তো বসে থাকবে তার জন্যে। দেরি হলে রাগ করতে পারে। কিন্তু একটা টাকা পুরিয়ে নিলে রাগ না করে সে হয়তো খুশিই হবে।

ছড়ি হাতে এক ভদ্রলোক হাসুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাত থেকে সিগারেটের শেষাংশ ছুঁড়ে ফেলতেই হাসু মাটি থেকে তা কুড়িয়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করে। দোস্তের পাল্লায় পড়ে কয় দিন হয় সে বিড়ি টানতে শিখেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে বিড়ি টানতে মন্দ লাগে না হাসুর।

সাড়ে সাতটার পরে স্টিমার আসতে দেখা যায়। হাসু তিন নম্বর জেটির দিকে দৌড়ায়। গেট বন্ধ হয়ে গেছে। হাসু ফিরে এসে গামছা পরে লুঙ্গিটা বেঁধে নেয় মাথায়।

স্টিমারটা ঘাটে ধরতেই সে সাঁতার দেয়। আজ একা একা তার ভয় করে। অন্য সময় ছয় সাত জন মিলে নদীর পানি তোলপাড় করতে করতে তারা জাহাজে ওঠে।

যে ফ্লাটের গায়ে স্টিমারটা ধরেছে তার একটা কাছি বেয়ে বয়ে সে আগে ফ্লাটের উপর ওঠে। লুঙ্গি পরে গামছার পানি নিঙরে সে শরীরটা মুছে নেয়। তারপর ফ্লাটের কিনারার সরু পথ ধরে ধরে স্টিমারে উঠবার সিঁড়িতে যায়। ভিড় গলিয়ে এবং নম্বরি কুলিদের চোখ এড়িয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে।

এক মোটা ভদ্রলোক কুলির সাথে দরাদরি করছেন—চার আনায় যাবে? অল্প মাল আমার, সব শুদ্ধ দশ সেরও হবে না।

—ছয় আনা রেট আছে সাব। কমে অইব না।

—না, যাও। চার আনার বেশি দেব না আমি। কুলিটা চলে যেতেই হাসু এগোয়—কুলি লাগব নি, বাবু।

—লাগবে ত। কত নিবি?

—আপনে খুশি অইয়া যা দ্যান।

—তবে মাথায় নে। চল জলদি।

মোট মাথায় নিয়ে হাসু অনুমান করে—কোথায় দশ সের? স্যুটকেসটার ওজনই বিশ সেরের কাছাকাছি হবে। যেন সীসা ভরা আছে স্যুটকেসটায়। তার ওপর বিছানা। হাসুর মাথায় ভারি লাগে বোঝাটা। ভদ্রলোক এবার ওপর থেকে খবরের কাগজ ও একটা হাতব্যাগ নিয়ে হাসুর হাতে চাপিয়ে দেন।

জেটি পার হবার সময় একজন ডাকেন—আরে রশীদ, তোর জন্যে সাড়ে ছ'টা থেকে অপেক্ষা করছি। তোর বাড়িতে খবর নিয়ে জানলাম তুই আজ আসছিস।

দু'জনের করমর্দন ও কুশলবার্তার পরে আলম সাহেব বলেন—তোর জন্যে অপেক্ষা করছি কেন জানিস?

—আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ। কোথায় বল দেখি?

—প্যারাডাইসে, হুজ্জতুল্লা আর নির্মল বসে আছে। তুই না হলে যে জমেই না।

রশীদ সাহেব বলেন—যে রকম দেখছি তাতে পাকিস্তানে সোমরস পান বুঝি আর সম্ভব হবে নারে।

-সব বে-রসিক।

আলম সাহেবের সাথে রশীদ প্যারাডাইস ক্যাফেতে গিয়ে ওঠেন।

হাসুকে বলে যান—তুই বোস এখানে বাইরে।

হাসু মোট নামিয়ে বসে থাকে। 'ক্যাফের' ঘড়িতে ন'টা বাজে। কিন্তু সাহেবের বের হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। বসে থাক্‌তে থাক্‌তে হাসুর বিরক্তি ধরে যায়। একবার মনে হয়—স্যুটকেসটা নিয়ে ভেগে গেলে কেমন হয়? কিন্তু তারপরই সে নিজেকে শুধরে নেয়।

রশীদ সাহেব বাইরে এসে চলতে আরম্ভ করেন। হাসু অনুসরণ করে। ওভারব্রিজের কাছে আসতে হাসুর পা আর চলতে চায় না। বোঝা মাথায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা খুবই কষ্টকর। ক্ষুধায় হাসুর শরীর দুর্বল। তার ওপর এমন ভারী বোঝা।

হাসু বলে—একটু ধরেন, জিরাইয়া লই।

—চলে আয়। এতটুকুর জন্যে জিরিয়ে কাজ নেই, বাবা। বেশি দূরে নয়, কাছেই আমার বাড়ি—রশীদ সাহেবের মুখ দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বের হয় কথাগুলো।

রশীদ সাহেব না থেমে ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে যান। হাসু এক সিঁড়ি দুই সিঁড়ি করে উঠতে থাকে। তার পা কাঁপে। ঘাড়টা চাপ খেয়ে মচকে যাবার মতো হয়।

রশীদ সাহেবের আগমনে তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। তাদের আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে বাড়িখানা। ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে অন্য দুটির হাত ধরে তিনি অন্দরে ঢোকেন। একটি চাকরাণী এসে হাসুর মাথার মোট নামিয়ে নেয়। হাসু দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে!

রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক। কিন্তু তাকে পয়সা দেয়ার কথা বোধ হয় মনে নেই কারো।

অনেকক্ষণ পরে হাসু সাহস করে বলে—আমারে বিদায় করেন সা'ব।

রশীদ সাহেবের ছেলে মজিদ হাসুকে ডেকে নিয়ে যায় ভেতরে।

রশীদ সাহেব তখন বিরাট বপু বিস্তার করে শুয়েছেন। মজিদকে বলেন, পকেট থেকে তিন আনা বের করে দিতে।

হাসু আপত্তি করে—তিন আনা কম অইয়া যায় সা'ব।

—কম! বলিস কী, অ্যাঁ!

—জাহাজের তন রিক্‌সায় উডাইয়া দিলেই ত চাইর আনা দেয়। আর এইডা ত অনেকখানি দূর। আবার দেরি অইল কত!

—নে তোল্ পয়সা।

—না সাব, পাঁচ আনার কম নিমু না।

মজিদ বলে—বাপরে! এখান থেকে এখানে পাঁচ আনা! এক মিনিটের পথ না, এত পেলে ত রাজা হয়ে যাবি।

হাসু নাছোড়বান্দা।

রশীদ সাহেব এবার ডাকেন—এই ছোঁড়া, আয় পাঁচ আনাই দেব। তবে হাত-পাগুলো টিপে দে ত আমার। ভালো করে তেল-মালিশ করে দে।

—না সা'ব আমি পারতাম না। আমার দেরি অইয়া গেছে।

—অ্যাঁ, পারবিনে? গর্জে ওঠেন রশীদ সাহেব। বিছানার ওপর মেদবহুল শরীরখানা দুলিয়ে তিনি বলেন—এমনি এমনি তোমাকে পাঁচ পাঁচ গণ্ডার পয়সা দেব? আমি কন্ট্রাক্টর। কড়ায় গণ্ডায় কাজ আদায় করে পয়সা দিই। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।

হাসু রশীদ সাহেবের পায়ের কাছে বসে তার পায়ে তেল-মালিশ করতে শুরু করে।

তেল-মালিশ নেওয়া রশীদ সাহেবের অনেক দিনের অভ্যাস। শোবার আগে রোজ হাত পা টিপিয়ে না নিলে তাঁর ঘুম হয় না। কালকাতা থাকতে এ ব্যাপারে সুবিধে ছিল অনেক। চার আনা দিলে আধ ঘন্টা বেশ হাত-পা বানিয়ে নেয়া যেত। রাত ন'টার সময় বাসার দরজায় এসে রোজ চীৎকার করে উঠত-মালিশ, তেল মালি—শ। বাড়িতে সে সুবিধে না থাকায় ঝি-চাকর দিয়েই চলে সে কাজ।

দশটা বাজে। পা টিপতে টিপতে হাসু অন্যমনস্ক হযে যায়। মা-র কথা মনে পড়ে। রেল-রাস্তার ধারে মা তার পথ চেয়ে আছে। এতক্ষণ এ লোকটার ব্যবহারে তার মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তার মনেই ছিল না। কিন্তু এখন ক্ষুধায় তার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। পেটটা ব্যথা করতে আরম্ভ করে।

মা-র কথা ভাবতে ভাবতে পা-টেপা এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

রশীদ সাহেব বলেন—কিরে, থামলি কেন? কি টেপা টিপিস? গাযে কী জোর নেই বাপু? খোট্টারা এ কাজে ভারি ওস্তাদ। কলকাতায় ভুলুয়া বলে একটা খোট্টা রোজ আসত আমার বাসায়। চমৎকার টিপতে পারত সে। আর তুই টিপিস, আমার গায়েই লাগে না। মনে হয় পিঁপড়ে হাঁটছে শরীর বেয়ে।

কতক্ষণ পরে আবার বলে—এবার হাতের দিকে আয়।

রশীদ-গৃহিণী চা হাতে থমকে দাঁড়ান। তিনি রুক্ষস্বরে বলেন—ওঃ সব কাজেই ঠিকাদারি! আচ্ছা কি আক্কেল তোমার! কার ছেলেকে তুমি এ রকম করে আটকে রেখেছো?

রশীদ সাহেব বলেন—আমার নাম রশীদ কন্ট্রাক্টর। কড়াক্রান্তি পর্যন্ত আদায় করা চাই আমার। এই ছোঁড়া, এবার হাতগুলো টিপে তারপর যাবি।

চায়ের কাপটা রেখে রশীদ-গৃহিণী বলেন—থাক আর হাত টেপাতে হবে না। কেন তুমি পরের ছেলেকে কষ্ট দেবে?

হাসুর দিকে ফিরে আবার বলেন—আয় ত বাবা। আহা! কার ছেলে গো! তোর কি মা-বাপ নেই?

সহানুভূতির কথায় এবার হাসুর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরে।

রশীদ-গৃহিণী হাসুর মুখ দেখে বিস্মিত হন। নিজের আঁচলে চোখ মুছিযে তিনি বলেন—দুপুরে খাসনি কিছু? আহা! মুখখানা শুকিয়ে কেমন হয়েছে!

মায়ের মন ক্ষুধাতুর সন্তানের জন্যে ব্যথিত হয়। তার চোখও শুকনো থাকে না।

তিনি হাসুকে খাবার ঘরে নিয়ে যান। একটা থালায় ভাত ও দুটো পেয়ালায় তরকারী দিয়ে হাসুর সামনে দেন।

ভাতের দিকে চেয়ে হাসুর চোখে ভাসে—মা তার আশায় সন্ধ্যা থেকে বসে আছে। মায়মুন বাড়িতে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে। বাড়ি গেলে রান্না হবে। তারপর খাওয়া হবে সকলের। হাসুর চোখ দিয়ে এবার বেশি করে পানি ঝরতে থাকে।

রশীদ-গৃহিণী বলে চলেন—খেয়ে নে বাছা আমার। কাঁদিস নে আর।

হাসু জোর করে এক মুঠো ভাত মুখে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ভেতরে ক্ষুধার তাগিদ চাপা পড়ে গেছে।

সে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। বলে-আমি যাই।

—কিছুই তো খেলিনে। শান্ত হয়ে খেয়ে এখানেই থেকে যা আজ।

—উঁহু, আমি যাই।

—বাড়িতে কে আছে তোর?

হাসু কোনো উত্তর দিতে পারে না।

রশীদ-গৃহিণী একটা টাকা এনে হাসুর হাতে দেন। অনেক দ্বিধার সঙ্গে টাকাটা নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। রশীদ-গৃহিণী চেয়ে থাকেন ছেলেটার মুখের দিকে। তার মেজ ছেলের কিছুটা ছাট আসে ওর মুখে। তখন কলকাতায় দাঙ্গা। ছেলেটি একদিন তার সাথে রাগ করে সামনের ভাত ফেলে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। আর ফিরল না...

হাসু সিঁড়ির গোড়ায় নেমে একবার ফিরে তাকায়। রশীদ-গৃহিণীর চোখ থেকে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

ঢং-ঢং, ঢং-ঢং—এগারোটার ঘণ্টা। পথে আসতে আসতে হাসু শোনে।

যেখানটায় রোজ কোষা রাখা হয়, সেখানে এসে দেখে, মা বসে নেই। কোষাটাও নেই।

মা তার উপর রাগ করেই চলে গেছে, সে বুঝতে পারে।

হাসু অন্ধকারের মধ্যে হাত কচলাতে শুরু করে। রাতটা কোথায় কাটান যায়? দোস্তের বাড়ি অনেক দূরে, তাও আবার নদীর ওপারে। এত রাতে খেয়া পাওয়া যাবে না।

নিরুপায় হয়ে হাসু কয়েক পা হেঁটে ছোট রেল-স্টেশনটার চালা ঘরে গিয়ে ওঠে। রাতটা এখানে কাটান যাবে। কিন্তু ক্ষুধা পেয়েছে খুব। এত রাত্রে খাবার কিছু পাবার যো নেই। দু'মাইল হেঁটে চাষাড়া পর্যন্ত গেলে কিছু কিনে খাওয়া যেত। কিন্তু তার এক পা হাঁটতেও আর ভালো লাগে না।

হাসু বসে পড়ে। যখন বসতেও খারাপ লাগে তখন এক সময়ে গামছা বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে সে বাড়ির কথা মনে করে।

মায়মুনকে খাইয়ে মা নিজে না খেয়ে শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাবছে। তাকে না খাইয়ে সে কোনোদিন একমুঠো ভাত মুখে দেয়নি, আজও দিতে পারে না। মায়ের কথা ভাবতেই আরো একজনের কথা তার মনে পড়ে। মায়ের মুখের পাশে, মায়ের মর্যাদা নিয়ে যে একখানা মুখ তার চোখের সামনে ভাসে, সে মুখখানা রশীদ-গৃহিণীর।

রাত বারোটার পরে আর কোনো ট্রেন নেই। ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর স্টেশনে লোক দেখা যায় না।

সব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দূর থেকে সমবেত চিৎকার ভেসে আসে—আল্লা আল্লা বল ভাইরে মোমিন—

কোথাও কলেরা-বসন্ত লেগেছে। তার জন্যেই খোদাই শিরণী হচ্ছে, হাসু বুঝতে পারে। চিৎকার শুনে তার শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে।

জয়গুন সন্ধ্যার পরেই এসেছিল। পথ চেয়ে চেয়ে তার মেজাজ গরম হয়ে উঠে ছেলের ওপর। ন'টার সময় সে নিজেই কোষাটা বেয়ে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই তার ধারণা পাল্টে যায়। হাসু তার সে ছেলে নয়! তার কাছে না বলে কোথাও সে যায় না। দোস্তের বাড়ি গেলে তার কাছে বলেই যেত।

জয়গুনের মাথার মধ্যে নানা রকমের দুশ্চিন্তা তাল পাকাতে আরম্ভ করে।

কাল শরীর গরম ছিল, আজ হয়তো জ্বর হয়ে কোন্ গাছতলায় পড়ে আছে। পানি সাঁতরে স্টিমারে উঠতে হয়। তবে কি স্রোতে ভেসে গেল? নদীতে কুমির থাকে। কুমিরেও টেনে নিয়ে যেতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়।

জয়গুন কুপি জ্বালে। মায়মুন ভূতের ভয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে আছে।

জয়গুন কাঁথা সরিয়ে দেখে মায়মুন ঘুমিয়ে আছে। সে আর মায়মুনকে ডাক দেয় না। এখন ওকে তুললেই ভাতের জন্যে কাঁদবে। ঘুমিয়ে থাক, সেই ভালো। আজ জয়গুনের চুলো ধরাবার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। খাঁচার নিচে বড় হাঁস দুটোও দেখা যায় না। বর্ষার দিনে পাতিশিয়ালে নেওয়ার কথাও নয়। বোধ হয়, কেউ ধরে রেখেছে কিম্বা জবাই ক'রে খেয়েছে।

জয়গুনের কাছে সমস্ত দুনিয়াটা এলোমেলো মনে হয়।

মায়মুনের পাশ দিয়ে সে শুয়ে পড়ে। এবার দুশ্চিন্তার দুর্বার স্রোত মাথায় ঢুকবার সুযোগ পায়। জয়গুন ভাবে—তবে কি গাড়ি চাপা পড়ল? হয়তো কিছু চুরি করায় পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

এমনি আরো অনেক চিন্তা তার মনে আসে। একটা কিছুক্ষণ ভাবার পর সেটাকে সরিয়ে আর একটা নতুন দুশ্চিন্তা এসে জাঁকিয়ে বসে মনে।

[এগারো]

কুউ—কুরু—ত—কু—উ—

মোরগের ডাক শুনে জয়গুন আর বিছানায় পড়ে থাকে না। তাড়াতাড়ি উঠে আগে ফজরের নামাজ পড়ে, তারপর মায়মুনকে ডাকে—গা তোল, মায়মুন। আত-মোখ ধুইয়া জলদি কইর‍্যা চুলা জ্বাল।

—মিয়াভাই আহে নাই, মা?

—উঁহুঁ।

জয়গুন আর কিছু না বলে কোষায় ওঠে। অনভ্যস্ত হাতে লগি বেয়ে সে রেল-রাস্তার পাশে আসে।

বিলের শেষ প্রান্তে গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

আবছা আলোয় দূর থেকে জয়গুন দেখতে পায় স্টেশনের চালাঘরে হাসু গোল হয়ে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে হাত রাখতেই হাসু ধড়ফড়িয়ে ওঠে। মা-কে সামনে পেয়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

জয়গুন দেখে, হাসুর সারা মুখে মশার কামড়ের দাগ। চোখ দুটোও লাল। মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছায়া! সে বলে—ডরে ধরছিল, অ্যাঁ?

হাসু মাথা নেড়ে স্বীকার করে।

—ডরে ধরছিল! কিছু দেখছিলি নি?

—হ। কি ঘুডঘুইড্যা আন্ধার গো মা! একটা মাইন্ষের আলয় নাই। এইহানে ওইহানে এট্টু পরে পরে কিয়ের জানি খচ-খচানি। বিলের মধ্যে কিয়ের যেন বাত্তি—এই জ্বলে, এই আবার নিবে। আবার কিয়ের বিলাপ হুনলাম। মাইন্ষের মতন কান্দে। ডরে আমি এক্কেরে মাডির লগে মিশ্যা আছিলাম। এই আলোগুলা আলৈয়া, না মা?

—যাউক, অই হগল কওয়ন ভাল্ না। তোর অহনও ডর করে অ্যাঁ?

হাসু হাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

—না—না, ওগুলা কিচ্ছু না।

পথে আসতে আসতে হাসু কালকের সমস্ত ঘটনা মা-র কাছে বলে। রশীদ-গৃহিণীর দেয়া টাকাটা মা-র হাতে তুলে দেয়।

বাড়ির ঘাটে কোষা ভিড়ার শব্দ পেয়ে মায়মুন দৌড়ে আসে। শফি, শফির মা-ও আসে। শফির মা জিজ্ঞেস করে—কোনখানে পাইলি গো?

—ইস্টিশনে হুইয়া আছিল।

—ইস্টিশনে আছিল! একলা! তুই বড় নিডুর গো! মা অইয়া কেমুন কইর‍্যা পেডের বাচ্চারে ফালাইয়া চইল্যা আইছিলি!

শফি বলে—দ্যাহ মা, মোখটা কেমুন দরমা-দরমা অইয়া গেছে!

—দরমা দরমা অইয়া গেছে!

হাসু বলে—মশার কামড়। সারা রাইত—

বাধা দিয়ে শফির মা বলে—মশার কামড়, না আর কিছু! তোরা দ্যাখ দেহি ভালো কইর‍্যা চউখ লাগাইয়া। আমি আবার চউখে দেহি না।

জয়গুন ভালো করে দেখে বলে—মশার কামড়ই।

—নালো, আমার কিন্তুক ভালা ঠেকে না। দিনকাল খারাপ। শেখপাড়ায় এক ঘরও বাদ নাই। মোল্লা-পাড়ায়ও দয়া অইছে। আমি এই ডরেই আর খ'রাত করতে ঠ্যাং বাড়াই না ওই মুখি। হোনলাম ছয়জন পাড়ি দিছে।

হাসু শিউরে উঠে ভয়ে। সে নিজের কানেও শুনেছে খোদাই শিরনি দেয়ার চিৎকার।

জয়গুন চিন্তিত হয়। বলে—রাইতে ডরেও ধরছিল, ভাজ। আমারও চিন্তা লাগে।

—ডরে ধরছিল!

শফির মা চমকে ওঠে। সে আবার বলে—তোরা কি কথা কস! আমার এক্কেরেই ভালা ঠেকে না।

—অহন কি উপায় করি, বইন?

—এক কাম কর। গোসল না করাইয়া ওরে ঘরে নিস্ না। সোনা-রূপার পানি দিয়া গোসল করাইয়া তারপর ঘরে লইয়া যা।

হাসুর মা হাসুকে বলে—তুই অহন বাইরে থাক। গোসল কইর‍্যা তারপর ঘরে গিয়া ভাত খাবি। এতক্ষণই যহন থাকতে পারলি, এডুকে আর কি অইব? তারপর শফির মা-কে উদ্দেশ্য করে বলে—তোমার ঘরে রূপা আছে নি ভাজ? সোনা ত নাই জানি।

—নালো, বইন। রূপাও নাই। কবে বেইচ্যা খাইছি। আকালে কি আর কিছু রাইখ্যা গেছে? বেবাক ছারখার কইর‍্যা লইয়া গেছে, খালি শফিরে রাইখ্যা গেছে। শফিই আমার সোনা, শফিই আমার রূপা, ও-ই সব। এখন খোদায় মোখ চাইলে অয়।

—খাড়ুজোড়া, হেইও খাইছ? আহা কেমুন সোন্দর জল-তরঙ্গের খাড়ু আছিল তোমার। আমার এতডি বয়স অইল, ওই রহম খাড়ু আর চউখে দ্যাখলাম না।

—কত আশা আছিল দিলে। শফিরে বিয়া করাইলে ওর বউরে দিমু খাড়ুজোড়া। কিন্তু উদরের টানে তাও দিলাম বেইচ্যা। সোয়ামীর চিহ্নত্ একটা ভাতের কাডিও রইল না আর।

শফির মা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

জয়গুন বলে—অখন কোথায় পাই সোনা-রূপার পানি। মোড়ল বাড়ির বউ-ঝিগ গায়ে রূপার গয়না আছে। কিন্তু সোনার গয়না ধারে কাছে কার ঘরে আছে আমার ত চউখেই পড়ে না।

—ক্যান, যার আছে হের আছেই। আমাগ মতন পোড়াকপাল কি আর বেবাকের! খোরশেদ মোল্লার বাড়িতে আছে। কিন্তুক হেই বাড়ির লাগা পরের বাড়িতেই গুডির ব্যারাম। হ, এক কাম কর। গদু পরধানের বাড়িতে গেলেই পাবি। গদু পরধানের বউগ শরীল গয়নায় ঝিল্লিক মারে। তুই আমার কথা হুন্‌লে তোর শরীলও আইজ সোনা-দানায় ভরা থাক্‌ত। আইজগা আর বিচ্‌রান লাগত না।

জয়গুন বিরক্ত হয় শফির মা-র ওপর। সে বলে—চান্দের মইদ্যে ফান্দের কথা ক্যান্ আনো? কেরামতের বউর একজোড়া সোনার কানফুল দেখছিলাম।

—ইস! সোনা না আর কিছু! ক্যামিকন, হুনছি আমি! হেই যে আমার দাদী কইত কথা—দড়ি যদি হাপ অইত আর অজা যদি রাজা অইত! হ, সোনার এক জোড়া মুড়কি আছিল্ জালালের বউর। হেদিন গিয়া দেহি বউর কান খালি। জিগাইলাম, তোর কান যে খালি বউ? হে কইল—মুড়কি বেইচ্যা কাপড় কিনছি। কাপড় আগে না গয়না আগে? হাচা কথাই ত। কাপড় না থাকলে কি গয়না ধুইয়া পানি খাইব মাইন্‌ষে?

জয়গুন বলে—গদু পরধানের বাড়িত্ আমি যাইতে পারতাম না। তোমার শফিরে পাডাইয়া দ্যাও। মায়মুনও যাইব লগে।

শফির মা বলে—যা শফি চিল-সত্তর চইল্যা আবি। কোনোখানে দেরি করিস না কিন্তুক।

একটা মেটে ঘটের মধ্যে সোনা ও রূপার গয়না-ধোয়া পানি নিয়ে কয়েক পা এসেই মায়মুন বিস্ময়ের স্বরে বলে, —দ্যাখলা শফি ভাই? এমুন মোট্টা মোট্টা রূপার গয়না বেডিগো গায়ে! আবার সোনার গয়নাও আছে!

—তোরে এই বাড়িতে বিয়া দিমু। এই রহম মোট্টা মোট্টা গয়না পরতে পাবি। কেমুন?

মায়মুন দাঁত বের করে ভেঙচি কাটে, জবাব দেয়—তোমার বউ নিমু এই বাড়িত্তন। ঐযে ছেঁড়ি কোদালের মতন দাঁত—

মায়মুন হাঁসের ডাক শুনে পাশের দিকে চেয়ে দেখে খাঁচায় বাঁধা দুটো হাঁস তাদের দিকে চেয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাকছে। মায়মুন চিন্‌তে পারে—তাদেরই হাঁস যে! হাঁস দুটোও মায়মুনকে চিন্‌তে পেরে খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

মায়মুন আস্তে শফিকে বলে—শফি ভাই, দ্যাখছো? আমাগো আঁস দুইডা বাইন্দা থুইছে।

শফি চোখ দুটো বড় বড় করে বলে—অ্যাঁ, সত্যই নি!

—কাইল রাইতে ওইগুলা বাড়িত্ যায় নাই।

—বাড়িত্ যায় নাই! তুই পানির ঘটটা লইয়া কোষায় গিয়া ব'। আমি ফাঁক বুইঝ্যা ছাইড়া দিয়া পলাইমু।

শফি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুযোগের সন্ধানে! গদু প্রধানের শেষ পক্ষের স্ত্রী ওকে দেখতে পেয়ে বলে—কী চাস্‌রে ছেঁড়া ঐহানে?

—কিছু না। সোনা-রূপার পানি নিতে আইছিলাম।

সে চোখের আড়াল হতেই শফি এক টানে খাঁচাটা উল্টে দিয়ে পালায়। হাঁস দুটো দৌড়ে গিয়ে পানিতে নামে।

শফি কোষাটাকে জোরে বেয়ে নিয়ে যায়। চকের মাঝে গিয়ে কোষা থামিয়ে মায়মুন ডাকে—চঁই-চঁই-চঁই।

পরিচিত কণ্ঠের ডাক অনুসরণ করে হাঁস দুটোকে ধানখেতের আল দিয়ে আসতে দেখা যায়। মায়মুনের ডাক শুনে গদু প্রধানের বাড়িতে হাঁস দুটোর খোঁজ পড়েছে। সেই বাড়ির কুড়ি খানেক ছেলেমেয়ে বাড়ির নিচে পানির কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটি ছোট মেয়ে চেঁচিয়ে বলে—কতগুলা ধান খাইছে আমাগ! আবার ধরতে পারলে গলা কাইট্যা খাইমু।

শফি লগি উঁচু করে চীৎকার করে—তোগ গলা কাটমু।

মায়মুন বলে—হেই ছেঁড়ি। ঐ যে কোদালের মতন দাঁত। তোমার বউ।

মায়মুনের কথায় কান না দিয়ে শফি বলে—আইজ ব্যাডাগুলা বাড়িতে নাই, থাকলে আমাগ গলাই কাইট্যা ফেলাইত রে!

কাছে এলে হাঁস দুটোকে কোষায় তুলে নিয়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে মায়মুন।

শফি কোষা বেয়ে বাড়ি যায়।

নিছক মশার কামড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না হাসুর মুখে! দু'দিন বাদেই রমজানের ব্যবস্থা মতো সে কাজে লেগে যায়। বিরাট জায়গা নিয়ে দালান উঠছে। হাসুর আনন্দ হয়। কারণ, অনেকদিন এখানে কাজ করা যাবে। এখানে কাজ বেশি। ইট ভেঙে সুরকি করা, ইটের বোঝা টানা, পানি তোলা—এইসব কাজ করতে হয়। ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত খাটতে হয়। এক মুহূর্তও বসে কাটাবার উপায় নেই। কিন্তু তবুও হাসুর খারাপ লাগে না। স্টেশনে টো-টো করে ঘোরার চেয়ে এ কাজ অনেক ভালো। এখানে ইচ্ছে মতো বোঝা নেওয়া যায়। কেউ ভারী বোঝা মাথায় চাপিয়ে দেয় না। কিন্তু স্টেশনের যাত্রী বাবু-সাহেবরা মাঝে মাঝে এত ভারী বোঝা মাথায় চাপিয়ে দেয় যে ঘাড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়। স্টেশনে কাজেরও কোনো ঠিকানা নেই, পয়সারও কোনো ঠিক নেই।

বারো আনা পয়সা প্রায় দিনই হয়ে ওঠে না। কিন্তু এখানে একদিন কাজ করলেই বাঁধা এক টাকা। এক পয়সাও কম না। বন্ধুত্বের খাতিরে এক আনা করে সরদারি দিতে হয় না রমজানকে! স্টেশনের কাজে আরও কত ঝকমারি। বাবুদের সাথে দরাদরি, ভিড় ঠেলে পথ চলা, সাঁতার কেটে স্টিমারে ওঠা, এইসব। এগুলো সহ্য হলেও নম্বরি কুলিদের অত্যাচার একেবারেই অসহ্য।

হাসুদের দলের সব ছেলেই এখানে কাজে যোগ দিয়েছে। হাসু শফিকে এনে এখানে কাজে ভর্তি করে দেয়।

শফি একদিন মা-কে বলে—মা, তুমি আর খরাত কইর‍্য না। মাইন্‌ষে মন্দ কয়—

ছেলের মুখের কথা লুফে নিয়ে মাথা নেড়ে শফির মা বলে—মাইন্‌ষে কয় খরাতনীর পুত? হেইয়াতে কি গায়ে ঠোয়া পড়ে? দশ-দুয়ার মাইগ্যা আইন্যা তোরে এতখানি ডাঙ্গর করছি।

জয়গুন বলে—পোলা তোমার উচিত কতাই কয় গো। ও অহন যাইডের বড় অইছে। রোজগারও করছে। ওর শরম লাগনের কতাই।

—ও রুজি-রোজগার করলে আর আমার ভাবনা কী! আমি খরাত করি কি আমার আমোদে? ঠ্যাঙ্গের জোরও গেছে। শরীলেও তাকত নাই। অহন সারাদিন এক ও'ক্‌ত খাইয়া আর বইস্যা খোদার শুকুর ভেজতে পারলে বাঁচি।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

থাউক– থাক। **ঘুডঘুইড্যা–** ঘুটঘুটে। **হগল–** সকল। **নিডুর–** নিষ্ঠুর। **হাচা কথা–** সত্য কথা।

সারসংক্ষেপ

হাসুর গায়ে হাত দিয়ে জয়গুন শঙ্কিত হয়। ছেলেটা অসুখে পড়লে সামান্য রোজগারও বন্ধ হয়ে যাবে। হাসুর কাজের জন্য নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে আসে। হাসুর মনে হয় ট্রেনে যাত্রীদের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। তবে নম্বরি কুলিদের প্রতাপে তার মতো নম্বরহীন কুলিরা বোঝা টানার সুযোগ পায় না। রমজান খুদে কুলিদলের সর্দার। সে নতুন একটা কাজের খোঁজ দেয়। সন্ধ্যার স্টিমারে একটা বোঝা পায় হাসু। পথিমধ্যে বোঝার মালিক রশীদ কন্ট্রাকটার তার বন্ধু ইয়ারদের সঙ্গে একটা ক্যাফেতে ওঠে। হাসু অপেক্ষা করে। তারপরে বাড়িতে এসেও রেহাই পায় না হাসু। প্রায় জোর করেই তাকে দিয়ে হাত-পা টিপিয়ে নেয় রশীদ কন্ট্রাকটার। রশীদের গৃহিণী হাসুকে মুক্তি দেয়। তাকে একটা টাকাও দেয়। তখন অনেক রাত। এতে রাতে বাড়ি ফেরারও পথ নাই। জয়গুন সন্ধ্যার পরেই বাড়ি ফিরেছে। হাসুকে না দেখে সারারাত দুঃশ্চিন্তায় কাটে জয়গুনের।

গতরাতে হাসু বাড়ি ফেরেনি। নৌকা বেয়ে জয়গুন রেল স্টেশনে যায়। সেখানে চালাঘরে হাসু শুয়ে আছে। মাকে সামনে পেয়ে সে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। জয়গুন দেখে হাসুর সারামুখে মশার কামড়ের দাগ। বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়তেই দৌড়ে আসে মায়মুন, শফি, শফির মা। শফির মা হাসুর মুখে দাগের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়। সে বলে সোনারূপার পানি দিয়ে গোসল করিয়ে তবে হাসুকে ঘরে তুলতে। শফি আর মায়মুন যেয়ে গদু প্রধানের বাড়ি থেকে সোনা-রূপা ধোয়া পানি নিয়ে আসে। গতরাতে হারিয়ে যাওয়া হাঁস দুটোকে দেখে খাঁচার মধ্যে আটকানো। এক ফাঁকে শফি হাঁসের খাঁচাটা খুলে দেয়। হোসেন দালালের কাজ করে এখন হাসু। শফিকেও সে কাজ দিয়েছে সেখানে। শফি মাকে ভিক্ষা বন্ধ করে দিতে বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. রশীদ সাহেব বন্ধুদের নিয়ে কোথায় আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন?

ক. রেল স্টেশনে
খ. জাহাজ ঘাটে
গ. প্যারাডাইজ ক্যাফেতে
ঘ. স্পেশাল জাহাজে

২৬. হাসুকে কেন সোনা-রূপার পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে?

ক. মশার কামড়ে
খ. বসন্ত রোগের ভয়ে
গ. কলেরার আক্রমণে
ঘ. নিউমোনিয়ার আশঙ্কায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে
নিচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

২৭. কবিতাংশে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের যে চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে–

ক. শ্রেণিবৈষম্য
খ. ভীরুতা
গ. আবেগ
ঘ. দুর্দশা

২৮. এরূপ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে বাক্যে–

ক. কড়ায় গণ্ডায় কাজ আদায় করে পয়সা দিই।
খ. এখান থেকে পাঁচ আনা।
গ. আমারে বিদায় করেন সা'ব।
ঘ. ঘাড়টা চাপ খেয়ে মচকে যাবার মতো হয়।

পাঠ-৮

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- জয়গুনের জীবিকার লড়াইয়ের আরও কিছু বর্ণনা দিতে পারবেন।
- জয়গুনের সন্তান প্রীতির একটি চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।
- মাতৃস্নেহবঞ্চিত বালক কাসুর একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- করিম বকশের নিষ্ঠুরতার একটি প্রতিচিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

[বারো]

বিকেল বেলা ঘুরে ঘুরে জয়গুন অনেক গন্ধভাদাল পাতা যোগাড় করে আনে। শহরের গিন্নিরা এ জংলী শাকের বড়া খেতে ভালোবাসে। পাতাগুলো শুকিয়ে ওঠে বলে রাত্রিবেলা ওগুলো সাজিয়ে ঘরের চালার ওপরে রেখে দেয়া হয়।

রাত্রির শিশির-ভেজা হয়ে ভোর বেলায় পাতাগুলো সতেজ ও সজীব হয়ে ওঠে। রোদ উঠবার আগে জয়গুন চালার ওপর থেকে চাঙারিটা নামিয়ে নেয়। তারপর বসে বসে চার পয়সায় কতটা, তা আলাদা করে সে চাঙারির ভেতর সাজিয়ে নেয়।

খাওয়া সেরে জয়গুন তুষের হাড়ির থেকে আটটা ডিম নিয়ে গন্ধভাদাল পাতার মাঝে বসিয়ে দেয়। তারপর চাঙ্গারিটা কাঁধে নিয়ে হাসু ও শফির সাথে কোষায় এসে বসে।

সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে কোষা চলে। ধান খেতের দিকে চেয়ে জয়গুনের চোখ জুড়ায়। নতুন শীষ মাথা বের করেছে। শীষের ভারে ঈষৎ নুয়ে পড়েছে ধানগাছগুলো। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বাতাস এসে সবুজ খেতে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে যায়।

জয়গুন বলে–এই বচ্ছর খোদায় দিলে ধান অইব খুব। আর না খাইয়া মরতাম না। এই সময় বিষ্টিডা রইয়া-সইয়া আইলে অয়। শীষমোখে বিষ্টি পাইলে বরবাদ অইয়া যাইব।

হাসু বলে–কেমুন মোট্টা মোট্টা ছড়া বাইর অইছে, দ্যাহ মা। বেবাক জায়গায় এইবার ভালা ধান অইব। উজান দেশেও হুনছি খুব বরাদ্দ দ্যাহা যায়।

–অউক। বরাদ্দ অইলেই খাইয়া বাঁচতে পারমু। এইবার পুরা ফসল না অইলেও, বারো আনা ফসল অইব, অহন যেই রহম ভাওবরাদ্দ দ্যাহা যায়। গেল বচ্ছর আধা ফসলও অয় নাই।

শফির হাতে লগি। সে একটা ধান-খেতের ভেতর কোষা চালাতেই জয়গুন বাধা দেয়–এই কী করস, শফি? এমন ভরা খেতের মইদ্যে দিয়া নাও বাইতে আছে?

–ক্যান? এইডা তো আর আমাগ খেত না।

–অলক্ষী ছেঁড়ার কথা হোন। আমাগ খেত নাই বুইল্যা তুই অমন ফুলে ভরা ধানের উপর দিয়া কোষা চালাবি? যা খাইয়া মানুষ বাঁচে, হেইয়া লইয়া খেলা! খেতের আইল দিয়া যা।

–আইল দিয়া গেলে কিন্তুক দেরি অইব।

–অউক দেরি। ধানের ছড়া বাইর অইছে। খেতের মাঝ দিয়া আর যাওন যাইব না। এট্টু টোক্কা লাগলেই কাইত অইয়া পড়ব, আর মাথা খাড়া করতে পারবো না।

শফি খেতের আল ধরে কোষা চালায়।

যে খেতে পাট ছিল সেগুলো কচুরিপানায় ছেয়ে গেছে। চারপাশের ধানখেতগুলোরও অনেকটা জায়গা গ্রাস করেছে কচুরিপানায়। কচুরির ঝাড়ে বিচিত্র ফুলের মেলা।

দু'একজন নিরলস কৃষক খেতের চারপাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে কচুরিপানার আক্রমণ ঠেকিয়েছে।

দু'একটা জলা-খেতে যেখানে কচুরিপানার উৎপাত নেই, সেখানে আধ-বোজা শাপলার ফুল। রোদের তেজ বাড়লে বুজে যাবে।

যেতে যেতে জয়গুন বলে—কয়েকটা শাপলা তুইল্যা লইয়া যাই। উকিল বাবুর বউ হেদিন কইয়া দিছিল।

শাপলা তুলে গোটা কয়েক তাড়া বেঁধে নেয় জয়গুন।

একটা ট্রেন সবেমাত্র যাচ্ছে স্টেশন থেকে। হাসু ও শফি দৌড়ে গিয়ে চলতি গাড়ির হাতল ধরে লাফিয়ে ওঠে পা-দানের ওপর। হাসু চেঁচিয়ে বলে—তুমি ধীরে-হুস্তে আহ মা। আমরা গেলাম।

জয়গুন শাপলার তাড়া কয়টা কুনইর সাথে ঝুলিয়ে চাঙারি কাঁধে নারায়ণগঞ্জের দিকে যায়।

মসজিদের মৌলবি সাহেব আসছেন। তার মুখোমুখি হওয়ায় সঙ্কুচিত হয় জয়গুন। তার হাত দু'খানাই আটকা থাকায় সে মাথার কাপড়টাও টেনে দিতে পারে না। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যায় সে। আড়চোখে চেয়ে মৌলবি সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বলে ওঠেন—তওবা তওবা!

জয়গুনের প্রথম স্বামী জব্বর মুন্সী এই মৌলবি সাহেবের খুবই প্রিয়পাত্র ছিল। তার স্ত্রী সদর রাস্তায় হাঁটে তা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। কতবার লোক পাঠিয়ে তিনি জয়গুনকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু জয়গুন তা শোনেনি।

ডিম ও গন্ধভাদাল পাতা বেচতে বেশি সময় লাগে না। উকিলপাড়ায়ই আজ সমস্ত কাবার হয়ে যায়। ঝাঁকা নামান মাত্র চিলিবিলি করে নিয়ে যায় সব।

জয়গুন বাজারে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় লবণ, মরিচ, গরীবের বিলাসদ্রব্য পান-সুপারি এবং আরো কয়েকটা প্রয়োজনীয় সওদা কেনে। রাস্তার এক জায়গায় আখ বিক্রি হচ্ছে। গাছের সাথে বাঁশ বেঁধে উচ্চতা ও দামের ক্রমানুসারে সারি সারি আখ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মায়মুন কতদিন মাকে বোম্বাই আখ নিতে বলেছে। কিন্তু সে ইচ্ছে করেই এতদিন নেয় নি, অযথা পয়সা খরচ হবে বলে। মায়মুনকে ফাঁকি দিয়ে সে বলেছে—উখের কি খায়? অহনো মিডা অয় নাই। পানসে উখ খাওয়ন আর ঘাস খাওয়ন সমান কথা।

কিন্তু আজ সারি সারি আখ দেখে তার মনে ব্যথা লাগে। সে ভাবে—মওসুমের একটা জিনিস কার না মুখে দিতে ইচ্ছে হয়? আর মায়মুন ত নেহায়েত কচি মেয়ে।

জয়গুন তিন আনা দিয়ে একটা আখ কেনে।

রাস্তায় রাজার মা-র সাথে দেখা হয়। রাজার মা জয়গুনের উত্তরে চাল কিনতে যাওয়ার সাথী। সে জিজ্ঞেস করে—কত দিয়া কিনলাগো উখখান?

—বারো পয়সা।

—বা—রো পয়সা!

রাজার মা মাথায় হাত দেয়। সে আবার বলে—তিন আঙুল উখ না, দাম তিন আনা! উখত না—অষুধ। আস্তা পয়সা চাবাইয়া খাওয়ন।

—এই রহমই বইন। আমাগ ঘরের জিনিসের দর নাই। আমরা যা বেচতে যাই—হস্তা। এক্করে পানির দাম। বাজারে একটা আদনা চিজ কিনতে গিয়া দ্যাহ, গাঁইটের পয়সায় কূল পাইবা না। একটু থেমে আবার বলে—এই চাঙারির এক চাঙারি শাক, এক্কেরে তরতাজা বেচলাম চাইর আনা। আর দ্যাহ, আষ্ট আনার বেহাতি কোন নিচে পইড়্যা আছে।

—দেখছি বইন। এই দশা। এহন যাই গো। দেহি চাউলেরনি যোগাড় করতে পারি। আইজ গাড়িতে ওঠতে পারলাম না। যা ভিড়! মাগ্‌গো মা!

—পুরুষ মাইন্‌ষেই ওঠতে পারে না গাড়িতে। আমরা ত মাইয়া মানুষ। কাইল পরশু আবার যাইবা নি গো? গেলে লইয়া যাইও আমারে। দ্যাশের চাউলে প্যাট ভরে না। চাউলের দাম যেন রোজ রোজ ওঠতেই আছে।

রাজার মা এতক্ষণে কয়েক পা এগিয়ে গেছে। জয়গুন হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, আর বুঝি উত্তরে যাওয়া হয় না। লোকের ভিড়ে গাড়িতে ওঠবার যো নেই। কত লোক হাতল ধরে পা-দানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ির ছাতে বসে যায় কত লোক। সেদিন তার চোখের সামনে একটা লোক গাড়ির পা-দানের ওপর থেকে পড়ে গেল।

টিকেটের জন্যেও আবার খুব কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। বিনা টিকেটে লুকিয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে আর কত দিন যাওয়া যায়? জয়গুনদের গ্রামের জহিরুদ্দিন বিনা টিকেটে গাড়ি চড়ায় তিনদিন ফাটক খেটে এসেছে।

পথে আসতে একটা উদলা নৌকার ওপর জয়গুনের দৃষ্টি পড়ে। রেল-রাস্তার পাশে গাছের সাথে বাঁধা ছোট নৌকাটি। একটি ছোট ছেলে বসে আছে নৌকার ওপর। যে কোন ছোট ছেলে হাতের কাছে পেলেই সে কোলে তুলে নেয়। তার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। কাসুর নাক, কাসুর চোখ, তার কপাল, ভ্রুযুগল গায়ের রঙ কেমন ছিল আজও জয়গুনের চোখের সামনে ভাসে। কারও ছোট ছেলে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে মন্তব্য করে—ওর নাকটা আমার কাসুর নাকের মতন। আমার কাসুরও এই রহম জোড়-ভুরু। জোড়-ভুরু ভাইগ্যমানের লক্ষণ। কিন্তু অইলে কি অইব? যে দশ মাস দশ দিন উদরে রাখল, তার বুক খালি।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে সে আবার বলে—থাক আমি শাপ দিমু না কাউরে। আমার কাসু জান-ছালামতে বাঁইচ্যা থাউক—খোদার কাছে দিন-রাইত চব্বিশ ঘণ্টা এইডাই আরজ করি।

নৌকায় বসা ছেলেটার দিকে চেয়ে জয়গুনের মনে হয়, তার কাসুও এতদিনে হয়তো এতটা বড় হয়েছে।

নৌকাটার দিকে আর একবার চেয়ে দেখে জয়গুন। এ রকম একটা নৌকা করিম বক্‌শেরও ছিল। নৌকার মাঝে একটা কোঁচও দেখা যায় ঠিক করিম বক্‌শের কোঁচটার মতোই। সে ভালো করে দেখে। তাইত! করিম বক্‌শের কোঁচটাই। কোনো ভুল নেই।

জয়গুন থম্‌কে দাঁড়ায়। তার মনে আনন্দ ও আবেগের মিলনসংঘাত আবর্তের সৃষ্টি করে। সে ভুলে যায়, আসমানে না জমিনে, স্বপ্নে না জাগরণে কোথায় কোন্ অবস্থায় সে আছে।

মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁখের ঝাঁকাটা রাস্তার ওপর ফেলে সে নৌকার দিকে ছুটে যায়।

নৌকায় পা দিতেই ছেলেটি বলে—উইট্য না আমাগ নায়।

জয়গুন উত্তর না দিয়ে নৌকায় ওঠে।

ছেলেটি বলে—ক্যাদা মাইখ্যা দিলা যে! বা'জান আমারে মারব।

জয়গুনের খেয়াল নেই। সে কাদা পায়েই উঠে পড়েছে।

জয়গুন ছেলেটির কাছে গিয়ে বসে। তার চিবুক ধরে বলে—তোমার নাম কি?

ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তার দিকে। মুখ না নামিয়ে আস্তে বলে—কাসু।

—কাসু! কাসু! আমার কাসু! জয়গুন পাগল হয়ে গেল বুঝি। সে দুই হাতে কাসুকে জড়িয়ে ধরতে যায়। কাসু সে হাত সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

জয়গুন ভাবে—আজ সে পেটের সন্তানের কাছে পর হয়ে গেছে।

জয়গুন কাসুকে কোলে নেয়। কিন্তু কাসু কোস্তাকুস্তি করে কোল থেকে নেমে যায়।

জয়গুন আখ খেতে দেয় কাসুকে। নিজের দাঁত দিয়ে চোকলা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে তার মুখে দেয়। কাসু চিবোয়। জয়গুন অশেষ তৃপ্তির সাথে তার দিকে চেয়ে দেখে।

এক সময়ে জয়গুন বলে—তোমার বা'জান কই?

—দুধ বেচতে গেছে।

—তোমার মুখখানা হুকনা যে? তোমার মায় তোমারে খাইতে দেয় নাই?

—আমার মা নাই, মইর‍্যা গ্যাছে।

জয়গুন সহ্য করতে পারে না। সে তাকে কোলে তুলে নেয়। আখ খেতে দেয়ায় কাসু বশ হয়েছে। এবার সে কোলে উঠতে আপত্তি করে না। জয়গুন পরম স্নেহে তার কপালে চুম্বন করতে থাকে। তার চোখের পানি কাসুর মুখখানা সিক্ত করে দেয়।

কাসুকে কোলে নিয়ে জয়গুনের অনেক সময় কাটে। করিম বক্‌শ দুধের হাঁড়ি মাথায় নৌকার কাছে এসে কখন দাঁড়িয়ে আছে জয়গুনের হুঁশ নেই। করিম বক্‌শের ডাকে তার আবেশ ভেঙে যায়। মুখ তুলে দেখে—করিম বক্‌শ। তার চোখ দুটো রাঙা—জ্বলছে।

জয়গুন মাথার কাপড় আরো টেনে দিয়ে দাঁড়ায়। নৌকা থেকে নেমে শিথিল বিবশ পা দুটোয় স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়ে আনবার আগেই করিম বক্‌শের গম্ভীর গলা শোনা যায়, —খাড়া, কথা আছে।

জয়গুন দাঁড়ায়। করিম বক্‌শ বলে—আমারে আর সুখে-শান্তিতে থাকতে দিবি না, দেখতে আছি। মায়ে-পুতে জোট কইর‍্যা আমারে পাগল বানাইয়া ছাড়বি তোরা। হাসুয়া হারামজাদা কদ্দিন জ্বালাইছে, আবার তুইও—

জয়গুন নীরব।

—আমার সুখ তোগ চউখে সয় না? সাত সাতটা বচ্ছর দুধ ভাত খাওয়াইয়া ওরে অত ডাঙ্গর করছি। এহন চাও তৈয়ার আণ্ডায় উম দিতে।

জয়গুনের ইচ্ছে হয় বলে—আণ্ডা তুমি পাড় নাই। আমার আণ্ডায় আমি উম দিলে তোমার এত পোড়ানি কিয়ের লেইগ্যা? ওরে দশ মাস দশ দিন পেডে রাখছি, তিন বচ্ছর বুকের দুধ খাওয়াইছি। তুমিই তৈয়ার আণ্ডায়—

কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও সে বলতে পারে না।

করিম বক্‌শ আবার বলে—তোগ ডরে ওরে বাড়িতে রাইখ্যা আহি না। লেজুড়ে লেজুড়ে বাইন্দা রাখি সব সময়। নাওডা চোরে লইয়া যায় এই ডরে ওরে নায় বহাইয়া বাজারে যাই। এদিগেও তোগ উৎপাত শুরু অইছে! আমি এহন কোথায় যাই? তোগ যন্তন্নায় মুল্লুক ছাইড়্যা বনবাসে গেলে পারি অহন।—করিম বক্‌শ গুমরে ওঠে।

জয়গুন চলতে আরম্ভ করে।

করিম বক্‌শ বলেই চলে, —দোহাই খোদার। ওরে ফুসলি দিস্ না আর। আমার পোলারে ফুসলি দিলে আল্লার কাছে ঠেকা থাকবি। রোজ কেয়ামত তক্ দাবি থাকবো তোর উপ্‌রে।

জয়গুন বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছে।

করিম বক্‌শ জোরে বলে—আবার যদি ফেউ-এর মতন আমার পিছু লাগস্, আখেরি কথা হুনাইয়া দিলাম, তয় তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

জয়গুন কোনো দিন কাসুকে ফুস্‌লি দেয়নি, আর দিবেও না—সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে।

[তেরো]

মেয়ে লোকটি কে?

কাসুর মনে বারবর এই প্রশ্নটাই আনাগোনা করতে থাকে।

তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করলো! আখ খেতে দিলো। দর্‌দর্ করে পানি পড়ছিল তার চোখ বেয়ে! কে সে?

একবার তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু করিম বক্‌শের মুখ-চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা চাপা পড়ে যায়।

করিম বক্‌শের রাগ তখনও থামেনি। জয়গুন সে রাগ থেকে কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছিল। একত্র ঘর-সংসার করার পুরাতন স্মৃতি করিম বক্‌শের মেজাজকে চরমে উঠতে দেয়নি। কিন্তু তারপর লগির উপর দিয়ে তার রাগের জের চলে সমানভাবে। লগির জোর গুঁতোয় ধানখেতের মাঝ দিয়ে যেন তীরের মতো ছুটছিল তার ডিঙি। ডিঙ্গির গলুইয়ে পানি উঠছিল ছলাৎ, ছলাৎ! কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে লগিটা মটাৎ করে ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়। করিম বক্‌শের রাগ কিন্তু এতক্ষণে থামে। লগি ভাঙার আফসোসে নয়, তার রাগের জয়লাভে। তার রাগ জয়ী হয়েছে লগিটা ভেঙে দিয়ে। এমনি কোনো মাশুল না পেলে তার রাগের কোনো মতেই শান্তি আসে না। লগিটা না ভাঙলে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে আঞ্জুমনের সাথে খুব এক চোট ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত ছিল।

বাপের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে কাসুর কথা বলবার সাহস হয় না। চুপ করে সে বসেই থাকে আর ভাবে—মেয়েলোকটি কে হতে পারে?

প্রশ্নটার মীমাংসায় সেদিন থেকে সে অনেকটা সময় নিয়োজিত করেছে। কিন্তু তার কাঁচা মাথা কোনো সন্তোষজনক হদিস খুঁজে বার করতে পারেনি।

হদিস শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

আঞ্জুমন একদিন হাশরের ময়দানের কিচ্ছা বলছিল। শুনে কাসু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—হাশরের ময়দানে এত মাইন্ষের মধ্যে মা-রে চিনতে পারা যাইব? আমি ত মা-রে দেহি নাই। তুমি মা-রে চিনাইয়া দিবা?

আঞ্জুমন কাসুর অভিলাষ বুঝতে পেরে ব্যথিত হয়। কাসুর প্রশ্নটা তাকে খুব পীড়া দিতে আরম্ভ করে আজ। সে ভাবে—কাসুকে এমন করে মিথ্যার জালে জড়িয়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না। অন্তত তার তো কোনোই লাভ নেই লোকসান ছাড়া। কাসু ওর মা-র কাছে চলে গেলেই ভালো হয় যেন। করিম বক্শ ফুলিকে মোটেই আদর করে না। এমন কি বা'জান বা'জান বলে কেঁদে খুন হয়ে গেলেও কোলে তুলে নেয় না। আরো গালাগাল দেয়—মেকুরের বাচ্চাডা কান্দে ক্যাঁ? এইডারে ছালা ভইর‍্যা জঙ্গলে ফালাইয়া দিয়া আয়। কাসুই করিম বক্শের কাছে সব। ফুলি যেন তার কেউ নয়।

ভাবতে ভাবতে তার মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। সে স্থির করে—আজ কাসুকে ওর মা-র কথা বলে দেবে। জয়গুনের বাড়ি দেখিয়ে দেবে কাসুকে। করিম বক্শের ইঙ্গিতে সে এতদিন কাসুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখেছিল। মা-র কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে সাজিয়ে বলতে হত অনেক কথা। কাসু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তার মা-র কবরের কথা। আঞ্জুমন কোনো দ্বিধা না করে মেহেরনের কবরটাই দেখিয়ে বলেছিল—এই যে এইডা তোর মা-র কবর।

কাসু বিশ্বাস করেছিল, নিশ্বাস ফেলেছিল আর চেয়েছিল একদৃষ্টে কবরটার দিকে।

মা-র কথা শুনতে শুনতে সে তন্ময় হয়ে যেত। আর ভাবত আহা—মা থাকা কত সুখের! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জাগত সমবয়সীদের কথা। হামিদের মা হামিদকে কত স্নেহ করে। সেলিমের মা কত আদর করে সেলিমকে। কিন্তু তাকে আদর করবার কেউ নেই।

তারপর থেকে সে প্রায়ই কবরটাকে দেখতে আসতো। মাঝে মাঝে করিম বক্শের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে মোমবাতি কিনে কবরে দিত।

আঞ্জুমন এবার বলে—আমি একটা কথা কইতে পারি। কেওর কাছে না কইতে পারস? কাসু মাথা নাড়ে।

—খবরদার, তোর বা'জান হোন্লে আমারে কাইট্যা দুই খণ্ড কইর‍্যা ফ্যালাইব। তয় হোন্। অই কবরডা তোর সতাই মা-র! আমি যেমুন সতাই মা, তেমুন।

—কে আমার মা? কাসু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুমিই ত কইছিলা ঐডা আমার মা-র কবর।

—ওহোঁ, মিছা কথা। তোর মা অহনো বাঁইচ্যা আছে।

কাসু বিশ্বাস করতে পারে না। সে বলে,— ফাঁটকি দ্যাও তুমি।

—ফাঁটকি দিমু ক্যাঁ? বিশ্বাস না করলে আর কইমু না। থাউক। আঞ্জুমন চুপ করে।

কিন্তু কাসুর শোনার আগ্রহ এবার বেড়ে যায়। সে বলে, আইচ্ছা, এইবার বিশ্বাস করমু, কও তুমি।

—কইলে কি দিবি আমারে?

—তুমি যা চাও হেইয়া দিমু।

—আমি চাই—

আসমানী বিরিক্ষর ফল,
তল নাই দীঘির জল,
যা খাইলে হয় অসুরের বল।

পারবি দিতে?

কাসু বিপদে পড়ে। কোথায় পাবে সে এসব? আসমানে গাছ হয়, সেই গাছে ফল হয়। কি তার নাম? সে বুঝতেই পারে না কিছু। আর তল নাই দীঘি—সেটাই বা কেমন? হতাশায় কাসুর মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। তার ধারণা, এগুলো দিতে না পারলে তার সৎমা তাকে তার মা-র কথা বলবেই না।

আঞ্জুমন খলখলিয়ে হেসে ওঠে। কাসুর পিঠ চাপড়ায়। কাসু এবার ভরসা পায়।

আঞ্জুমন আরম্ভ করে—তোর বয়স তহন তিন বচ্ছর। তোর বাপ তোর মা-রে ছাইড়্যা দেয়। তোরে তোর ফুফুর কাছে পাডাইয়া দ্যায়। তোর একটা বইন আছে, মায়মুন তার নাম।

কাসুর সন্দেহ দূর হয় না। কিন্তু সে মনোযোগ দিয়ে শোনে সব কথা।

আঞ্জুমন আবার বলে,—ঈদে টুপিখান দিছিল কে? তোর মা দিছিল না? অই যে কানা বুড়ি দিয়া গেল, ঐ কানা বুড়ি তোর মামানি।

কাসুর সমস্ত সন্দেহের অবসান হয় এবার। সৎমায়ের আচরণে কাসু কোন দিনই সদিচ্ছার পরিচয় পায়নি। তার হাব-ভাব দেখলে তার ভয়ই হত। আজ সৎমায়ের মমতায় সে বিস্মিত হয়। তাকে খুব ভালো লাগে। আঁচল ধরে আবদার করতেও এখন বাধে না কাসুর।

সে বলে,—যাইমু মা-র কাছে। আমারে লইয়া যাও না মা-র কাছে।

—আমি লইয়া যাইমু কোতায়? সর্ব্বনাশ! তোর বা'জান জানতে পারলে আমারে মাইর‍্যা কাইট্যা গাঙে ফ্যালাইয়া দিব। খবরদার। জানতে যেন্ না পারে।

কাসু মাথা নাড়ে।

আঞ্জুমন বলে—চল্, তোরে দেহাইয়া দেই। বাড়ির উত্তর ধারে গেলে দ্যাহা যায় বাড়িখান।

কাসুকে নিয়ে আঞ্জুমন বাড়ির উত্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

সূর্য-দীঘল বাড়ির তালগাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলে—ঐ যে দুইখান বাড়ির ফাঁক দিয়া দ্যাহা যায় একটা বড় তালগাছ। ঐ বাড়িডা, অই হানেই থাকে তোর মা।

কাসু পলকহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার মন এই মুহূর্তে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু নিচে মাঠের দিকে চেয়ে নিরুপায় বলে মনে হয় নিজেকে। আশ্বিনের শেষাশেষি, পানি শুকিয়ে আসছে। জমির উঁচু আল দেখা যায়। সমস্ত মাঠ কাদায় দৈ-দৈ হয়ে আছে। পায়ের পথও নয়, নায়ের পথও নয়।

করিম বক্শ যখন বাড়ি থাকে না, তখন কাসু প্রায়ই বাড়ির উত্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নৌকার মাঝে দেখা মা-র মুখখানা চিন্তা করে।

এখান থেকে তালগাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু মাঠের কাদা আর পানি কাসুর সাথে আড়ি ধরেছে যেন। রোজ এখানে এসে এসে তার রাগ ধরে পানির ওপর। কেন পানি শুকাতে দেরি করছে এত?

দু'একটা লোককে কাদা ভেঙ্গে পথ চলতে দেখে তার মনে হয়, সে যদি একটু বড় হত, তবে সে-ও যেতে পারত অনায়াসে। মাঝে মাঝে কারো কাঁধে চড়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু কে এমন দরদী যে তাকে কাঁধে করে নেবে?

তালগাছটার দিকে দু'একটা পাখিকে উড়ে যেতে দেখে তারও উড়বার স্পৃহা জাগে। ঐ পাখিগুলোর মতো দুটো পাখা যদি তার থাকত!

মাঠের কাদা যতই শুকিয়ে আসতে থাকে, কাসুর মনও ততই উড়ু-উড়ু করতে থাকে। কার্তিক মাসের শেষে মাঠের মাঝে পথ পড়ে। এমনি সময়ে একদিন শফির মা আসে এ বাড়িতে। কাসুর আনন্দ আর ধরে না। এ রকমই একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিল সে।

এক প্রহর বেলা। করিম বক্শ গোয়াল থেকে গাইটা বের করে উঠানে কাঁঠাল গাছের সাথে বাঁধে। আঞ্জুমন ঝিনুকে করে সর্ষের তেল এগিয়ে দেয়।

করিম বক্শ হুকুম করে—হাম্বাডা লইয়া আয়। বাজারের বেইল অইয়া গেছে।

—আমার ঘিন্ করে। তুমিই যাও।

করিম বক্‌শ গোয়ালের এক পাশে ঝুলানো হাম্বাটা নিয়ে আসে।

গাইটার বাছুর মরেছে অনেক দিন। দুধ-চোর গাই বাছুর না দেখলে দুধ ছাড়ে না। কোথায় লুকিয়ে রাখে। বাছুর না দেখলে বাঁটে হাত দেওয়াও মুস্কিল। ঠ্যাং দিয়ে লথি মারে। এসব অসুবিধার জন্যে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা। মরা বাছুরটার চামড়ার খোলসে খড়-বিচালি ভরে নকল বাছুর তৈরি করা হয়েছে।

করিম বক্‌শ হাতে সর্ষের তেল নিয়ে বাঁটে মাখিয়ে দেয়। তারপর নকল বাছুরটার মুখ বাটরে কাছে নিয়ে বাছুরের অনুকরণে গুঁতো মারে। এ রকম করলে যখন বাঁটে দুধ নেমে আসে, তখন দুই হাঁটুর মাঝে হাঁড়ি রেখে করিম বক্‌শ দুইতে আরম্ভ করে।

—বাছুর কবে মরল ভাই?

করিম বক্‌শ চেয়ে দেখে—শফির মা। নিতান্ত অনিচ্ছার সাথেই সে উত্তর দেয়—মাস তিনেক অইল।

—অনেক দিন ত অইল। কেমুন কইর‍্যা মরল? দুধে পানি মিশাও বুঝিন? দুধে পানি মিশাইলে বাছুর মইর‍্যা যায়। এইডা হাচা কতা। শফির মা ঠাট্টার সুরে বলে।

জয়গুন করিম বক্‌শের সংসারে থাকতে এ রকম ঠাট্টা-মশকরা প্রায়ই চল্‌ত তাদের মধ্যে। বহুদিন বহু ঘটনার তিক্ততার পরেও আজ কেমন করে যে এ ঠাট্টাটুকু জিভ থেকে পিছলে বেরুল, শফির মা নিজেই বুঝতে পারে না। কথাটা বলেই সে লজ্জিত হয়। করিম বক্‌শ আপন মনে এ-বাঁট থেকে ও-বাঁটে হাত চালিয়ে দুধ নামাতে থাকে। তার মুখেও ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়।

গাইটা নিষ্প্রাণ নিষ্পন্দ নকল বাছুরটার গা চাট্‌তে থাকে শুধু শুধু।

আঞ্জুমন পিঁড়ে এনে বসতে দেয় শফির মা-কে। শফির মা-র কথার উত্তর সে-ই দেয় এবার,—পানি মিশাইব কোন্ দুক্‌খে? পানি মিশান বোধ করি ভালা আছিল। বাছুরেরে দুধ খাইতে না দিলে বাঁচব কেমন কইর‍্যা, কও? ঘাস না চিনতেই দুধের বাছুরের সামনে দিয়া রাখত ঘাস। আর সমস্ত দিন ভ্যা-ভ্যা করত বাছুরডা। বাছুরেরে দুধ খাইতে দিলে যে আঁড়ি উনা থাকে, বোঝলা নি বইন?

করিম বক্‌শ খেঁকিয়ে ওঠে,—থাম্ মাগি বেজাত। কুড়ুমের কাছে বিত্তান্ত শুরু করছে। বেশি বকর-বকর করলে দুধের আঁড়িডা তোর মাথার 'পর ভাঙমু, কইয়া রাখলাম।

শফির মা বলে—থাউক, বিহান বেলা কাইজ্যা কইর‍্য না গো তোমরা। হাম্বাডা কিন্তু খুব ঢক-সই অইছে। আমি তো ভাবছিলাম জিয়ন্ত বাছুরই। কে বানাইছে? মায়মুনের বাপ, তুমি?

অনেকদিন পরে 'মায়মুনের বাপ' ডাকটা শুনে চমকে ওঠে করিম বক্‌শ। শফির মা এই বলেই তাকে ডাক্‌ত। এ পাড়ার সবাই ডাকে 'রহির বাপ' বলে। আঞ্জুমনের বাপের বাড়িতে ডাকে 'ফুলির বাপ'। শেষের দুটোই চলছে আজকাল। আগের নামটা ঘুমিয়ে গেছে তার মনে। করিম বক্‌শ মাথা নাড়ে।

—হ। কারিগরিতে, তোমার মতো ওস্তাদ আর নাই এই আশে-পাশে।

করিম বক্‌শের দুধ দোহন শেষ হয়েছে। শফির মা-কে কথা বলবার অবসর না দিয়ে সে দুধের হাঁড়ি হাতে উঠে পড়ে।

শফির মা বলে,—আদত কথাডা হোন এইবার। তোমার কাছে আইছি একটা কথা লইয়া।

করিম বক্‌শ দাঁড়ায়। বলে—কী কতা?

—মায়মুনের সম্বন্ধ ঠিক অইছে। আমি কত চেষ্টা-তদবির কইর‍্যা তয় ঠিক করলাম। না অইলে এমুন সম্বন্ধ কপাল কুটলেও জুটত না।

—কোথায় সম্বন্ধ!

—সোলেমানের পোলা, সদাগর খাঁর নাতি ওসমানের লগে।

—কবে বিয়া?

—এই মাসের এই কয়দিন পর। অগ্রাণ মাসের নয় তারিখ। তোমার কিন্তু যাইতে অইব।

—আমি যাইতে পারতাম না।

—এ তুমি কেমুন কথা কও! তোমার মাইয়া, তুমি না গেলে চলব কেমনে?

তোমার মাইয়া!

করিম বক্‌শের মনের দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে বারবার প্রতিধ্বনি করে কথা দুটি। কিন্তু ঊষর মনে বারিপাতের চেষ্টা বৃথা। কাসুকে ফুসলি দেয়ার ষড়যন্ত্রের কথা মনের ভেতর টেনে এনে সে নিজেকে কঠিনতর করে তোলে। এবার স্বরটা কঠিন করেই সে বলে,—যেদিন থেইকা ওগ বিদায় দিছি, হেদিন থেইকা ওরা আমার কেউ না।

—তুমি কী কও ভাই! তোমার মাইয়া, তুমি না গেলে কেমুন দ্যাহা যায়? কাসুও যাইব তোমার লগে।

—কাসু যাইব!

—ক্যাঁ, দোষ কি? আবার তোমার লগেই লইয়া আইবা।

—বাহার কথা কইছ! কেও যাইব না। কাসু যাইব না, বাড়ির একটা পোনাও যাইব না। কাসু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। আঞ্জুমনের ইশারায় এবার সে চুপি চুপি সরে যায়।

—কেউ না? শফির মা আবার বলে।

—হ, হ, কেউ না। বিয়া দিয়া দ্যাও, চাই কাইট্যা গাঙ্গে ভাসাইয়া দ্যাও, হেতে আমার কি? আমি হুঁ-হাঁ কিচ্ছু কইমু না।

শফির মা আর কথা বাড়াবাড়ি করতে সাহস করে না। সে আগেই জানত, মায়মুনের বিয়েতে করিম বক্‌শকে পাওয়া যাবে না। তবু সে এসেছিল যাতে পরে দূষতে না পারে।

পাশ থেকে কঞ্চির লাঠিটা হাতে নিয়ে শফির মা ওঠে।

আঞ্জুমন বলে—পান খাইলা না বইন?

—নালো বইন। আমি আবার বিনে ছেঁচা মোখে দিতে পারি না। ছেঁচতে দেরি অইয়া যাইব।

শফির মা পথ নেয়।

খেতের আলের ওপর কাসু দাঁড়িয়ে আছে। শফির মা যেতেই তার একখানা হাত ধরে সে বলে—আমি যাইমু, মামানি।

—আমি তোর মামানি, কে কইছে?

—আমি হুন্‌ছি।

কাসু আবার বলে—আমি যাইমু, তোমার লগে।

—কই যাবি?

কাসু কোনো উত্তর দেয় না।

শফির মা বলে,—নারে বা'জান। তোরে নিলে আমি দোষের ভাগি অইমু। শিগ্‌গির বাড়িতে যা। তোর বাপ মাইর‍্যা খুন কইর‍্যা ফ্যালাইব।

—উহুঁ, জানতে পারব না। বা'জান দুধ বেচতে যাইব।

—ফুলির মা কইয়া দিব তোর বা'জানের কাছে।

—ওহোঁ, কইব না। হে-ই ত আমারে চিনাইয়া দিছে তালগাইছ্যা বাড়িডা।

শফির মা একটু চিন্তা করে বলে—আইচ্ছা চল্‌। আবার তাড়াতাড়ি ফির‍্যা আইতে অইব। তোর বাপ জানতে পারলে কিল এট্টাও জমিনে পড়ব না।

কাসু বলে—বাজার তন ফিরতে দেরি অইব। তার আগেই ফির‍্যা আইমু আমি।

শফির মা-কে পেছনে ফেলে কাসু এগিয়ে যায়। শফির মা-ও জোরে পা ফেলে। কিন্তু কাসুর সাথে সে হেঁটে পারে না। সে কতদূর এগোয়, আবার পেছনে ফিরে তাকায়।

করিম বক্‌শের বাড়ি ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েছে তারা। এবার পেছন দিকে তাকাতেই শফির মা দেখতে পায়—করিম বক্‌শ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে এদিকে। কোণাকুণি ধানখেত মই দিয়ে যেন আসছে সে। কাসু শফির মা-কে ছাড়িয়ে নল খানেক এগিয়ে গিয়েছিল।

শফির মা ডাকে—কাসু। ভয়ে তার গলা দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

কাসু পেছন দিকে তাকিয়ে 'থ' হয়ে যায়।

শফির মা বলে—ভালা চাস্‌ত বাড়িমুখি পথ দে। নইলে আড্ডি গুড়া কইর‍্যা ফ্যালাইব।

কাসু এসে শফির মা-কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। তারা দু'জনেই ভয়ে কাঁপতে থাকে। শফির মা-র কাঁপুনি অনুভব করতে পেরে তার ভয় আরো বেড়ে যায়।

করিম বক্‌শ এসে পড়েছে। দুই হাতে কাসুকে ধরতেই সে আর্ত-চীৎকর করে ওঠে। সে শফির মা-র আঁচল জড়িয়ে ধরার চেষ্ট করে। কিন্তু করিম বক্‌শ তার রাক্ষুসে থাবায় ছাড়িয়ে নেয় কাসুকে। শফির মা-কে ধাক্কা মেরে বলে—তুই মাইয়ালোক। নইলে আইজ—

রাগের অতিশয্যে করিম বক্‌শের মুখ দিয়ে কথার শেষটা বের হয় না। এবার সে কাসুকে বাম কাঁধে ফেলে ডান হাত দিয়ে এক একটা থাপ্পড় মারে আর বলে—আর এই মুখি পাও ফেলবি? দ্যাখ, কেমুন মজা।

কাসু কাঁধের ওপর থেকেই হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে থাকে।

করিম বক্‌শের ধাক্কা খেয়ে শফির মা বসে পড়েছিল মাটির ওপর। সে অবস্থায়ই সে জিরিয়ে নেয় আর চেয়ে দেখে করিম বক্‌শের কাণ্ড।

কিছু দূর যাওয়ার পর আর করিম বক্‌শকে দেখা যায় না। ধান খেতের আড়ালে পড়ে গেছে সে এখন। সোজা হয়ে দাঁড়ালে করিম বক্‌শের কীর্তি দেখা যেত। কিন্তু শফির মা তখনও বসে হাঁপাচ্ছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

যন্তন্নায়– যন্ত্রণায়। **উদলা–** আঢাকা। **হুকমা–** শুকমা। **রোজ কেয়ামত–** শেষ বিচারের দিন। **বিত্তান্ত–** বৃত্তান্ত।

সারসংক্ষেপ

বিকেলে ঘুরে ঘুরে গন্ধভাদাল পাতা সংগ্রহ করে জয়গুন। সকালে গন্ধভাদাল পাতা, আটটা হাঁসের ডিম আর পথ থেকে সংগ্রহ করা শাপলা ফুল নিয়ে শহরে যায় জয়গুন। পথের মধ্যে বিস্তৃত ধানের মাঠ দেখে তৃপ্ত হয় জয়গুন। বলে এবার ধানের ফলন ভালো হবে। চালের আকাল থাকবে না। খুব অল্প সময়েই জয়গুনের সওদা বিক্রি হয়ে যায়। নৌকার ঘাটে এসে আকস্মিকভাবে কাসুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় জয়গুনের। করিম বকশ তাকে নৌকায় বসিয়ে বাজারে গেছে। আমোদে আহ্লাদে স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত করে ফেলে কাসুকে। করিম বকশ ফিরে এসে এ দৃশ্য দেখে রাগে অস্থির হয়ে উঠে। জয়গুন দ্রুত সরে যায়।

কাসু তার সৎমা আঞ্জুমনের কাছেই প্রথম জানতে পারে যে তার মা বেঁচে আছে। এতদিন তাকে ফাঁকি দিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। শফির মা একদিন আসে করিম বকশের বাড়িতে। মায়মুনের বিয়েতে করিম বকশকে আসার জন্য দাওয়াত দেয়। কিন্তু করিম বকশ সাফ জবাব দেয়– এ বাড়ি থেকে কেউ যাবে না। শফির মা ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পরে দেখে কাসুও তার সঙ্গে যাবার জন্য এসেছে। শফির মা তাকে প্রথমে নিতে চায়নি। কিন্তু কাসু নাছোড়বান্দা। শেষে কাসুকে সঙ্গে নিয়েই শফির মা ফিরতে থাকে। কিছু পরে পিছনে ফিরেই শফির মা দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে করিম বক্‌শ। দুজনই ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। করিম বক্‌শ তাদের ধরে ফেলে। নির্দয়ভাবে কাসুকে মারধর করে আর শফির মাকে গালিগালাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯. গরিবের বিলাস-দ্রব্য কোনটি?

ক. পান-সুপারি　　খ. লবণ
গ. মরিচ　　ঘ. নাকসাবি

৩০. 'জোড়-ভুরু' যে কারণে আগ্রহের–

ক. কৃপণতার পরিচয়　　খ. ভাগ্যবানের লক্ষণ
গ. অভাগার লক্ষণ　　ঘ. দারিদ্র্যের প্রকাশ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অনিত্য এই ধরায় জেনো
কিছুই বড় টিকতে নারে।
মাতৃস্নেহ হেথায় শুধু
অমর হয়ে থাকতে পারে।

৩১. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. জয়গুন　　খ. মায়মুন
গ. মেহেরন　　ঘ. আঞ্জুমান

৩২. উদ্দীপক এবং 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে–

i. অপত্যস্নেহ
ii. মানবতাবোধ
iii. আত্মগৌরব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. iii

পাঠ-৯

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মায়মুনের বিয়ের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সমাজের ধূর্ত মাতব্বরদের স্বরূপ অঙ্কন করতে পারবেন।
- শিশু কাসুকে বন্দী রাখার জন্য করিম বকশের অভিনব ব্যবস্থার বর্ণনা।
- গ্রাম্য ফকিরের চিকিৎসার নামে বুজরুকির একটি পরিচয় দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

[চৌদ্দ]

৯ই অগ্রহায়ণ। আজ মায়মুনের বিয়ে। লতিফ মিয়ার বাড়ি গিয়ে এই শুভ দিনটি জেনে এসেছিল শফির মা। লতিফ মিয়া তার পকেট পঞ্জিকা বের করে। একটা পাতার ওপর নজর দিয়ে সে আপন মনেই বলে–চন্দ্র রাজা বুধ মন্ত্রী। তারপর শুভকার্যের নির্ঘণ্ট দেখে বলে দেয়–অগ্রাণ মাসের ৯ তারিখে একটা শুভদিন আছে। আর একটা আছে শেষাশেষি –২৭ তারিখ। এছাড়া অগ্রাণ মাসে আর দিন নেই।

লতিফ মিয়া তার পঞ্জিকা বন্ধ করে। পঞ্জিকার ওপরের রাশিচক্র অঙ্কিত মলাটের দিকে তাকিয়ে লতিফ মিয়ার গণনায় শফির মার মনে একটু সন্দেহও জাগে না। সে ভাবে–এমন বই-এর গণনা কখনও ভুল হতে পারে না। লতিফ মিয়াকে দাওয়াত করে শফির মা বিদায় হয়। পথে আসতে আসতে সে শুভদিনটি মনে মনে ইয়াদ করে।

গণনা নির্ভুল সন্দেহ নেই। কারণ, এই তারিখে আশেপাশে আরো অনেক বাড়িতে বিয়ের ধুম লেগেছে। গাঁয়ের জমিদার বাড়িতেও আজ বিয়ে। বাজারে দুধ কিনতে গিয়ে তা টের পাওয়া যায়। দুধের সের ছয় আনা থেকে বেড়ে এক টাকা হয়। মাছের দর চড়ে হয় দ্বিগুণ। বাজারের অর্ধেক দুধ, ঝাঁকায় ঝাঁকায় বাছা-বাছা রুই কাতলা মাছ যায় জমিদার বাড়ি।

হাসু ও শফি আসে বিয়ের বাজার করতে। চার সের দুধ, দুটো শোল মাছ, দুটো লাউ আর চাল-ডাল এবং আরো কিছু সওদা নিয়ে তারা বাড়ি আসে।

বাজার-ফেরত তিন টাকা ও কয়েক আনা হাসু মা-র কাছে ফেরত দেয়।

জয়গুন বলে–বারো ট্যাকা যে খতম করলি, আরো ত অনেক খরচ আছে।

শফির মা বলে–থুইয়া দ্যাও। অতহত দরকার নাই। পনেরো ট্যাকা দিছে মোট্টে। ওয়াগ ট্যাকা দিয়া ওয়াগ খাওয়াইমু। আমরা খরচ করতে যাইমু কোন্ দুক্‌খে?

–গোশ্‌ত অইলে ভালা অইত।

থুইয়া দে, আবার গোশ্‌ত! আরো পাঁচখান ট্যাকা দিবার কইছিলাম, হেইয়া দিল না, কিরপিন।

–দিছে পনেরো ট্যাকা। আইব ত ভেড়ার পালের একপাল।

–আহনের কতা দশ জনের। কয়জন আহে, আল্লা মালুম।

–তাইত আমি আগেই কইছিলাম, মায়মুনের বিয়াতে ট্যাকা নিমু না। পান-শরবত খাওয়াইয়া বিদায় করমু।

–হেইডা ভালা আছিল।

–কিন্তু কেও হোন্‌লা না আমার কথা। অহন ট্যাকা নিয়া বদনামের ভাগি অই।

–তুমি কিছু চিন্তা কইর‍্য না, হাসুর মা। শইল মাছ আর কদু দিয়া একটা ঘণ্ড, ডাইল আর দুধ-বাতাসা, ব্যস! আবার কি! এ খাইয়া তোর বেয়াই সোলেমান খাঁ তার বউর কাছে গপ্প ছাড়বো! তারিফ করবো তো রান্দার।

জয়গুনের হাসি পায়।

নওশা আসবে সন্ধ্যার পরে। বিকেল বেলায় হাসু ও শফি পাড়া থেকে হোগলা যোগাড় করে এনে পেতে দেয় অতিথিদের বসবার জন্যে। উঠানের এক পাশে পা ধোয়ার জন্যে পানি ভরা কলসি ও বদনা রেখে দেয়। তার পাশে রাখে জলচৌকি ও খড়ম।

সময়টা ভালো। বৃষ্টি-বাদলের ভয় নেই।

সন্ধ্যার পর বরযাত্রীরা আসে। দুলাও আর সকলের মতো পায়ে হেঁটেই আসে। গরীবের বিয়েতে পাল্কির কথা কেউ কল্পনা করতেও পারে না। পাল্কির ভাড়ায় একটা পুরোদস্তুর বিয়ে স্বচ্ছন্দের হয়ে যেতে পারে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে জয়গুন জামাই দেখে নেয়। গোলাপি মাদ্রাজি লুঙ্গি পরনে, গায়ে বেগুনি রঙের পাঞ্জাবি আর মাথায় লাল টুপি। তার মুখের বসন্তের কালো কালো দাগ আর ছাগ্‌লে দাড়ি কয়গাছা জয়গুনের কাছে বিশ্রী ঠেকে। বয়স পঁচিশের ওপরে হবে, জয়গুন অনুমান করে। মেয়েকে নদীতেই ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। তা ছাড়া আর কি!

দুলা এবং আর যে দু'এক জনের পায়ে জুতো আছে, তারা উঠে গিয়ে বিছানায় বসে। বাকি সবাই এক এক করে জলচৌকির ওপর বসে পা ধোয়। তারপর বিছানার পাশে আর একজনকে খড়ম ছেড়ে দিয়ে মজলিশে এসে বসে।

সকলের শেষে জুতো পায়ে থপ্‌থপ্‌ শব্দ করতে করতে আসে গদু প্রধান। বেঢপ চটি জোড়া বিচানার পাশে রাখতে ভরসা হয় না তার। শফিকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করে—এই হানে রাখলে থাকবো ত? না চুরি যাইব?

মজলিশের মাঝ থেকে একজন বলে—গেলই বা চুরি। পুরান গেলে নতুন আনবেন।

—তোমরা এহনও নাবালক। জানো, পুরান জোতা আর পুরান চাদরের মর্ম? পুরান জোতা আর পুরান চাদরের সর্মান বেশি।

জুতো জোড়া হাতে করে যেতে যেতে আবার বলে—নতুন জোতা পায়ে দিয়ে মজলিশে গেলে মাইনষে কি মনে করে, জানো? মনে করে, নতুন হিখ্‌ছে জোতা পায় দিতে।

মৃদু হাসির গুঞ্জন শোনা যায়।

গদু প্রধান মসজিদের মৌলবি সাহেবের পাশে জায়গা বেছে নেয়। বসবার আগে জুতো জোড়া পেছনে হোগলার নিচে রেখে দেয়।

গদু প্রধান এসে জুতো চুরির যে প্রসঙ্গ তুলে দেয়, তা আর থামতে চায় না। কার বিয়েতে কার জুতো চুরি গিয়েছিল, কার চামড়ার জুতো কার রবারের জুতোর সঙ্গে বদল হয়েছিল—এসব গল্প।

সবাই যখন গল্পে মেতে আছে, তখন হাসু এক ফাঁকে লোক গুণে যায়। জয়গুনকে গিয়ে বলে বেবাকে তেইশ জন, মা।

জয়গুন মাথায় হাত দেয়। সব শুদ্ধ পনেরো জনের আয়োজন করা হয়েছে। এখন কি উপায় করা যায় সে ভেবে উঠতে পারে না।

শফির মা-কে ডেকে বলে—তুমি সামলাও। আমি আর পারি না, বইন।

—কোনো চিন্তা নাই। এক কাম কর। চাইর সের চাউলের ভাত চাপাইয়া দে। আমি ডাইলে দুই বদনা আর দুধে এক বদনা পানি মিশাইয়া দেই। যেমুন মাছ, তেমুন বড়ি না অইলে কি দুইন্যাই চলে? পালবরাদ্দে আইছে যেমুন, খাইব তেমুন ঝুডা পানি।

জুতো চুরির গল্প ছেড়ে কার জমিতে কি রকম ধান হবে, কোন্‌ বিলের ধানে পোকা ধরেছে, কার বছরের খোরাকি হবে, কার হবে না—এ সব আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে।

একজন বলে,—পরধানের চিন্তা নাই। কম কইর‍্যাও পাঁচ-ছয় হাজার ট্যাকার ধান বেচ্‌তে পারব।

গদু প্রধান চুপ করে থাকে। মজলিসের মধ্যে তার টাকার তারিফ করলে সে খুশিই হয়।

এবার দুলার বাপ সোলেমান খাঁ অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে পড়ে। সে বলে, স্বাদীন যে অইল হের কোনো নমুনাই যে পাইলাম না আইজও। দিন দিন যে খারাপের দিগেই চল্‌ল। মওসুমের সময়ই চাউলের দর এত, শেষে না জানি কি অয়!

শেষে যদি কিছু হয়, তবে গদু প্রধানের পোয়াবারো। চালের দর চড়ুক—মনে মনে সে তাই কামনা করে।

একজন বলে—দ্যাখছ, কাপড় পাওয়া যায় না বাজারে। খালি জোলইর‍্যা কাপড়। তাও কুড়ি-বাইশ ট্যাকা জোড়া। একি কিন্‌তে পারে?

গদু প্রধান বলে—আর কিছু দিন পর এও পাইবা না। বউ-ঝিরা ঘরের বাইর অইতে পারব না।

দুলার চাচা লোকমান বলে—কত আশা-ভস্‌সা আছিল। স্বাদীন অইলে ভাত কাপড় সাহায্যা অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই? বেবাক ফাঁট্‌কি, বেবাক ফাঁট্‌কি। আবার রেল গাড়ির ভাড়াও বাইড়্যা গেল।

—আরো কত দ্যাখ্‌বা মিয়া, মাত্র বিছমিল্লা।—মৌলবি সাহেব বলেন। তারপর গদু প্রধানের কানে কানে কি বলেন।

গদু প্রধান বলেন—দশটার মইদ্যে বিয়া পড়াইতে অইব। কই সোলেমান? শোন এদিগ।

সোলেমান খাঁ এলে আস্তে আস্তে গদু প্রধান বলে—তোমার বেয়ানরে আগে তোবা করাইতে অইব।

—কাঁ্যা?

—কাঁ্যা আবার! হায়ানের মত যেইখানে হেইখানে ঘুইর‍্যা বেড়ায়, দ্যাখ্‌তে পাও না? ভালো মাইন্‌ষের মাইয়া। বিয়াও অইছিল ভালা ঘরে। ভালা জাতের মাইয়া এই রকম বেজাত বেপর্দা অইলে আমাগই বদনাম। তোবা করাইয়া দিতে অইব। পরচাতে আর যেন বাড়ির বাইর না অয়।

—হেইডা ত ভালা কথাই।

—তুমি কথাডা মজলিশে উডাও। জোরে কইও যেন ঘরের তন তোমার বেয়ান হোন্‌তে পায়। আমি আছি তোমার পিছে।

—না, আপনেই উডান। আমার শরম করে।

গদু প্রধান বলে বেশ জোরের সাথেই—বিয়ার আগে বৌর মা'রে তোবা করাইতে অইব। তোবা না করাইলে মৌলবি সাব কলমা পড়াইব না। আর হে ছাড়া কে কলমা পড়ায় আমি দেইক্যা লইমু।

মৌলবি সাহেবের মুখের ওপর মজলিশের সমস্ত চোখ একযোগে এসে পড়ে। মৌলবি সাহেব এবার একজন বেপর্দা স্ত্রীলোক ও তার স্বামীর কেচ্ছা শুরু করেন।

জয়গুন মায়মুনের চুলের জট্ ছাড়াতে শুরু করেছিল। গদু প্রধানের কথা তার কানে আসতেই সে লাফ দিয়ে ওঠে। শফির মা-র কাছে গিয়ে বলে—হোনলা নি শফির মা?

—হ, হোনলাম। তার কি করতে চাও?

—কি করতে চাই? তোবা আমি করতাম না। আমি কোনো গোনা করি নাই। মৌলবি সা'ব বিয়া না পড়াইলে না পড়াউক। আমার মায়মুনের বিয়া দিমু না।

—এইডা কি কথার মতোন কতা। ট্যাকা দিছে তারা।

—ট্যাকা দিছে, পেড ভইর‍্যা খাইয়া ট্যাকা ওসুল কইর‍্যা যাউক। আমি ত আর ট্যাকা সিন্দুকে ভইর‍্যা থুই নাই।

—না, না। ওই হগল কথা রাখ। এমুন ঘর আর পাবি না। আর আইজ এই রহম কইর‍্যা ফিরাইয়া দিলে বদনামী অইব কত! তোর বাড়িতে আর কেও থুক ফেলতেও আইব না। আবার গদু পরধান আছে এর পিছে। ওকি যেমুন তেমুন গোঁয়ার! ও যদি মনে করে, উর মাডি চুর করে।

জয়গুন চিন্তিত হয়। তার মুখে কালো ছায়া। সে ভাবে—তওবা করলে ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকার অর্থ—না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা। জয়গুনের চোখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়। সে তীব্র কণ্ঠে বলে—না, আমি তোবা করতাম না।

মজলিশে মৌলবি সাহেবের গলা শোনা যায়। তিনি গল্প বলছেন—ঐ লোকটা তার বেপর্দা স্ত্রীকে কিছুতেই তালাক দিল না। তখন একজনের ওপর হুকুম অইল—ওরে কতল কর। লোকটাকে কাইট্যা ফেলা অইল। আর তার লহু থেইকা পয়দা অইল কি? না, একটা হারাম জানোয়ার—খিঞ্জির—শুয়োর। এইবার আপনারা দ্যাখেন, পর্দা কী চিজ। পর্দা না মানলে চল্লিশ বছরের এবাদতও কবুল হয় না খোদার দরগায়। সব বরবাদ অইয়া যায়। বেপর্দা স্ত্রীলোক আর রাস্তার কুত্তি সমান।

জয়গুন চম্‌কে ওঠে।

শফির মা কেরামত ও জহিরুদ্দিন মোড়লকে ডেকে আনে।

জহিরুদ্দিন বলে,—মৌলবি সা'ব ঠিক কথাই কইছে হাসুর মা। তোবা কইর‍্যা ফ্যাল।

কেরামত সায় দিয়ে বলে,—হ চাচি, তোবা কর।

জয়গুন জ্বলে ওঠে,—তো'বা কইর‍্যা ঘরে বইস্যা থাক্‌লে আমারে খাওয়াইতে পারবি?

শান্ত হয়ে আবার বলে—তোমরা ইন্‌সাফ কইর‍্যা কও, তোবা করলে কে আমারে ঘরে আইন্যা খাওয়াইব? হাসু যা রোজগার করে ও দিয়া দুই পেট চলে না। মায়মুনেররে আইজ বিদায় দিলেও ওরে নাইয়র আনত অইব। ও অহনতরি শিশু। মাসের মইদ্যে দশদিন ও আমার বাড়িতেই থাকব। এতগুলা পেট কেমুন কইর‍্যা চালাই, তোমরাই কও।

জহিরুদ্দিন বলে—খোদায় খাওয়াইব। মোখ দিছে যে, আহার দিব সে।

জয়গুন হাসে শ্লেষের হাসি।

কেরামত বলে—আইজকার দিনডার লেইগ্যা তোবা কইর‍্যা নেও। তারপর—

—তোবা তো'বা-ই। একবার করলে তা আর ভাঙতে পারতাম না।

বাইরে গদু প্রধানের গলা শোনা যায়—অনেক রাইত অইল। কই কেরামত? চালাক কর।

—করতাছি মিয়া সাব।

কেরামত মজলিশে যায়। মৌলবি সাহেব দোর গোড়ায় এসে তাঁর মাথার লম্বা পাগড়িটা খুলে তার এক প্রান্ত কেরামতের হাতে তুলে দিয়ে অন্য প্রান্ত নিজের কাছে রাখেন।

কেরামত ঘরের ভেতর গিয়ে বলে—ধইর‍্যা থাক, চাচি। হুজুর যা যা কইবেন, খেয়াল কইর‍্য। দিলের মইদ্যে গাঁইথ্যা রাইখ্য সব।

দ্বিধার সাথে জয়গুন পাগড়ির মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে। তার মনের মধ্যে তখনও দ্বন্দ্ব চলছে।

মৌলবি সাহেব টানা সুরে থেমে থেমে কি বলে যান তার একটা কথাও তার কানে ঢোকে না। কেরামত যখন আবার তার হাত থেকে পাড়গির প্রান্তটা নিতে আসে, তখন তার সম্বিত ফিরে আসে।

এবার খাওয়ার পালা।

জয়গুন তওবা করায় আজ মৌলবি সাহেবেরও খেতে আপত্তি নেই। একদিন তিনি জয়গুনের দেয়া হাঁসের ডিম ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেইদিনের সেই জয়গুন আর এখনকার জয়গুনে তফাত অনেক। একটু আগেও সে মৌলবি সাহেবের কাছে ছিল রাস্তার কুকুরের সামিল।

গদু প্রধান সামনের সারির একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে—কিরে আদেল, ভাত সামনে কইর‍্যা বইস্যা আছস ক্যান? খাইতে পারস না বুঝি?

—পারমু না ক্যাঁ? দুধ দিয়া মাইর‍্যা দিমু।

সাদত আলী বলে—আজকালকার ছেঁড়ারা পোয়া চাউলে ভাত খাইতে পারে না। এই বয়সে আমরা লোয়া খাইয়া লোয়া অজম করছি। খাইতে খাইতে মাজার কাপড় যে কয়বার ঢিলা করতে অইত তার শুমার নাই।

গেদু প্রধান বলে,—জোয়ান বয়সের কালে এক সের চাউলের ভাত অজম করছি আমি।

সাদত আলী বলে—পরধানের মনে আছে? হেই মধু আলইকরের দোকানে তুমি আর আমি বাজি রাইখ্যা রসোগোল্লা খাইছিলাম। তুমি আমার তন ছয়খান বেশি খাইছিলা। আমি খাইছিলাম একচল্লিশটা, আর তুমি—

—আর আমি সাতচল্লিশটা। সাদত আলীর কথা শেষ না হতেই গদু প্রধান বলে।

লেদু পাশ থেকে বলে,—রাইখ্যা দ্যাও ওই হগল কিচ্ছা। আইজ কাইলকার ছেঁড়ারা খাইতে পারে না? খাইতে পারে, মিয়াভাই কিন্তু খাওয়ায় কেডা? খাইতে না পারলে ভালোই আছিল। খোদা খোরাক কমাইয়া দিলে ত খুশি অইতাম। শুকুর ভেজতাম খোদার দরবারে। মসজিদে শিন্নি দিতাম!

লেদুর মাথায় ছিট আছে। কিন্তু তার স্পষ্টবাদিতার জন্য অনেকে তাকে পছন্দ করে। গদু প্রধান কিছু বুঝতে না পেরে বলে—কি রহম?

—বোঝলা না, মিয়াভাই? তোমার গোলাভরা ধান আছে। এক সেরের বদলে দুই সের খাইলেও তোমার গোলা ঠিক থাক্‌ব। কিন্তু আমি সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া রুজি করি পাঁচ সিকা। এই ট্যাকা পেডে দিমু, কাপোড় পিন্দুম, না এর তন রাজার খাজনা দিমু? ঘরে পরিবার আছে। তিনডা বাচ্চা আছে। আমার পেড যদি তোমার মতন এক সের খাইতে চায়, তয় উপায়খান অইব কি? সারাদিন খাইট্যা সোয়া সের চাউল গামছায় বাইন্দা ঘরে ফিরি। সাধে কি আর আইজ-কাইলকার ছেঁড়ারা খাইতে পারে না। খাইতে পারে না, না, খাইতে পায় না, কও। মাইনষের পেড ছোড অইয়া যাউক খোদার কাছে আরজ করি। বেবাকের পেডে মাজায় লাইগ্যা এক অউক। এক ছডাকের বেশি যেন খাইতে না অয়। এইডা অইলে আর আকাল অইব না দ্যাশে।

অনেকক্ষণ ধরে থাকা গ্রাসটা এবার মুখে দেয় লেদু।

তার কথা সবারই ভালো লাগে। শুধু গদু প্রধানের কাছে ভালো লাগে না। সে এবার হাঁক দেয়,—আরে, এই খানে ভাতের গামলা লও। ডাইল লও। কেমুন খাদেম, অ্যাঁ! খানেওয়ালা চিন না?

থালার ওপর ঝুঁকে পড়া নুব্জদেহ বৃদ্ধ নাজিমুদ্দিন মাথা উঠিয়ে বলে—লেদুরে আমরা পাগল কই আর ছাগল কই, ওর কথা কাঁডায় কাঁডায় সত্য। মাইন্‌ষের পেডটা না থাকলে আমি খুশি অইতাম। পেডের জ্বালাই বড় জ্বালা মাইন্‌ষের।

নানা জনের নানা কথার মধ্য দিয়ে খাওয়া শেষ হয়।

সোলেমান খাঁ মজলিশের মধ্যে একটা জায়গায় নিজের কাঁধের গামছাটা বিছিয়ে দেয়। তার চারপাশে কন্যাপক্ষের কেরামত ও জহিরুদ্দিন এবং বরপক্ষের প্রায় সমস্ত লোক কাঁধে কাঁধে মেশামেশি হয়ে বসে। প্রথম সারির পেছনে অল্প বয়সী ছেলেরা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে তাকায় উৎসুক হয়ে।

সোলেমান খাঁ একটা টিনের পুরাতন স্যুটকেস খুলে গয়নাগুলো গামছার ওপর আলাদা করে জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে রাখে। গয়নার মধ্যে বয়লা, গোলখাড়ু, নাকফুল, নোলক। এগুলো হাত দিয়ে নেড়ে প্রথমেই আপত্তি করে কেরামত,—আপনেরা গয়নার জোখা নেন নাই? এত বড় গয়না কে পরব?

—বড় অওয়ন ভালা। বউ আমাগ অহন ডেগা অইলে কি অইব? এক বচ্ছর পর যহন সিয়ানা অইব তহন ঠিক কাপাকাপা অইব। ভাঙা-গড়া করলে রূপা আর রূপা থাকে না। ফুক্কা অইয়া যায়।

আসলে গয়নাগুলো ছিল ওসমানের প্রথমা স্ত্রীর। সে মারা যাওয়ার পর চোখা রূপার এই গয়নাগুলোকে মেজে ধুয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

জহিরুদ্দিন গয়না হাতে নিয়ে ভালো করে পরখ করে। নাকের নোলক ও নাকফুল ছাড়া আর কোনোটাই তার কাছে রূপার বলে মনে হয় না। সে কেমিক্যালের কানফুল জোড়া এক দিকে সরিয়ে হাত দিয়ে আর গুলো চোখের কাছে নিয়ে দেখে। কিন্তু বরপক্ষের এত লোকের সামনে কথা বলতে তার সাহস হয় না। সত্যিই যদি রূপার জিনিস হয়ে থাকে তবে মজলিশের এত লোকের সামনে লজ্জায় কান কাটা যাবে। কেউ হয়ত বলেও বসতে পারে,—বাপের বয়সে রূপা দ্যাহ নাই কোনো দিন?

ওসমানের প্রথমা স্ত্রীর পাটের শাড়ী, একখানা লাল পেড়ে শাড়ী ও গয়নাগুলো ঘরে নিয়ে যায় কেরামত। হাতের বয়লা ও পায়ের গোলখাড়ু সুতো দিয়ে বেঁধে পরিয়ে দেওয়া হয় মায়মুনকে। পাটের দশ হাত শাড়ীটা এমন পেঁচিয়ে সামলান হয় যে, দূর থেকে মায়মুনকে দেখে বোঝা যায় না। মনে হয় একটা কাপড়ের পুটলি।

মায়মুন আবদারের সাথে তার মা-কে বলে,—মা, তুমি যাইবা না আমার লগে?

—আমি যাইমু কি করতে মা?

—আমি তোমারে ছাইড়্যা কেমনে থাকতাম?

—ক্যাঁ? হাসু যাইব, শফি যাইব।

মায়মুন নিশ্চিন্ত হয়।

জয়গুন আবার বলে—তোর চিন্তা নাই। দুই দিনের বেশি রাখতাম না তোরে পরের বাড়ি। পরশু লইয়া আইমু আবার। এই বার আঁইট্যা যা দেহি দুয়ার তক, দেহি কেমুন দ্যাহা যায়।

মায়মুন উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু এত বড় শাড়িটা সামলান তার পক্ষে কষ্টকর। শাড়িটা বারবার পায়ের নিচে পড়ে তার হাঁটায় বাধার সৃষ্টি করে।

মায়মুনকে দেখে জয়গুনের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। এ চোখের পানি সুখের না দুঃখের বলা শক্ত।

সাক্ষী ও উকিল যখন ঘরে আসে, তখন মায়মুন বসে বসে ঝিমুচ্ছে। জয়গুন মাথার কাপড়টা একটু টেনে মায়মুনকে হাত দিয়ে আকর্ষণ করে—একি মায়মুন! ওঠ্ দ্যাখ কারা আইছে!

উকিল তখন বল্‌তে শুরু করে—তোমারে সোলেমানের ব্যাটা ওসমানের লগে পঞ্চাশ ট্যাকা দেন মোহরে নিকাহ দিলাম। তুমি রাজি আছ?

জয়গুন মায়মুনকে বুকে চেপে ধরে। বলে—কও মায়মুন, হ রাজি আছি।

একথা বোঝার বা বলার মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই মায়মুনের কাছে। কথা কয়টা তার অনুভূতিকে একটুও নাড়া দেয় না। তোতা পাখিকে শিখিয়ে দিলে সে যেমন বলে, মায়মুনও তেমনি মা-র কথা অনুসরণ করে।

—রাজি আছি।

সাক্ষী ও উকিল পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হাসে। জয়গুন একগ্লাস শরবত মায়মুনের হাতে দিয়ে বলে—নে লক্ষ্মী, এক চুমক খাইয়া গেলাসটা দিয়া দে।

উকিল শরবতের গ্লাস নিয়ে সাক্ষীর সাথে বিয়ের মজলিশে চলে যায়।

এক সঙ্গে অনেকগুলো বিয়ে হচ্ছে বলে একটা ডুলিও পাওয়া যায়নি। বিয়ের পর তাই সোলেমান খাঁ তার ছেলে-বৌকে কোলে তুলে নিয়ে সকলের সাথে বাড়ির দিকে পথ নেয়। মায়মুনের ছোট ও পাতলা শরীরের ওজনে সোলেমান খাঁ বিস্মিত হয়। একটা তুলো ভরা বালিশের মতো মনে হচ্ছে তার কাছে। সে মনে মনে চিন্তিত হয়। জোয়ানমর্দ ছেলের জন্যে এতটুকু মেয়ে নেয়া ঠিক হল না বুঝি। আরো তিন তিনটি বছর পুষতে হবে ভাত-কাপড় দিয়ে, তবে ছেলের উপযুক্ত হবে বউ। কিন্তু এ তিন বছর—

সোলেমান খাঁ জোর করে চিন্তাটাকে সরিয়ে দেয়। ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে সে আজকের বিয়ের আনন্দটা মাটি করে দিয়ে চায় না।

ভোর রাত্রের দিকে বেশ শীত পড়ে। জয়গুন বাইরে চুলোর পাশে গিয়ে বসে। চুলোর মধ্যে বিয়ের রান্নার আগুন তখনও নিবে যায়নি। জয়গুন ঠাণ্ডা হাত দুটো চুলোর ওপর মেলে ধরে। মাথাটাও ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। তার চোখ-ঝরা পানি চুলোর আগুনে পড়ে অস্পষ্ট ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ শব্দ করে আর সাথে সাথে বাষ্প হয়ে মিশে যায় বাতাসে।

[পনেরো]

আজকাল করিম বক্‌শ কাসুকে কড়া নজরে পাহারা দেয়। যত দিন মাঠ-ভরা পানি ছিল ততদিন কালাপানির বন্দীর মতো ছিল কাসু। কিন্তু মাঠে পথ পড়ার সাথে সাথে করিম বক্‌শ চিন্তিত হয়। তার মনে আশঙ্কা জাগে—কাসু হয়তো একদিন ফুড়ুত করে ওর মা-র কাছে চলে যাবে। সেদিন আর একটু আগে দুধ বেচতে বেরিয়ে গেলে সর্বনাশ হয়েছিল আর কি!

করিম বক্‌শ আঞ্জুমনকে সতর্ক করে দেয়,—কানা বুড়ি আমার বাড়িতে পাও বাড়াইলে ঠ্যাঙ্গা মাইর‍্যা খোঁড়া কইর‍্যা দিবা। আমার তিরিসীমানায় দ্যাখতে পাইলে, ওর আর এট্টা চউখ কানা কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু। আমার তুমড়ীবাজি অহনও দ্যাহে নাই বুড়ি!

আঞ্জুমন করিম বক্‌শের হৃদয় জয় করার মতলব নিয়ে বলে,—বুড়িরে দ্যাখলে ভালা মানুষ বুইল্যা মনে হয়। কতাও কয় যেন মিছরির শরবত। দিলের মধ্যে এত কালি কে জানে!

কানা বুড়ির দোষকীর্তন করায় আঞ্জুমনের ওপর করিম বক্‌শ মনে মনে খুশি হয়। কিন্তু সে তাকে বিশ্বাস করে না। সন্দেহ হয়—কাসুর মাথাটা হয়ত ইতিমধ্যেই আঞ্জুমন বিগড়ে দিয়েছে। ঘরে-বাইরে এ রকম ষড়যন্ত্র অসহ্য। কোনো রকমে মনের

গোস্বা মনে চাপা দিয়ে সে কাসুকে পাহারা দেয়। বাইরে গেলেও সে কাসুকে সাথে করে নিয়ে যায়। যেদিন সাথে নেয়া সম্ভব হয় না, সেদিন গরুর দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে কাসুকে।

কয়েকদিন ধরে ধান কাটার ধুম পড়েছে। করিম বক্শ তার নারকেলের হুঁকোটা কাসুর হাতে দেয়, আর আগুনের মালসাটা নিজের হাতের তালুতে বসিয়ে অপর হাতে দুটো কাস্তে নিয়ে মাঠে রওয়ানা হয়।

কাসুর হাতে একটা কাস্তে দিয়ে বলে,–আমার লগে থাইক্যা ধান কাটতে হিগ। বড় হইলে এই কইর‍্যা খাইতে অইব।

কাসুর তার হাতে ডান হাতের ছোট্ট মুঠোর মধ্যে কাস্তের মোটা হাতল ভালো করে সামাল দিতে পারে না। কোনো রকমে হাতলটা চেপে ধরে সে দু'একটা করে ধানের ছড়া কাটতে আরম্ভ করে।

মাঠে আরো অনেক জমিতে ধান কাটা শুরু হয়েছে। দূরের একটা জমি থেকে কৃষাণদের সমবেত গান ভেসে আসে,–

কচ্-কচা-কচ কচ্-কচা-কচ
ধানরে কাটি,
মুঠা মুঠা ধান লইয়া বান্দি আঁটি-রে।
(ও ভাই) ঝিঙ্গাশাইলের হুড়ুম ভালা
বাঁশফুলের ভাত,
লাহি ধানের খইরে ভালা,
দইয়ে তেলেসমাত–রে।

কস্তুরগন্ধী চাউলরে আলা,
সেই চাউলেরি পিঠা ভালা,
সেই না পিঠায় সাজিয়ে থালা
দাও কুটুমের হাত–রে।

আল্লাদি বউ কোটে চিড়া
মাজায় রাইখ্যা হাত,
সেই না চিড়ায় কামড় দিয়া
বুইড়ার ভাঙে দাঁত–রে।

মিয়া বাড়ি ঘটক আসে
কন্যা-বিয়ার কথার আশে,
বোরো ধানের ভাত খাওয়ানে
মিয়ার গেল জাত–রে।

পাশের একটা জমিতে আলোচনা হচ্ছে। একজন বলে,–আমরা হেদিন বৈডকে ঠিক করলাম, সাতভাগা অইলে কেও ধান কাটতাম না। কিন্তুক দ্যাখ্, ছমিরদ্দির দল সাতভাগায় গদু পরধানের ধান কাটতে শুরু করছে।

আর একজন বলে,–আবার গানও লাগাইছে ফূর্তির ঠেলায়।

–হেইয়া করব না! বেয়াক্কেলরা এডুকও বোঝো না, এই বারের যেই ধান, তা সাত ভাগের এক ভাগ নিয়া কি ওগ বাপ-মার ফত্তা করব?

–এই বচ্ছর যে ধানের অবস্থা, এই রহম অইব কে কইছিল? জুইতের ধান অইলে না অয় সাত ভাগায় কিছু অইত। কিন্তুক একটা ধানের ছড়ার মধ্যে চাইর আনাই মিছা।

বর্ষার সময় ধানগাছের রকম দেখে অনেকেই অনেক আশা করেছিল। কিন্তু সবুজ ধান যখন সোনালি রঙ ধরতে শুরু করে, তখন চাষীরা ধানের ছড়া দেখে মাথায় হাত দেয়। এক একটা ছড়ার মধ্যে চার আনা ধানই অপুষ্ট–চালশূন্য চিটে। এখানে সেখানে ধানগাছ মরে যাওয়ায় জমিগুলো টাক-পড়া মাথার মতো হয়ে আছে।

করিম বক্‌শ কয়েক 'ঘোপ' কেটে আলের ওপর এসে পা ছড়িয়ে বসে। পাশের জমি থেকে ধানকাটা রেখে লেদু মিয়অ আলের দিকে আসতে আসতে বলে—ভালা কইর‍্যা তামুক সাজ, চাচা। একটা দম দিয়া যাই।

করিম বক্‌শ বাঁশের ডিবা হতে তামাক সাজাতে থাকে। অদূরে বসে কাসু ধানগাছের ডগা দিয়ে বাঁশি তৈরি করার চেষ্টা করছে। সূর্য-দীঘল বাড়ির তালগাছটা বেশি দূরে নয় এখান থেকে। গাছটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

লেদু বলে—কাসুরে এই মাথা-ফাডা রউদের মইদ্যে লইয়া আইছ ক্যাঁ, চাচা? ওরে বাড়িতে রাইখ্যা আইলেই পার।

—এহন এট্টু আধটু রউদ মাথায় না নিলে অইব ক্যাঁ? নোয়াব সাইজ্যা বইয়া থাকলে ত কাম অইত না। আর এই শীতের মিডা রউদে তেজ নাই।

—তেজ নাই। তয় বড় হুকনা রউদ। দ্যাহ না, চউখ-মোখ টানতে শুরু করছে।

কাসুর হাত থেকে ধানগাছের নলটা নিয়ে লেদু বলে—দে, বানাইয়া দেই।

বাঁশি তৈরি করতে করতে লেদু বলে,—মাইয়ার বিয়াতে গেলা না যে চাচা? তোমার পরাণ কি দিয়া বানাইছে খোদায়? পাথর না পোড়া মাডি দিয়া কও দেহি? মায়া-দয়া কি এক্কেরেই নাই তোমার পরাণে? কাসুর মা—

করিম বক্‌শের ভ্রূকুটি ক্ষণেকের জন্য লেদুর মুখ বন্ধ করে রাখে। সে কাসুর দিকে বাঁশিটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার শুরু করে—তুমি অমুন কর ক্যাঁ, চাচা? কাসু বড় অইয়্যা ওর মা-রে বিচ্‌রাইয়া—

করিম বক্‌শ সাজানো কল্কেটা হুঁকোর মাথায় না বসিয়ে ছুঁড়ে মারে লেদুর দিকে, চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ কর শয়তানের বাচ্চা! মশ্‌কারির জা'গা পাস না? মানুষ চিনস না তুই?

লেদু ঘাড় নিচু করে আত্মরক্ষা করে। তার মাথার ওপর দিয়ে শোঁ করে কল্কেটা ধানগাছের ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

আশেপাশের জমি থেকে কৃষাণরা ছুটে আসে,—কী অইল? কী অইল?

লেদুই বলে,—কিছুই না। যাও তোমরা।

লেদু কল্কেটা তুলে গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বলে,—রাগ করলা নি, চাচা? আর কোনোদিন কিছু কইমু না। এই কান ডলা খাইলাম দশবার।

করিম বক্‌শ তখনও রাগে গর গর করছে।

লেদু নিজেই এবার তামাক সেজে হুকোটা করিম বক্‌শের হাতে দেয়। তারপর বলে,—তোমার জমিনে এইবার ধানে বরাদ্দ নাই। আমাগ লগে ধান কাটতে যাইবা? খুরশীদ মোল্লার বটতলার ক্ষেতে ধান মন্দ অয় নাই। দিবও ছয় ভাগা।

করিম বক্‌শের রাগ থামে। তার বদমেজাজের জন্য কেউ তাকে দলে নিতে চায় না। লেদুর এ প্রস্তাবে সে খুশি হয়। বলে—কবে যাইবা তোমরা?

—এই জমিনের ধান কাডা অইলে। তুমিও তোমার জমিনের ধান কাইট্যা কাবার কর।

—কাবার আমার কাইল অইব। পাতলা পাতলা ধান কাটতে দেরি লাগে না। এইবার তিনডা মাসের খোরাকিও অইব না। গেল বছর ছয় মাসের ধান পাইছিলাম। এহন তোমরা যদি দলে নেও, তয়ই না বাঁচতে পারমু।

—তোমারে দলে নিতে ত আপত্তি নাই। আপত্তি কিয়ের লেইগ্যা জানো? তোমার মেজাজের লেইগ্যা দলের কেউ রাজি অয় না। যাউকগ্যা, আমি বেবাকেরে বুঝাইয়া ঠিক কইর‍্যা নিমু। তুমি তোমার মেজাজখান ঠাণ্ডা কর। আর একটু অইলে আইজ আমার মাথাডা ফাডাইয়া দিছিলা আর কি!

করিম বক্‌শের নিজের জমির ধান কাটা শেষ হয়েছে। খুরশীদ মোল্লার বটতলার খেতে ধান কাটতে যাবে সে। কিন্তু কাসুকে আর পেছনে টানতে ভালো লাগে না। বটতলার খেত অনেক দূরে! রোদের মধ্যে এতে দূরে নিয়ে ছেলেটাকে বসিয়ে কষ্ট দেয়া তার ইচ্ছে নয়। এ কয় দিনে ছেলেটা শুকিয়ে গেছে। তার চোখ-মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। আর যে ভয়ে সে কাসুকে সাথে সাথে নিয়ে বেড়ায়, সে ভয় সব জায়গায়ই দেখা দিয়েছে। কাসুকে ওর ফুফুর বাড়ি থেকে নিয়ে আসার পর যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তাতে কাসু হয়তো অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছে। তবুও সে সাধ্যমত চেষ্টা করে। বাজার থেকে

বিস্কুট, জিলিপি, কদমা এনে কাসুকে খেতে দেয়। নিত্য-নূতন খেলনা দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কোনো লোককে ওর কাছে ঘেঁষতে দেয় না, পাছে কেউ ওর মা-র কথা বলে দেয়।

কাল পান্তা ভাত খেয়েই করিম বক্‌শ ধান কাটতে যাবে। কিন্তু কাসুকে বাড়িতে রেখে যেতে তার মন সরে না। আবার তাকে সাথে নিয়ে গিয়েও কোনো লাভ নেই। সেখানে উস্কানি দেয়ার লোক আছে যথেষ্ট। জয়গুনের বাড়ির কাছের কেরামত আছে লেদুর দলে। কে কখন কোন তাল দিয়ে বসে বলা যায় না। সে ভাবে—তাল দিতে পারে সব্বাই, মিডাই দিতে পারে না কেউ।

মহাসমস্যা করিম বক্‌শের সামনে। চিন্তা করে সে কোন সমাধান খুঁজে পায় না। আঙ্গুমন তামাক দিয়ে যায়। তামাক টানতে টানতে সে চিন্তা করে। তার চিন্তা তামাকের ধোঁয়ার সাথে কুণ্ডলি পাকাতে আরম্ভ করে।

এক সময়ে হুঁকোয় টান দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় করিম বক্‌শ। তারপরই তার চোখে-মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

হুঁকোটা বেড়ার সাথে ঠেকিয়ে রেখে সে এক লাফে বেরিয়ে পড়ে। পাশের বাড়ির হারুনকে ডেকে চুপি চুপি যুক্তি করে দু'জনে।

হারুন বলে—সাদা চুল পাইমু কই?

—আমি যোগাড় কইর‍্যা দিমু। তুই এট্টা সাদা কাপড় যোগাড় করিস। আর খবরদার, কেও যেন না জানে। তুই আর আমি, বুঝলি কথা? তিন কান অইলেই সব্বনাশ।

একটু থেমে আবার বলে—আমার কাম যদি ফতে অয়, তয় তোরে একখান গামছা কিন্যা দিমু।

করিম বক্‌শ সন্ধ্যার সময় কাসুর কোমরের দড়ির বন্ধন খুলে দেয়। কড়া পাকা-দেওয়া গরুর দড়িটার দাগ বসে গেছে কোমরে। করিম বক্‌শ আদর করে ডাকে—কাসু অ-কাশেম!

চল্ বা'জান, তোরে টিয়াপক্ষীর বাচ্চা ধইর‍্যা দিমু। ওই তেঁতুল গাছে টিয়ার বাসা আছে।

কাসু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

—চল্ আমার লগে।

করিম বক্‌শ কাসুর হাত ধরে তেঁতুল গাছের দিকে নিয়ে যায়। পথে যেতে যেতে করিম বক্‌শ বলে—আমারে—বা'জান কইয়া ডাক দে।

দীর্ঘ চার বছর কাসু ফুফুর বাড়িতে কাটিয়েছে। কেউ তাকে ঐ নামে ডাকতে শেখায়নি! অনভ্যস্ত বলে এখন বা'জান ডাকতে কাসুর লজ্জা হয়। বাপের কাছে এসে সে আদর-স্নেহ যা পেয়েছে, তার চেয়ে মার-ধর খেয়েছে ঢের বেশি। করিম বক্‌শ ছেলের কাছে পিতার উপযোগী কোনো ভক্তি-শ্রদ্ধাই অর্জন করতে পারেনি। সে যা অর্জন করেছে তা ভয়। কিছুটা ভয় আর বেশির ভাগই লজ্জায় কাসু বা'জান বলে ডাকতে পারে না। এ জন্য কতদিন মারও খেয়েছে। মার খেয়ে অনিচ্ছায় উচ্চারণ করেছে কয়েক বার। কিন্তু মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে শব্দটি কোনোদিন বের হয়নি।

করিম বক্‌শ আবার বলে...কিরে, ক। না কইলে টিয়াপক্ষীর বাচ্চা দিমু না।

এত লোভ দেখানো সত্ত্বেও কাসু মুখ বুজে থাকে। কোনো কথাই বের হয় না মুখ দিয়ে। করিম বক্‌শ আর পীড়াপীড়ি করে না।।

তেঁতুল গাছের কাছাকাছি যেতেই কি রকম এক গোঙানির শব্দ শুনে কাসু থমকে দাঁড়ায়।

করিম বক্‌শ বলে,—কিরে, কী অইল?

—অইডা কি দ্যাহা যায়? তেঁতুল গাছের টিকিতে বইয়া রইছে!

করিম বক্‌শ কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলে,—সত্যই ত! পাক্‌না চুল ছাইড়্যা বইয়া রইছে! আবার গোঙায়!

করিম বক্‌শ চোখ দুটো বড় করে বলে,—খাড়া, দেইখ্যা লই।

কাসু এবার করিম বক্‌শের হাত ধরে তার গায়ের সাথে মিশে দাঁড়ায়। করিম বক্‌শ কাসুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

—কাসু, শিগগির আমার কোলে ওঠ্। বাপ্‌রে বাপ্! এইডা ত আর কিচ্ছু না! এইডা যে গোঙাবুড়ি! গলা টিপ্যা ধরব! আল্লা! আল্লা! বাঁচাও! আল্লা, আল্লা! কাসু, । আল্লার নাম কর। আল্লা, আল্লা।

কাসু করিম বক্‌শের বুকের মধ্যে মুখ লুকায়। ভয়ে চোখ বন্ধ করে। কাঁপে থরথর করে। করিম বক্‌শ কাসুকে কোলে নিয়ে দৌড় দেয়। বাড়ি এসেও কাসু চোখ খোলে না।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে করিম বক্‌শ বলে—কাসু, আমারে বা'জান কইয়া ডাক দে। বা'জান না ডাকলে গোঙাবুড়ি বোলাইমু।

অন্ধকারের মধ্যে শিউরে ওঠে কাসু। করিম বক্‌শকে জড়িয়ে ধরে দুই হাতে। তার চোখের সামনে তখনও যেন সে দেখছে গোঙাবুড়ির বিকট মূর্তি।

করিম বক্‌শ কাসুকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ভান করে বলে—সইর‍্যা যা আমার কাছতন। আমারে বা'জান না কইলে এহনি গোঙাবুড়ি ডাক দিমু।

কাসুর ভীত-কম্পিত কণ্ঠ অস্ফুট শব্দ করে—বা'জান।

করিম বক্‌শ সাড়া দেয়। তারপর বলে,—কাসু, বাড়ির বাইরে যাইস্ না কিন্তুক, খবরদার! ঐ গোঙাবুড়ি গলা টিপ্যা ধরব! তেঁতুল গাছে আরো একটা পিচাশ আছে! হেইডার নাম ছালাবুড়ি। ছালার মইদ্যে ভইর‍্যা তোর মতন ডেগা পোলা পাইলে লইয়া যায়। তারপর তেঁতুল গাছে বইস্যা রক্ত খায়।

কাসু করিম বক্‌শের বুকের মধ্যে শিউরে উঠে। তার কাঁপুনি করিম বক্‌শও অনুভব করতে পারে।

সে আবার বলে—খবরদার! কানাবুড়ির সুরত ধইর‍্যা ছালাবুড়ি ধইর‍্যা লইয়া যাইব।

করিম বক্‌শ তার অদ্ভুত ফন্দির সফলতায় মনে মনে খুশি হয়। কাসুকে বাড়িতে রেখে এখন নিশ্চিন্তে কাজ করা যাবে। কাসু ভুলেও জয়গুনের বাড়ির দিকে পা বাড়াবে না। কারণ পথের ওপরেই তেঁতুল গাছ। আবার ছালাবুড়ির চেহারা নিয়ে কানা বুড়িও এসে আর সুবিধে করতে পারবে না।

করিম বক্‌শের মতলব হাসিল হয়েছে। কাসু এখন আর বাড়ি থেকে বের হয় না। আগে বাড়ির উত্তর পাশটায় গিয়ে দাঁড়াত সে। সূর্য-দীঘল বাড়ির তালগাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে সে অনেক সময় কাটিয়ে দিত। রোজ ঐ তালগাছটা দেখে দেখে সে তার মা-র চিন্তাটাকে তাজা করে নিত মনের মধ্যে। মা-র অভাব তাতে অসহনীয় হয়ে উঠত। তেঁতুল গাছে গোঙাবুড়ি দেখার পর সে আর কোনো দিকে পা বাড়ায় না।

সে কখনও ফুলির বিছানার পাশে, কখনও উঠানে, কখনও বা রান্না ঘরে তার সৎমার পাশে বসে কাটিয়ে দেয়। এমন কি গোয়াল ঘরের পাশে যেতেও এখন তার সাহস হয় না।

মা-র মধুর চিন্তা তার মনে বার বার যে ছাপ রেখে গেছে, তা কখনও মুছবার নয়। সে স্থায়ী ছাপকে এখন ভূতের বীভৎস মূর্তি যেন রাহুর মতো গ্রাস করছে। গোঙাবুড়ির গোঙানি, ছালাবুড়ির ছালা, তাদের নখর ও দাঁতের এলোমেলো কল্পনা কাসুকে সব সময় সন্ত্রস্ত করে রাখে। কোনো ঠুংঠাং শব্দ শুনলেই সে ভয়ে অস্থির হয়। রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে চিৎকার করে ওঠে। করিম বক্‌শ সে চিৎকারে সজাগ পেয়ে কাসুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে—কিরে কাসু, অমুন করস্ ক্যান?

কাসু কোনো উত্তর দেয় না। করিম বক্‌শের বুকের মধ্যে গিয়েও সে কাঁপে থরথর করে।

হঠাৎ একদিন কাসুর জ্বর হয়। প্রথম দিন-দুই করিম বক্‌শ মোটেই গা করে না। তিন দিনের দিন বেশ তোড়জোড়ের সাথে জ্বর ওঠে। বিছানায় পড়ে পড়ে কাসু প্রলাপ বকে।

করিম বক্‌শ দাওয়ায় বসে মাটির ওপর আঁচড় কেটে বাকি খাজনার হিসেব করছিল। সে ঘরের মাঝে উঠে এসে বলে—কাসু, অ কাসু! কি অ্যাঃ? অমুন করস্ ক্যাঁ?

—ছালাবুড়ি আইল! উঃ—উঃ—উঃ! না—না, বা'জান কইতাম না।

করিম বক্‌শ কাসুর মাথায় কপালে হাত দিয়ে দেখে। হাত রাখা যায় না। মনে হয়, পুড়ে যাবে হাত।

—মা, মা, মাগো মা।

করিম বক্‌শ বলে—ম্যাঁও ম্যাঁও করস ক্যাঁ? আল্লা আল্লা কর। আল্লায় রহম করব।

কাসুর হুঁশ নেই। সে কখনও বিড় বিড় করে, কখনও বা টানিয়ে টানিয়ে প্রলাপ বক্‌তে থাকে।

করিম বক্‌শ উদ্বিগ্ন হয়। সে তাড়াতাড়ি করে ফকির বাড়ি যায়। গ্রামের সেরা ফকির দিদার বক্‌শ এসে হাতের লাঠিটা বেড়ার সাথে ঠেকিয়ে রেখে কাসুর বিছানার পাশে বসে।

কাসু প্রলাপ বক্‌ছে—ওইডা কী? তেঁতুল গাছ!

কিছুক্ষণ বসে থেকে দিদার বক্‌শ চোখ বুজে ওপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটে চাপ দিয়ে বিজ্ঞের মতো কয়েকবার মাথা নাড়ে। তারপর গাম্ভীর্যের সাথে বলে—আর দ্যাখ্‌তে অইব না। মোখ দেইখ্যা আগেই আমি বোঝতে পারছি।

করিম বক্‌শ উদ্বেগভরা কণ্ঠে বলে,—কী, পাগল ভাই?

দিদার বক্‌শকে সবাই পাগলা দিদার বলে।

সে বলে—আবার কি! কথা হুইন্যাও মালুম করতে পার না? দ্যাহ না কেমুন বিল্‌কি-ছিল্‌কি কয়?

—আমিও আগেই মালুম করছি কিছুডা। সব সময় খালি কয় গোঙাবুড়ি আইল। গলা টিপ্পা ধরল। আল্লা খোদার নাম নাই মোখে। আর কেবল ম্যাঁও ম্যাঁও করে। আমার দাদার মোখে হুনছি, ভূতে পাওয়া মানু আল্লার নাম ভুইল্যা যায়। এহন কি করা যায়, পাগল-ভাই?

—কিছু চিন্তা নাই! হোন, একখান ন্যাক্‌ড়া লইয়া আহ। আর এক চামুচ কড়ুতেল।

ফকিরের নির্দেশ মতো করিম বক্‌শ ন্যাক্‌ড়া ও সর্ষের তেল নিয়ে আসে। ন্যাকড়া দিয়ে দড়ি পাকিয়ে ফকির তার এক প্রান্ত ডুবিয়ে ধরে তেল-ভরা ঝিনুকের মধ্যে। তারপর বাতির শিখার ওপর দড়ির তেল-মাখান মাথাটা পোড়া দেয়। দড়ির প্রান্ত থেকে যখন ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে, তখন ফকির কুণ্ডলায়িত ধোঁয়াসহ গরম প্রান্তটা কাসুর নাকের মধ্যে বারবার প্রবেশ করিয়ে দেয়। কাসু যন্ত্রণায় উঃ করে ওঠে প্রত্যেক বার। তার কোমরটা বিছানা ছেড়ে উঁচু হয়ে ওঠে। শক্তি নিঃশেষ করে হাঁচি দেয় কয়েক বার।

মুখে হাসি টেনে ফকির বলে— অ্যাঁচি দিছে, আর চিন্তা নাই। এই অ্যাঁচির ঠেলায় আলাই-বালাই পলাইব। যদি একেন্ত না-ই পলায়, তয় মগরিবের ওক্তে একবার খবর দিও। আইজ রাতেই বৈডক দিমু। হেইখানে বোলাইয়া ওর চৌদ্দ-গোষ্ঠির ছেরাদ্দ করুম। ভালয় ভালয় যদি না যায় তো ওস্তাদ শেখ ফরিদের নাম লইয়া এমুন মন্তর ঝাড়ুম, যার তেজে সুড় সুড় কইর‍্যা আমার বোতলের মইদ্যে ঢুকব। আমি তহন চট্ কইর‍্যা বোতলের মোখ্ বন্ধ কইর‍্যা দিমু। তারপর আমার শিথানের নিচে মাডিতে গর্ত কইর‍্যা বোতলডা উপুড় কইর‍্যা বহাইয়া মাডি দিয়া ঢাইক্যা দিমু। আমার শিথানের নিচে কি একটা দুইডা! এই রহম কত ভূত-পেত্নী, দানা-পিচাশ, জিন-আতশ কবর দিয়া থুইছি, লেখা-জোখা নাই। কিন্তুক জাহিলগুলোর মউয়ত নাই। রাইতে যহন বালিশে মাথা রাখি, তহন কত কান্দা-কাডি! কয়,—আর কোনো দিন আদমজাতের ক্ষতি করতাম না। একবার ছাইড়্যা দ্যাও। তোমার গোলাম অইয়া থাকমু। তোমারে পাকিস্তান জয় কইর‍্যা দিমু, পাকিস্তানের রাজা বানাইমু। আমিও কই—'আমি রাজা অইতে চাই না। তোরা রোজকিয়ামত পর্যন্ত বোতলের মইদ্যে থাক্‌বি। গোলমাল করলে উফায় নাই।'

করিম বক্‌শ শোনে মনোযোগ দিয়ে। ফকিরের গল্প শুনে সে বিস্ময়ে হতবাক। একটা কুলোয় করে সে সোয়া সের চাল আর সোয়া পাঁচ আনা পয়সা এনে ফকিরের পায়ের কাছে রেখে দেয়।

রাত বারোটার পর বৈঠক। মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালিয়ে লোকজন ও শাগরেদসহ দিদার বক্‌শ ফকির 'ভারানে' বসে!

আগেই সে জিজ্ঞেস করে,—কার উপ্‌রে চালান দিমু, করিম বক্‌শ? তোমার উপ্‌রে?

—আমার উপরে! না—না—না খবরদার ভাই, খবরদার! আমার ডর করে।

—ডর করলে চলব ক্যাঁ? তোমার উপ্‌রে ত আর চিরজনম ভার অইয়া থাক্‌ব না। আমার কাম অইয়া গেলে আবার নামাইয়া দিমু।

—না। আর কেওরে কইয়া দ্যাহেন।

—কে আছে আর? রুস্তম, তুমি? সাদেক? হারুন? কিচ্ছু ডর নাই। এক্কেরে পান্তাভাত।

সবাই মাথা নেড়ে অস্বীকার করে! শেষে ফকির তার এক শাগরেদকে ঠিক করে। তার ওপরেই ভর করবে ভূত।

দিদার বক্‌শ মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়,—খবরদার, কেও চউখ উপর দিক কইর‍্য না! ভূতের চউখে চউখ পড়লে তোমাগ চউখ গইল্যা পানি অইয়া যাইব।

ফকির এবার বাবরি চুল নাচিয়ে গলার মধ্যে কেমন ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করে 'জিকির' আরম্ভ করে।

এক সময়ে ঘরের চালার ওপর ঢিল পড়তে শুরু করে।

ফকির বলে—চাইঙ্গা মারস ক্যাঁ? পিড়পিড়াইয়া ঘরে আয়। ঘরে আইতে অইবই।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের চালাটা কড়কড় করে ওঠে। সাথে সাথে ফকিরের চেলাটিও দুলতে আরম্ভ করে আর গলার ভেতর অদ্ভুত ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করে—হ্যাঁরে—হাঁই—হুম।

সবাই বুঝতে পারে, ওর ওপরে ভূত 'ভর' করেছে। দিদার বক্‌শ এবার টানা সুরে বলতে আরম্ভ করে,—

আমার নাম দিদার বক্‌শ শুইন্য মন দিয়া
আমার নামে ভূত-পেত্নি সবাইর কাঁপে হিয়া!
শেখ ফরিদের নাম লইয়া যদি মন্তর ঝাড়ি,
হাজার গণ্ডা ভূত-পেত্নি ভেল্টাইবার পারি।
হাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।
তোমার লেইগ্যা বইস্যা আছি, কও তোমার নাম।
কিবা জাত, কিবা গোত, কোন্ খানেতে ধাম?
হাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

শাগরেদের ওপর চালান-দেওয়া ভূত বলে—

আমার নাম ল্যাজফট্‌কা থাকি ডালে ডালে,
কাচ্চা-বাচ্চা পাই যদি ভরি দুই গালে।
সিয়ানা অইলে তার কান্ধে চইড়্যা বসি,
লহু-মাংস শুষে খাই সারা দেহ চষি।
হাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

রুস্তম অন্ধকারের মধ্যে বাম হাত চালিয়ে পাশের সাদেকের পিঠে চাপ দেয়। উদ্দেশ্য, সাদেকের মনে এ ব্যাপারে আরো বেশি বিস্ময় জাগিয়ে তোলা। কিন্তু সাদেক কাঁপছে থরথর করে। তার রক্তও বুঝি হিম হয়ে যায়।

পাশের ঘরে কাসু থেকে থেকে প্রলাপ বকছে। ফকির আবার বলে—

শোন্‌রে ভাই ল্যাজফট্‌কা, রাখ বাজে কথা,
বাঁচতে চাইলে উড়াল দে যথা ইচ্ছা তথা।
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।
এই বাড়ি ছাইড়্যা যদি না যাস্ চলে,
লোয়া পুইড়্যা লাল কইর‍্যা ছেঁকা দিমু গালে।
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

ভূত বলে—

তোর মতন ফকিরের রাখি কিরে ডর?
কত ফকির ভাইগ্যা গেল খাইয়া থাপ্পর।
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

বিছানার ওপর দুই হাতের থাপ্পড় মেরে ফকির বিকট চিৎকার করে,—

তয়রে হারামজাদা বইস্যা থাক সোজা,
পাগলা দিদার মন্তর ঝাড়ব বুঝবি এহন মজা।
কই গেলিরে ল্যাবা ভূত, কই গেলিরে ট্যাবা,
কই গেলি কাইল্যা ঠ্যাডা, কই গেলিরে খ্যাবা,
সমদ্দুরের ফেনা আইন্যা—

ভূত এবার ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। দুই হাতে ফকিরের পা জড়িয়ে ধরে বলে—না, না, না। আমি এহনি চইল্যা যাই। সব্বনাশ কইর‍্য না আমার। বাপ্পুস রে!

—হ, অহনি চইল্যা যা। দেরেং করলে বোতলের মইদ্যে আটকাইয়া ফালাইমু, কইয়া দিলাম হেই কতা।

—তুমি আমার মনিব। আমি তোমার নফর। যাওনের আগে একটা ভোগ দ্যাও।

—কিয়ের ভোগ?

—আড়াই গণ্ডা শবরীকেলা, মিহিন চাউলের ভাত
সেরেক পাঁচেক মাইপ্যা দিও কাইট্যা কেলার পাত।
ঝাল-ছাড়া নুন-ছাড়া গজার মাছ,
রাইখ্যা দিও এইগুলা যেথায় তেঁতুল গাছ।

ফকির বলে—আইচ্ছা, আইচ্ছা, দিমু। তুই অহন পলা।

অন্ধকারের মধ্যে ঘরের চালাটা আবার কড়কড় করে ওঠে।

বাতি জ্বালাতেই দেখা যায়, ফকিরের শাগরেদ বিছানার ওপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ফকির ও তার অন্যান্য শাগরেদ ছাড়া আর সবার মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে।

ফকির এবার পানিতে হাত ভিজিয়ে শাগরেদের গায়ের ওপর ছিটিয়ে দেয়। শাগরেদ লাফ দিয়ে ওঠে।

ফকির আড়ামোড়া ভেঙে শাগরেদকে জিজ্ঞেস করে,—কিরে, কই আছিলি এতক্ষুণ?

—ঘুমাইয়া পড়ছিলাম।

ফকির মাথা নাড়ে আর গোঁফের তলা দিয়ে হাসে।

করিম বক্‌শ বলে—ঘুমাইছিলা! আর তোমার উপ্‌রে এত তফরখানা গেল!

ফকির অভিভাবকের মতো বলে,—থাউক, থাউক, ওয়া নিয়া আর মাথা ঘামাইয়া কাম নাই। হোন করিম বক্‌শ, কামডা খুব সহজে অইয়া গেল। ওরে ওই হগল খাইতে দিলেই ও চইল্যা যাইব। কাইলই বাজার তন গজার মাছ, কেলা আর চিনিগুড়া চাউল আইন্যা আমার কাছে দিও। তেঁতুল গাছের গোড়ায় আমিই রাইখ্যা আস্‌মু ঠিক রাইত দুপুরের সুময়। তোমাগ যেই ডর! তোমার উপরে এই কাম ছাইড়্যা দিতে ভস্‌সা পাই না।

একটু থেমে আবার সে বলে,—ভূত ছাইড়্যা গেলে কাসুরে গোসল করাইয়া পাক-সাফ করতে অইব।

—গোসল! এই জ্বরের মইদ্যে?

—হ, হ। জ্বর কুথায় দ্যাখছ তুমি? এইডাও জান না, ওরা আগুনের তৈয়ারি? আমাগ মতন মাডির তৈয়ারি না। ঘেডির উপরে চাইপ্যা থাকলে শরীল গরম না অইয়া যায়? পরশু বিহানে মোরগের বাকের আগে কাসুরে রাস্তার তে-মাথায় নিয়া গোসল করাইতে অইব। তুমি সাত পুকুরের পানির যোগাড় রাইখ্য। সাত ঘাডের না কিন্তুক। এক পুকুরেরও সাতখান ঘাড থাক্‌তে পারে। সাত পুকুরের পানি অওয়ন চাই।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

ইয়াদ– মনে রাখা। **নওশা–** বর। **অতহত–** অতশত। **সর্মান–** সম্মান। **জোখা–** সাপ। **কিরপিন–** কৃপণ। **হায়ান–** জানোয়ার, জন্তু। **বৈডকে–** বৈঠকে। **ছেরাদ্দ–** শ্রাদ্ধ। **মউয়ত–** মউত, মৃত্যু।

সারসংক্ষেপ

দিনক্ষণ দেখে মায়মুনের বিয়ে ঠিক হয়। হাসু ও শফি বাজার করে আনে। ছেলের বাবার দেওয়া টাকা– সামান্য আয়োজন। গ্রামের নানান রকমের মানুষ ও মাতব্বরদের বহু কথাবার্তার পর জয়গুনের বেপর্দা চলাফেরার জন্য তওবা পড়ানোর প্রস্তাব আসে। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলেও শেষ পর্যন্ত জয়গুনকে তওবা পড়তে হয়। ওসমানের প্রথম স্ত্রীর গয়না আর

কাপড় দিয়ে বিয়ে পড়ানো হয়। ছেলের বয়সও অনেক বেশি। খাওয়ার সময় যাওয়া নিয়ে নানান গালগল্প হয়। কোনো ডুলি পালকি না থাকায় নতুন বউকে কোলে করেই নিয়ে যেতে হয় শ্বশুরকে।

করিম বকশ কাসুকে এখন কড়া নজরে রাখে। যেখানে যায় সেখানে সঙ্গে নিয়ে যায়। এমন কি ধান কাটার জন্য খেতে গেলেও সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু করিম বকশকে যেতে হবে একটু দূরে– অন্যের জমিতে ধান কাটতে। কাসুকে সঙ্গে নিয়ে অতদূরে ভরসা পায় না করিম বকশ। আবার বাড়িতে রেখে যেতেও ভরসা পায় না। শেষে এক মতলব বের করে করিম বকশ। পাশের বাড়ির হারুনকে ভূত সাজিয়ে ভয় দেখায় কাসুকে। যাতে সে তেঁতুল গাছটার কাছে যেতে না পারে। জয়গুনের বাড়ি যেতে পথে পড়ে গাছটা। বিষম ভয় পেয়ে জ্বরে পড়ে কাসু। সে ভুল বকতে থাকে। চিকিৎসায় আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে কাসু। তারপর ফকির ভূত নামায়। সবই ফকিরের কারসাজি– কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ অতশত বোঝে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. মৌলবি সাহেবের দৃষ্টিতে জয়গুন কার মতো ঘুরে বেড়ায়?

ক. হায়ান　　খ. শইল
গ. হাঁস　　ঘ. খিঞ্জির

৩৪. গদু প্রধানের 'পোয়াবারো' কেন?

ক. চালের দাম বাড়লে　　খ. চালের দাম কমলে
গ. রেশনের চিনি পেলে　　ঘ. জমিদার খাজনা কমালে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গ্রামে স্কুল করতে চায় আক্কাস। তার এই মহৎ সিদ্ধান্তকে পাড়ার অনেকেই স্বাগত জানায়। কিন্তু বেঁকে বসে জমির আলি। সে বলে, "মসজিদের উন্নয়ন না কইরা স্কুল বানাইলে আল্লাহ নারাজ অইব।"

৩৫. উদ্দীপকের জমির আলির সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. গদু প্রধান　　খ. জহিরুদ্দিন
গ. কেরামত　　ঘ. জব্বর মুন্সী

৩৬. এরূপ সাদৃশ্য যে কারণে–

i. ধর্মব্যবসায়ে
ii. মাজার বিশ্বাসে
iii. মানব কল্যাণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. iii

পাঠ-১০

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- শ্বশুরবাড়ি থেকে মায়মুনের বিতাড়নের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- কাসুর পীড়ার সংবাদে জয়গুনের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- রমেশ ডাক্তারের ডাক্তারির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিপদের মুখে জয়গুনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারবেন।
- জয়গুনের সেবাশুশ্রুষার একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- করিম বকশের মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

[ষোল]

মায়মুন শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে এসেছে। জয়গুন রাগে ফেটে পড়ে। কঠিন স্বরে জেরা করতে আরম্ভ করে,–না কইয়া পলাইয়া আ'লি ক্যাঁ? এহন মাইনষে হুনলে ঝাঁটা মারব মোখে।

–পলাইয়া আহি নাই মা। খেদাইয়া দিছে।

–খেদাইয়া দিছে!

–হ, দ্যাহ না আমার নাক-কান খালি। গয়নাগুলো খুইল্যা নিছে। পিন্দনের কাপড়ডা রাইখ্যা এই ছিঁড়া কাপড়ডা দিছে।

কৈফিয়তে জয়গুনের রাগ নামে। ব্যাপারটার কিছু কিছু সে হাসুর কাছে শুনেছিল সেদিন। কিন্তু তার শাশুড়ীর এরূপ আচরণের কোনো কারণ হাসু বলতে পারেনি। সেও ভেবে পায় না। জয়গুন আবার জেরা করে–কি দোষ করছিলি? ক' শীগ্‌গীর।

–কিচ্ছু দোষ করি নাই, মা।

মায়মুনকে শ্বশুর বাড়ির কেউ পছন্দ করেনি। সোলেমান খাঁও না। কিন্তু অপছন্দের কথা সে কখনও মুখ ফুটে বল্‌তে পারেনি। কারণ সে নিজেই দেখেশুনে ছেলের জন্যে বউ পছন্দ করেছিল।

মায়মুন যেদিন প্রথম শ্বশুর বাড়ি আসে, সেদিনই তার শ্বশুর-শাশুড়ীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

শাশুড়ী বলে–তুমি কি চউখের মাথা খাইয়া বউ দেখছিলা? এই রহম জালি বউ দেইখ্যা-হুইন্যা আনে কেও? এহন ভাত কাপড় দিয়া পাল্‌তে অইব।

–জালি কোহানে দ্যাখছ তুমি? এক্কেরে ঝুনা নাইকল।

–হ, ঝুনা না আরও কিছু। ও না পারব ওসমানের ঘর করতে, না পারব এক কলসি পানি আন্‌তে। দুই ঠ্যাং লইয়া ঢেঁকির উপ্‌রে ওঠলেও কথা হোন্‌ব না ঢেঁকি! দুই সের চাউলের ভাতের আঁড়ি উডাইতে গেলে ফেলাইয়া দিব। তহন ভাতও যাইব, আঁড়িও যাইব।

সোলেমান খাঁ কথাগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারে। কিন্তু নিজের কৃতকর্মের জন্যে স্ত্রীর কাছে সে হার মানতে রাজি নয়। সে স্ত্রীকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বলে–তুমি কিচ্ছু চিন্তা কইর‍্য না। হবায় বিয়ার পানি পাইছে। দুই মাসের মইদ্যেই দ্যাখবা বউ আমাগ লায়েক অইছে।

কিন্তু দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। মায়মুন তার শ্বশুর-শাশুড়ীর চোখের সামনে তাদের ইচ্ছেমত বড়সড় হয়ে উঠল না। যেমন ছিল, তেমনটি রয়ে গেল। শাশুড়ীর রাগ ধরে–কেন সে ভোমরায় আল্ দেওয়া কদুর মতো ঝিম ধরে থাকল, কেন হাতে-পায়ে বড় হয়ে উঠল না।

সোলেমান খাঁর এজলাসে প্রায়ই এ ব্যাপারে শুনানি হতে থাকে। একদিন সোলেমান খাঁর স্ত্রী বলে,—ভাত খাইতে ত কম খায় না। আমাগ দুনা ভাত খায়। যদি জিগাই আর নিবি বউ? তয় কোনো দিন 'না' করব না। আঁসের মতন গলা-সমান খাইয়া টাব্‌বুস অইয়া তারপর উঠ্‌ব। এত খাওয়া ত' বড় অওয়নের নাম নাই। আর অইবই বা কেমনে। সূর্যু-দীগল বাড়ির মাইয়া। পরাণ লইয়া বাঁইচ্যা আছে, এই কফালের ভাইগ্য। তোমারে হেইসুম কত কইর‍্যা যে কইলাম, সূর্যু-দীগল বাড়ির মাইয়া আননের কাম নাই। হেইয়া হোন্‌লা না। মাইয়ার উপরে পেত্নীর দিষ্টি না আছে ত কি কইলাম।

সোলেমান খাঁ মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর বলে— মানুষ ত তিন আঙুল। এত ভাত রাখে কই?

কে জানে কই রাখে? আমার মনে অয় গলার তন পাও পর্যন্ত বেবাকখানি ওর প্যাট। এমুন হাবাইত্যা ঘরের মাইয়া বেশি দিন ভাত-কাপোড় দিয়া রাখলে তোমারে আর বিচরাইয়া পাওয়া যাইব না—তাল্লুক-মুল্লুক বেচতে অইব।

সোলেমান খাঁ নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে,—আমার মনে লয়, তোমার কথাই খাডি। পেত্নীর দিষ্টি আছে। পেত্নী ওর লগে খায় বুইল্যাই না এত ভাত লাগে।

সোলেমান খাঁ-র স্ত্রী আবার বলে,—হোন কই, এই রাক্‌কস রাহনের কাম নাই। হেদিন ওসমানের ঘরে দিছিলাম। শরমেরও কতা। রাইতে হেই কি চিক্কইর! আর এট্টু অইলে চৌদ্দ বাড়ির মানু একখানে কইর‍্যা লইত? ছিঃ ছিঃ! অ-ঘিন, অ-ঘিন। বোঝলাম, এইডা জুয়ান অইতে অইতে আমার ওসমান ঠুণ্ডা অইয়া যাইব। আর এদ্দিন তক্তে বহাইয়া খাওয়াইলে ফউত অইয়া যাইবা, কইয়া রাখলাম। কমসে কম তিন খান বচ্ছর ত লাগব লায়েক অইতে।

—কি করতে চাও তয়?

—আমি কই, ওরে ওর মা-র কাছে পাডাইয়া দ্যাও। মা-রডা খাইয়া বড় অউক। জেরে দ্যাহা যাইব।

সোলেমান খাঁ সব শুনে এবার রায় দেয়—ওরে ওর মা-র কাছেই পাডাইয়া দ্যাও। আমি আবার ওসমানের শাদি দিমু।

—গয়নাগুলা?

—খুইল্যা রাখবা। ওসমানের বিয়া দিতে লাগব তো। আবার জোড়ায় জোড়ায় গয়না বানাইমু, ট্যাকা কই? ট্যাকা কি গাছের গোডা যে, ঝুল দিলেই পড়ে? খালি গয়না ক্যাঁ, কাপোড় দুইডাও রাইখ্যা দিবা। কয়মাস আগে কিনছি। অহনও দুই ধোপ পড়ে নাই। এই কাপোড় আর গয়না দিয়া হাজাইয়া নতুন বউ ঘরে আনমু।

তারপর একদিন হাসু ও শফি আসে মায়মুনকে দেখতে। মায়মুনের শাশুড়ী, দুটি ননদ ও ছোট্ট একটি দেবর একটা চাঙারির চারপাশে চক্রাকারে বসে কাঁচা মটর-শুঁটি ছাড়াচ্ছিল। মানুষ আসার শব্দ পেয়ে মায়মুনের শাশুড়ী একবার তাকায়। তারপর মাথায় আঁচল টেনে আবার মটরের দানা বাছতে শুরু করে।

হাসু ও শফি পরস্পর মুখের দিকে তাকায়। এ রকম অবজ্ঞা ও অবহেলার কি কারণ থাক্‌তে পারে, তারা ভেবে পায় না।

হাসু জিজ্ঞেস করে—কেমুন আছেন মাঐ সা'ব? মায়মুন কই?

উত্তর দেয় মায়মুনের ছোট ননদ,— গাঙ্গের ঘাডে পানি আনতে গেছে। তার মুখের কথা শেষ না হতেই মায়মুন আসে। কাঁখের কলসিটা ছোট। তবুও তার ভারে মায়মুন সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। কোমর বেঁকিয়ে খোঁড়ার মতো পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে সে আসে। হাসু ও শফিকে দেখতে পেয়ে খুশিতে ভরে ওঠে। সে পানির কলসিটা রান্না ঘরে রেখে ছুটে আসে।

হাসুর একটা হাত ধরে বলে,—মিয়াভাই গো, কোনসুম আইলা?

—এইত আইলাম।

—আমি যাইতাম তোমার লগে।

জরিনা বিবি অর্থাৎ মায়মুনের শাশুড়ী এবার ফোঁস করে ওঠে,—হ, যাও। ভাইর লগে অহনই চইল্যা যাও। হ হাশেম মিয়া, তোমাগ আল্‌লাদি বইন্‌গারে আইজই লইয়া যাও। আমরা আর রাখতে চাই না।

—কী অইছে মাঐ? কোনো দোষ করছে মায়মুন?

—না বাপু, অমুন ঝিরকুইট্যা বউ দিয়া আমাগ চলব না। কই গেলি ওসমান? কী কইছিলাম?

জরিনা বিবি ঘরে যায় ওসমানের কাছে। আস্তে আস্তে বলে—গয়না গুলা খুইল্যা রাখ। পিন্দনের কপোড়ডা রাইখ্যা এট্টা ছিঁড়া কাপোড় দিয়া দে! ওডা পিন্দা কোনো রহমে শরম বাঁচাইয়া আতে পায়ে যাউক্‌গা ভাইর লগে।

ওসমানের চোখে-মুখে অক্ষমতা ফুটে ওঠে। হাসু ও শফির উপস্থিতিতে এ কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বলে,—তুমি দ্যাও গিয়া। আমার শরম করে।

—আহা, আমার নতুন বউ রে! অত যদি শরম, তয় ঘোম্‌ড়া দিয়া ঘরে বইয়া থাক। তোরা মরদ অইছিলি কোন দুক্‌খে? আমি মাইয়া মানুষ। পারি কিনা-পারি দ্যাখ চউখ মেইল্যা!

জরিনা বিবি দুই গোত্তা দিয়ে দু'পা এগুতেই ওসমান বাধা দেয়,—মা, মা, হোন। ওরা আইজ যাউকগা। পরশু তরশু আইয়া যেন লইয়া যায়।

জরিনা বিবি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে যায়। ওসমানের দিকে ফিরে বলে,—আইচ্ছা, কইয়া দেই।

তারপর ঘর থেকে নিচে নেমে হাসু ও শফির দিকে চেয়ে বলে,—হোন বাপু। কাইল পরশু আইয়া তোমাগ বইনেরে লইয়া যাইও।

হাসু বলে—বিষয় কি? কী অইছে মাঐ?

—কিচ্ছুই অয় নাই মিয়া। যা কই মনে থাকে যেন।

শফি হাসুর দিকে চেয়ে বলে—আইজই মায়মুনেরে লইয়া যাই।

—না, আইজ থাউক। মা-র কাছে জিগাইয়া দেহি, যদি নিতে কয়, তয় লইয়া যাইমু।

হাসুর কথা শুনতে পেয়ে জরিনা বিবি বলে,—মা-র কাছে আর হোন্‌তে অইব না বাপু। তোমার মা মানা করত না। কাইল আইয়া লইয়া যাইও।

—আইচ্ছা।

এই 'আইচ্ছা' বলে যে হাসু চলে গেল আর হাসুর দেখা নেই। জরিনা বিবি নিজেই মায়মুনের গায়ের গয়না খুলে একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে তাকে তৈরী করে রেখেছে। তিন দিনের দিনও যখন কেউ এসে নিয়ে গেল না, তখন তার পরের দিন ভোরবেলা জরিনা বিবি নিজেই মায়মুনের হাত ধরে বাড়ির নিচের মটর খেতের পাশে এনে ছেড়ে দেয়। তাদের পেছনে মায়মুনের দুটি ননদও এসে দাঁড়ায়।

দূরে সূর্য-দীঘল বাড়ির তালগাছটা দেখিয়ে জরিনা বিবি বলে,—ঐ তালগাছটা বরাবর চইল্যা যাও। খোদায় যদি তোমার কপালে এই বাড়ির ভাত লেইখ্যা থাকে তো আবার আইও, অহন মা-র বুকের দুধ খাইয়া মোটা তাজা অও গিয়া।

—আমি একলা যাইমু? মায়মুন জরিনা বিবির মুখের দিকে তাকায়।

—একলা যাইবা না তো দোকলা পাইবা কই? যাও। তোমার রূপ বাইয়া বাইয়া পড়ে না সোনা। পথের মাইন্‌ষে ধইর‍্যা লইয়া যাইব না।

মায়মুন যেন কারাগার থেকে খালাস পেয়ে এল। তার আনন্দই হয়। আর সে আনন্দ বেড়ে যায় প্রত্যেক পদক্ষেপে। পেছনে তাকাতেও তার ভয় হয়।

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়ে মা-র কর্কশ জেরার মধ্যে পড়ে তার বুক দুরু দুরু করতে থাকে।

জয়গুন আবার জিজ্ঞেস করে—কী দোষ করছিলি?

—কিচ্ছু দোষ করি নাই মা।

—দোষ-ঘাইট না করলে অম্বায়ই খোদাইয়া দিল? হাসুকে দিয়া অহনই আবার পাডাইয়া দিমু।

শফির মা আসে। কথার আগা-গোড়া না শুনেই শুরু করে—পুরুষের ঘরতন পলাইয়া আহে কেও? পুরুষের ঘরই মাইয়ালোকের হাপন ঘর। হেইখানে জিন্দিগী কাডাইতে অইব। হউর-হাউরীর খেদমত করতে অইব। মরলেও হেই মাডি বুকের উপুর লইয়া থাকতে অইব। হেই মাডি ছাড়তে আছে? হেই মাডি কামড় দিয়া পইড়্যা থাক্‌তে অয়।

মায়মুনের মুখের দিকে চেয়ে দেখে জয়গুন। অসহায় চোখ দুটো টল্‌টল্ করছে, করুণা ভিক্ষা করছে তার কাছে।

এবার মায়মুনের ওপরের সমস্ত রাগ জয়গুন শফির মা-র ওপর ঢালে। সে বলে,—থাউক, থাউক। আর বকর-বকর কইর না। তুমি বুড়া অইছ বাতাসে। তোমার কথায় মাডি খাইছি আমি। অমন বুইড়্যা জামাইর কাছে মাইয়া না দিয়া কুচি কুচি কইর‍্যা কাইট্যা গাঙ্গে ভাসাইয়া দেওয়ন ভালা আছিল। আমার বাড়ি থাকতে ও এমুন আছিল? প্যাট ভইর‍্যা ভাত খাইতে না পারলেও, এই রকম হুকনা কাষ্ট আছিল না।

শফির মা মায়মুনকে জিজ্ঞেস করে—তোর হাউরী প্যাট ভইর‍্যা তোরে খাইতে দেয় নাই, মায়মুন?

—এই দুই মুঠ ভাত দিয়া কইত—নে, খাইয়া ওঠ বউ। দিনকাল ভালা না। প্যাট উনা থাকলে কোনো ব্যারাম-আজার আইতে পারে না।

—অ্যাঁহ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। কাসুর মা বাড়িতে আছ?

গলা খাঁকারি দিয়ে সাদেক মিয়া সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

জয়গুন মাথায় কাপড়ের আঁচল টেনে দেয়। শফির মা জিজ্ঞেস করে—কী খবর সাদেক মিয়া?

—খবর বেশি ভালা না। কাসুর খুব অসুখ। যহন-তহন অবস্থা।

জয়গুন চম্‌কে ওঠে। তার পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে। দুনিয়াটা অন্ধকার ঠেকছে চোখে। ঘোমটার নিচে অস্ফুট প্রতিধ্বনি হয়—কাসুর অসুখ! যহন-তহন অবস্থা!

—বে-হাল অবস্থা। করিম ভাই আমারে পাডাইয়া দিছে, তোমারে নিতে। দেরি অইলে—

সাদেক মিয়ার মুখ দিয়ে কথার শেষটা বের হয় না।

কাসুর শয্যা-পার্শ্বে দু'জন মৌলবি অনর্গল দোয়া-কালাম পড়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে করিম বক্‌শের কথার নিচে তাঁদের স্বর চাপা পড়ে যায়। তার আকুল আবেদন কান্নার মতো বেরিয়ে আসে—আল্লা, তুমি আমার কাসুরে বাঁচাও। তুমি জান-মালের মালিক। ওর জানের বদলে দুইডা জান সদকা দিমু। তুমি ওরে বাঁচাও। ওর জানের বদলে দুইডা খাসি সদকা দিমু। আল্লা, আল্লা, তুমি রহমান, তুমি রহিম। তুমি বাঁচানেওলা। তুমি—

লম্বা ঘোমটা টেনে জয়গুন দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। তার পিছনে হাসু ও শফির মা-কে দেখে করিম বক্‌শ বুঝতে পারে, জয়গুন এসেছে। করিম বক্‌শ মৌলবি দু'জনকে ইশারায় সরে যেতে বলে নিজেও বেরিয়ে যায়।

জয়গুন কাসুর বিছানার পাশে বসে ডাকে—কাসু, কাসু আমার সোনামণি।

শফির মা, শফি, হাসু ও মায়মুন বিছানার দুই পাশে বসে। আঞ্জুমনও আসে। তাদের সকলের মাথা ঝুঁকে থাকে কাসুর মুখের ওপর।

শফির মা বলে—চাইয়া দ্যাখ কাসু। তোর মা আইছে।

কাসু কোনো সাড়া দেয় না। চোখ দুটো আধ-বোজা। মাথাটা কখনও সোজা হয়, কখনও এ-পাশে ও-পাশে হেলে পড়ে। তার নিশ্চল হাত পা ছড়িয়ে আছে লম্বা হয়ে। অনিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের ওপরের কাঁথাটা দুলে ওঠে। বুকের ওপর কান পেতে কফের ঘ্যাড় ঘ্যাড় শব্দ শোনা যায়।

জয়গুন আবার ডাকে,—কাসু, বা'জান একবার চউখ মেইল্যা দ্যাখ।

করিম বক্‌শ ডেকে বলে,—কাসু, চাইয়া দ্যাখ তোর মা আইছে।

কাসুর মাথাটা বাম কাত থেকে ডান কাত হয় শুধু। কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

আঞ্জুমন বলে,—দুই দিন আগেও টাস্ টাস্ কতা কইছে। দুই দিন ধইর‍্যা জ'ব বন্ধ। কত ফকির-কবিরাজ, কত কত পানি পড়া, তাবিজ-তুমার! কিছুতেই কিছু অইল না। যে যা কইছে কোনো তিরুর্ডি অয় নাই। অহন আল্লার আতে সপর্দ। অউয়ত-মউয়ত আল্লার আত। আল্লায় যদি মোখের দিকে চায়।

করিম বক্‌শ দোর গোড়া থেকে বলে,—আল্লা যদি কাসুরে দুইন্যায় রাইখ্যা যায়, তয় আমি জমিনের উপরে খাড়াইয়া মান্‌তি করলাম, কাসুর একটা জানের বদলে দুইডা খাসি জবাই কইর‍্যা তার গোশ্‌ত গরীব মিস্‌কিনরে বিলাইয়া দিমু। কাসুরে আজমির শরিফ খাজা বাবার দরগায় লইয়া যাইমু।

জয়গুনের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে অবিরল ধারায়। হৃদয়ভেদী কান্নার বেগ চেপে রাখতে গিয়ে তার স্বর ভেঙে যায়। ভাঙা গলায় সে আঞ্জুমনকে বলে,—দুইডা দিন আগেও যদি আমারে খবর দিত। ওর মোখের কথা হুইন্যা মনেরে বুঝ্ দিতে পারতাম। ওর 'মা-মা' ডাক হুইন্যা পরাণ শীতল করতাম।

একটু থেমে আবার বলে,—তোমরা ডাক্তর দেহাইছিলা?

—ডাক্তর কী করব? কত ফকির হট্ খাইয়া গেল!

অন্ধকারের মধ্যে জয়গুন আলো খুঁজে বেড়ায়। নিরাশার মধ্যেও আশা চেপে ধরে বুকে। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সে হাল ছেড়ে দেয় না।

হাসুকে সে নির্দেশ দেয়—হাসু, যা। জগদীশ ডাক্তর না অয় আর কোনো ডাক্তর জলদি কইর‍্যা লইয়া আয়। পথে দেরি করিস না। বলেই সে মনে মনে চিন্তা করে, ডাক্তার এলে টাকা দিতে হবে। কিন্তু কোথায় টাকা?

জয়গুন এবার শফিকে বলে—তুই বাড়িত যা। বড় আঁস দুইডা বাজারে লইয়া যা। বেইচ্যা ট্যাকা লইয়া চালাক কইরা আ'বি। কিন্তুক দুইডা আঁসে কত পাওয়া যাইব! বড় জোর দুই ট্যাকা।

মায়মুন বলে,—আমার আঁস দুইডাও লইয়া যাইও, শফি ভাই। আমাগ কাসু বাঁচলে কত আঁস পাওয়া যাইব আবার।

জয়গুন বলে,—হ, চাইড্যা আঁসই লইয়া যা।

শফির মা শফিকে সাবধান করে দেয়,—জলদি কইর‍্যা যা। তোর কিন্তুক আবার শামুকের চল্‌তি। দেরি করলে উফায় রাখতাম না।

নিয়মের দুনিয়ায় অনেক অনিয়ম আছে। 'যেমন কর্ম তেমন ফল" তাই সব সময়ে পাওয়া যায় না।

মাথার ঘাম পায়ে-ফেলা সারাদিনের কর্মফল বড় সামান্য। পরোপকার প্রায়ই বিফলে যায়। সে কর্মে যদিও ফল ফলে, তা তিতো, বিষাক্ত।

এটা অনিয়ম বৈকি।

গ্রামের বুড়ো ডাক্তার রমেশ চক্রবর্তীর বেলায়ও এ অনিয়মটা নিয়মিত ভাবে বিদ্যমান। বিশ বছর রোগী দেখে, ওষুধ ঢেলে-গুলে তিনি হাত পাকিয়েছেন। কিন্তু এই পর্যন্তই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেও অর্থ সঞ্চয় করেননি কিছুই। অসহায় রোগীর চিকিৎসার বোঝাই ঘাড়ে নিয়েছেন শুধু। টাকার সিন্দুক বোঝাই হল না কোনোদিন।

সাধারণভাবে গ্রামের লোকের আস্থা নেই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ওপর। তাদের ধারণা—অ্যালোপ্যাথিকের তেজালো ওষুধ পেটে গেলে রোগী যা-ও দু'ঘণ্টা বাঁচত, তাও শেষ হয়ে যায় দুঘণ্টা আগেই। গ্রামে তাই ফকির-কবরেজদের পসার বেশি। ওষুধ মেশানো পানির চেয়ে বেশি কদর মন্ত্র-পূত পানির। সোয়া পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে যেখানে ফকির বিদায় করা যায়, সেখানে টাকা খরচ করে ডাক্তার বড় কেউ ডাকে না।

ধরাবাঁধা কয়েক ঘর লোক আছে রমেশ ডাক্তারের। ঘুরে ফিরে তারাই আসে। দু'টাকা দেয়, মাসখানেক ধরে চিকিৎসা করিয়ে নেয়। ওষুধ খেয়ে খেয়ে টাকার দাম তোলে। চিকিৎসায় টাকা খরচ করবার মতো বড়লোক যারা, তারা এখানে আসে না। তারা যায় বড় ডাক্তার জগদীশবাবুর কাছে। দিন-মজুরের কাছ থেকে দিন-মজুরি নিয়ে রমেশ ডাক্তারের দিন চলে টেনেটুনে।

রমেশ ডাক্তারের বাইরের ঘরটা একাধারে ডাক্তারখানা ও বৈঠকখানা দুই-ই। ঘরের এক পাশে দুটো আলমারি। তার মধ্যে নানা আকারের শিশি-বোতল সাজানো। ওগুলোর অধিকাংশই খালি। সুদিনে যখন ওষুধ পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত, তখনও ও-গুলো পুরোপুরি ভরা ছিল না।

আলমারির একটা তাকে ভারি ভারি কয়েকখানা ডাক্তারি বই। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার এক পাশে ডাক্তারের বসবার জন্যে একখানা কাঠের চেয়ার, অন্য তিন পাশে টিনের চেয়ার তিনখানা। এক পাশে একটা লম্বা টুল। দেয়ালে পিঠ ঠেস্ দিয়ে আরাম করে বসবার জন্যে টুলটাকে দেয়ালের কাছ ঘেঁষে রাখা হয়েছে। অপর পাশে দেয়ালের সাথে ঠেকানো একটা কাঠের চেয়ার। তার পেছনের একটা পায়া ভাঙা। আসন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হুঁশিয়ার করার জন্যে পায়া-ভাঙা চেয়ারটায় কে একজন একটা কাগজ এঁটে দিয়েছে। তাতে লেখা—খোঁড়া।

এত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও নিরক্ষর গদু প্রধান একদিন চেয়ারটা নিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

ডাক্তারের চোখের সামনে একটা দেয়াল ঘড়ি। বহু দিন ধরে অমেরামত পড়ে আছে। কোনো রসিক লোক ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে ঘড়িটার কাঁচের উপর একটা কাগজ এঁটে দিয়েছে। কাগজটিতে লেখা—'কলেরা রোগী।'

লেখাটা দেখে রমেশ ডাক্তার হেসে ফেলে বলেছিলেন,—কলেরা নয়, কলেরা নয়। হৃদ-বন্ধ। কলেরা হলে এমন ওষুধ খাইয়ে দিতাম—

—কলেরার আবার চিকিৎসা আছে নি? ডাক্তারের কথা শেষ না হতেই জাফর মিয়া বলে।

—নেই কেন? নিশ্চয় আছে। জীবনে কত কলেরা রোগী ভালো করলাম এই হাতে।

—তয় হেইডা আসল কলেরা না। পেডের অসুখ। আসল কলেরা বসন্ত অইলে আবার মানুষ বাঁচে?

—বাঁচে না মানে? একশোবার বাঁচে। এবারও কত রোগী বেঁচে গেল আমার হাতে।

নিত্যানন্দ বলে,—তুমি আবার মানুষ বাঁচাতে পার নাকি, ডাক্তার?

—নিশ্চয়ই পারি।

ডাক্তারের কথায় সবাই হেসে ওঠে। অনেকে মনে করে—ডাক্তারের ক্ষ্যাপামিটা আজ আবার বেড়ে গেল।

—এ কি! তোরা হাসছিস? মানুষ যদি বাঁচাতে না পারি, তবে তোরা আসিস্ কেন? আমার ওষুধ খাস কেন? ডাক্তার টেবিলের ওপর চাপড় মারেন।

কালিপদ বলে,—তোমার কাছে আসি মনের শান্তির জন্যে, মনেরে বুঝ দিতে। তা ছাড়া কি! তুমি বাঁচাতেও পার না, মারতেও পার না। মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত।

কালিপদ ওপর দিকে আঙুল দেখিয়ে ঈশ্বরের অবস্থান নির্দেশ করে।

মুখ বিকৃত করে রমেশ ডাক্তার বলেন,—মরা-বাঁচাটা ঈশ্বরের হাত! তবে দেব এক ফোঁটা পটাশিয়াম সায়নাইড? দেখি কে বাঁচায়?

নিত্যানন্দ বলে—তোমার ঐ বাজে কথা রাখ ডাক্তার। মাথাটা তোমার আজ আবার গরম হয়েছে, বুঝলাম। জগদীশ সেন এত বড় ডাক্তার, সেও এত বড় কথা বলতে সাহস করে না। ঈশ্বরের ওপর ভরসা করে সে। সেদিন অজিত চৌধুরীর ছেলে মারা গেল। জগদীশ ডাক্তার চৌধুরীকে বল্ল—আমরা ওষুধ দিতে পারি, জীবন তো আর দিতে পারি না।

—ও সব ফাঁকা কথা বুঝলে? অজ্ঞতা ঢাক্‌বার পথ ওটা। লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার বুলি। আসলে ও কথার কোনো অর্থ হয় না। এমন অনেক রোগী আছে, যার বাঁচবার ভরসা ছিল না, আমাদের ওষুধ খেয়ে সে হয়তো বেঁচে যায়। যখন বেঁচে ওঠে তখন নাম হয় উপরওয়ালার। তাঁর গুণকীর্তন হয়। মসজিদে শিরনি দেওয়া হয়। হরিলুট দেওয়া হয় মন্দিরে। আমাদের নামও নেয় না মুখে। জালাল শেখের টাইফয়েড হয়েছিল, জানো তোমরা। দুই মাইল পথ হেঁটে রোজ সকালে বিকালে হাজিরা দিয়েছি, ওষুধ দিয়েছি। আমার কাছে ক্লোরোমাইসিটিন ছিল না। জগদীশের কাছ থেকে নিজের টাকায় কিনে দিয়েছি। যখন বেঁচে গেল, তখন একদিন দেখাও করলে না এসে। আমাকে দিয়েছিল কত জানো? তিন টাকা। শুনেছি, আজমিরের দরগায় জালাল পাঁচ টাকা মানত পাঠিয়েছে।

একটু দম নিয়ে আবার তিনি আরম্ভ করেন—আমাদের হাতে সব লোকই যে বাঁচবে তা তো বলছি না। এর কারণ অনেক। একটা কারণ হচ্ছে—চিকিৎসাবিজ্ঞানে আমাদের অজ্ঞতা। আমার হাতে যে রোগী মারা গেল, আর একজন ভালো ডাক্তারের কাছে সে হয়তো মরত না। তা ছাড়া রোগ-নির্ণয়ে, ওষুধ-নির্বাচনে ভুল-ভ্রান্তি, ওষুধের অভাব, যন্ত্র-পাতির অভাব—নানা কারণ আছে। এ ছাড়াও আছে রোগীর গাফিলতি। সময় থাকতে আসবে না। আসবে তখন যখন টলমল অবস্থা। ঐ অবস্থায় ডাক্তার ডেকে কোনো কাজ হয় না। ডুবন্ত নৌকা উদ্ধার করা সোজা ব্যাপার নয়। কথায় বলে—মরণকালে লক্ষ্মীবিলাসের বড়ি কোনো কাজ দেয় না। মানুষ মরবে, এতো সত্য কথা। তবে অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে তো। বাতির তেল ফুরালে তেল দিতে হবে। ঝড়ে নিবে না যায় তার জন্য ঢাক্‌না লাগাতে হবে। বাতিটা যে-দিন ফুটো ঝাঁজরা হয়ে ভেঙে যাবে, সে দিনের কথা আলাদা। অবশ্য সমস্ত লোককে অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার মত চিকিৎসা এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি হচ্ছে দিন দিন।

সবাই বিরক্ত হয় ডাক্তারের ওপর। তারা মনে করে—আজ মাথাটা একটু বেশিই খারাপ হয়েছে ডাক্তারের।

কালীপদ বলে,—রাখ তোমার বক্তিমা। এইবারে বিদায় কর।

ডাক্তার বলেন,—একটু সবুর কর। ওদের আগে বিদায় করি। ওরা দূরের লোক। এসো দেখি দিল মহম্মদ। ক'দিন থেকে জ্বর?

—আইজ চাইর দিন।

ডাক্তার নাড়ী দেখেন। বুক পরীক্ষা করেন। তারপর বলেন—দেখি জিভ। হা করো, আ-এমন করে।

দিল মহম্মদ হা করে। তার নিশ্বাসের সাথে এক ঝলক দুর্গন্ধ এসে ধাক্কা মারে ডাক্তারের নাকে। তিনি মুখটা একপাশে সরিয়ে বলেন—কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়নি।

একটা কাগজে 'ব্যবস্থা' লিখে ডাক্তার বলেন—কোন ভয় নাই। এ কাগজটা কম্পাউন্ডারকে দাও। ওষুধটা দিনে তিনবার খাবে। ঠাণ্ডা লাগিও না। শিশি এনেছো?

—হ্যাঁ

—আচ্ছা যাও। পরশু এসো আবার। আলাউদ্দিন, তুমি এসো। কি তোমার?

—প্যাটটা ফুইল্যা রইছে দুই দিন ধইর‍্যা। একবার খাইলে আর খাইতে ইচ্ছা করে না। ভাত দেখলে বমি আহে। খোয়াবে খাইলে হুন্‌ছি এই রহম অয়।

—অ্যাঁ, কি বল্লি?

—মা কইছে, খোয়াবে যারা খায়, তাগ প্যাট ভার অইয়া থাকে এই রহম। অজম অয় না।

বুড়ো ন'কড়ি বলে—ডাক্তারের কাছে এ-গুলা কইস না। এই সব ভূতের ব্যামোর কিছু ডাক্তার বুঝবও না, বিশ্বাসও করব না। আমিও কত দিন স্বপ্নে খাইছি—রসগোল্লা, সন্দেশ, জিলাফি, কচরি, পানতুয়া—ন'কড়ি মিষ্টির নামের শিকলি ছাড়তে শুরু করে।

মুচকি হেসে ডাক্তার বলেন—খেতে কেমন লাগে?

—কেমন লাগবে আবার! ভালা। ঠিক হালুইকরের মিষ্টির মতন। কিন্তুক অজম অইতে চায় না। অজম অইলে কি আর কথা আছিল?

ডাক্তার রহস্য করে বলেন,—সত্যি, হজম হলে আর কোনো কথা ছিল না। বাজারে যখন রসগোল্লা সন্দেশ পাওয়া যায় না আজকাল, তখন স্বপ্নে বিনে পয়সায়—

—বেশ মজা কইর‍্যা খাওয়ন যাইত। ডাক্তারের মুখের কথা লুফে নিয়ে ন'কড়ি বলে।

ডাক্তার এবার গর্জন করে ওঠেন,—হুঁহ, যত সব আহম্মক নিয়ে কারবার। যা এখান থেকে। স্বপ্নে রসগোল্লা খা গে। ওষুধ খেতে হবে না।

আলাউদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার হাত বাড়িয়ে তাকে একটু কাছে টেনে নেন। জামাটা তুলে রাগের সাথে জোরে জোরে তার পেট টিপতে শুরু করেন।

বাঁধা-ধরা একঘেয়ে জীবন ডাক্তারের এমনি করেই চলে। চলে ঘড়ির কাঁটার মতো একই পথে। কিন্তু তাঁর কাছে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে বলে মনে হয়নি কোনোদিন। মূর্খ লোকের কার্য-কারণহীন আজগুবি কথাবার্তা শুনে তিনি যত বিরক্ত হন, তাদের অজ্ঞতার জন্যে তার চেয়েও বেশি সহানুভূতি জাগে তার মনে। এ সমস্ত লোকের নাড়ী দেখে দেখে তাদের ওপর কেমন একটা নাড়ীর টান জন্মে গেছে ডাক্তারের। ভোর বেলা এদের মুখ দেখলে তবেই তাঁর ভালো লাগে। তাজা হয়ে উঠে দেহ-মন।

কিন্তু কিছুদিন ধরে ডাক্তারের দিনগুলো আর চলতে চায় না। যেন হুঁচোট খেয়ে চলছে দিনগুলো। স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়েছে দেশে। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের চোখে লেগেছে আলোর ধাঁধা। ডাক্তারের স্ত্রীর চোখেও তাই লেগেছে। পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ডাক্তারের পাকা চোখে দূরের সে

আলো নেশা জাগাতে পারে না। পারে না মায়ার সৃষ্টি করতে। স্বামী-স্ত্রীর এই বিরুদ্ধ মনোভাব সংসারের সমস্ত শান্তি নষ্ট করেছে। এই একই প্রসঙ্গ নিয়ে কথার প্যাঁচাল শুরু হয় দু'জনের মধ্যে। সহজে তা থামতে চায় না। স্ত্রী নানারকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন, বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে স্বামীকে প্ররোচিত করেন। কিন্তু আদম তার সংকল্পে অটল। সে জানে, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অর্থ স্বর্গ-ভ্রষ্ট হওয়া। ঈভ তাই নিষিদ্ধ ফলের সাজি নিয়ে ব্যর্থ হয় বারবার।

আজও ডাক্তার রোগী দেখা শেষ করে সবে আঙিনায় উঠেছেন অমনি গিন্নী আরম্ভ করেন,– ওগো শুন্‌ছো? আর তোমাকে বলেই বা কি হবে?

অন্যমনস্কভাবে ডাক্তার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গলা চড়িয়ে গিন্নি বলেন,–জগদীশ ডাক্তার আজ যাচ্ছে, শুনেছো?

–তাতে হয়েছে কি?

–হবে আবার কি? সবাই একে একে চলে যাচ্ছে। আর আমরা এখানে জপমালা নিয়ে বসে থাকি আর কি!

–হ্যাঁ, মালা জপতেই শুরু কর। তাই ভালো। দেখো ঈশ্বর যদি কিছু ব্যবস্থা করেন। চাও তো পুষ্পক রথও পাঠিয়ে দিতে পারেন তোমার জন্যে।

বিরক্তির মধ্যেও নিজের রসিকতায় হেসে ওঠেন ডাক্তার। তার হাসি গিন্নীর অন্তরে ঘা দেয়। তিনি বলেন–তা তুমি যেয়ো।

–আমি যাব! উঁহু! এখান থেকে আমি একচুলও নড়ছিনে। এমন সাজানো বাগিচা ছেড়ে নরকে যেতে পারবো না।

কথায় সুবিধা করতে না পেরে গিন্নী বলেন,–তা বেশ। এখানে থেকে মুসলমানের হাতে যদি কচু-কাটা না হও তো কি বললাম।

–ওসব বাজে কথা রাখ। এখানে কে তোমাকে মারছে শুনি? কতগুলো পশুর প্ররোচণায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না দেখে নিও। ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না–সবাই বুঝতে পেরেছে। ভাইয়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু-মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছেই যায়, তবে বুঝব তার পেছনে কাজ করেছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা। শুধু এখানেই নয়। সব জায়গায় এ হিংস্রতা দেখা দিতে পারে। যেমন আসামে 'বঙ্গাল খেদা' মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ধুতিবালাদের বিরুদ্ধে গুর্খারা কুক্‌রি শান দিচ্ছে। বিহারে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে বাঙালিকে। এখন এক গণ্ডগোলের ভয়ে পালিয়ে আর এক গণ্ডগোলের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। এখানে আমাদের কিসের অভাব? কোন্ দুঃখে যাব আমরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে? জানো না, এখানে আমরা মা-র কোলে আছি।

হাসু এসে ডাক্তারের উঠানে দাঁড়ায়।

ডাক্তারের খোঁজে সে এ-গাঁও ও-গাঁও ঘুরেছে। জগদীশ ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। তিনি পাততাড়ি গুটিয়েছেন। আজই চলে যাচ্ছেন দেশ ছেড়ে। হরেন ডাক্তারও নেই। তিনি অনেক দিন আগেই চলে গেছেন। তাঁর শূন্য ভিটা তচনচ হয়ে আছে ঘাস-লতা-পাতায়।

রমেশ ডাক্তার তখনও বকে বলেছেন–এখন হুজুগে মেতে অনেকেই বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাদের টাকা নেই তারাও যাচ্ছে। অনেকে বাড়ি-ঘর বিক্রি করে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না কিসের নেশায় যাচ্ছে এরা। কিন্তু দেখবে, আবার এরা ফিরে আসবে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ক্ষুধা ও রোগে আধ-মরা হয়ে আবার এরা ফিরবে। কিন্তু তখন আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিলবে না। আমাদের পূর্ব-পুরুষ হিন্দু-মুসলমান আপনজনের মতো কত যুগ ধরে কাটিয়েছে এ মাটিতে। একের ওপর নির্ভর করে বেঁচে উঠেছে আর একজন। একজন যুগিয়েছে ক্ষুধার অন্ন, আর একজন দেখিয়েছে আলো।

ডাক্তার পাশের দিকে দেখেন–গিন্নী নেই। কখন তিনি বেরিয়ে গেছেন। উঠানে হাসু দাঁড়িয়ে। দেখতে পেয়ে ডাক্তার বলেন,–কিরে বাপু, কি চাই।

–আমার ভাইয়ের খুব অসুখ।

স্ত্রীর ওপর এতক্ষণ বক্তৃতা ঝেড়ে রমেশ ডাক্তারের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। তিনি বলেন–আমি যেতে পারব না।

কথাটা বলে তখনি ভাবেন—আর তো কেউ নেই। হরেন অনেক দিন আগেই চলে গেছে। জগদীশও আজ যাচ্ছে। এ তল্লাটে এ তিন জন ছাড়া আর কে আছে? ডাক্তার যাবার মনস্থ করেন। বাড়িতে থাক্‌লে আবার স্ত্রীর কথায় কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং রোগী দেখতে যাওয়া ভালো।

জামা গায়ে চড়িয়ে 'ষ্টেথস্‌কোপ' ও 'এমারজেন্সি ব্যাগ' নিয়ে ডাক্তার বের হন। পেছন থেকে স্ত্রী বাধা দেন—এই দুপুরে রোদ মাথায় করে কোথায় চল্লে আবার?

উত্তর না দিয়ে ডাক্তার এগিয়ে যান।

—চান করে খাও-দাও। বিকেলে যেও। স্ত্রী তাগাদা দেন।

স্ত্রীর কথাগুলোকে শ্লেষের আঘাত করে ডাক্তার বলেন—চান করব আবার খাব। এদিকে মানুষ মরে যাচ্ছে।

পেছন ফিরে ডাক্তার আবার বলেন—এখন দেখো, আমরা চলে গেলে এদের কি উপায় হবে। এতগুলো গ্রামের মধ্যে আমরা তিনটে ডাক্তার ছিলাম। দু'জন তো চলেই গেল। আমিও যদি চলে যাই, তবে এরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

ডাক্তারের ব্যাগটা হাসু হাতে করে নেয়।

ডাক্তার রোগী দেখে চিন্তিত মুখে বলেন—ডবল নিমোনিয়া। এত দিন ছিলে কোথায়?

করিম বক্‌শ বলে—ফকির দেখছিল এতদিন।

—নাকের ওপর ঘা হয়েছে কেমন করে?

—দড়ি-পড়া দিছিল ফকির।

ডাক্তার দাঁতে দাঁত চেপে বলেন,—ফকির! দড়ি পড়া! দেশের শাসন-ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে ব্যাটাদের ফক্কুরবাজি দেখিয়ে ছাড়তাম। ফাঁসি দিতাম ব্যাটাদের। এ নরহত্যা ছাড়া কিছু নয়।

ডাক্তার আসায় জয়গুন বড় করে মাথায় কাপড় টেনে পেছন ফিরে বসেছিল। তার বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পিটছে অবিশ্রান্ত। সে এবার ঘুরে ডাক্তারের পা ধরে করুণ মিনতি জানায়—ডাক্তার বাবু, আমার কাসুকে বাঁচাইয়া দ্যান্। আপ্‌নে আমার ধর্মের বাপ।

[সতেরো]

জয়গুন আহার-নিদ্রা ভুলে দিনের পর দিন ছেলের শয্যা-পার্শ্বে কাটিয়ে দেয়। মায়মুনও থাকে মা-র কাছে। প্রত্যেক দিন খাবার সময়ে করিম বক্‌শের ইঙ্গিতে আঞ্জুমন জয়গুনের হাত ধরে টানাটানি করে খাওয়ার জন্যে। বলে—ওই রহম পেডে পাথর বাইন্দা থাইক্য না। দুইডা দানাপানি মোখে দ্যাও বুজান, নালে শরীল তোমার ভাইঙ্গা যাইব।

জয়গুন খেতে যায় না। সে ভাবে, এ বাড়ির ভাত তার কপাল থেকে অনেক আগেই উঠে গেছে।

হাসু রোজ খাবার নিয়ে আসে। রেখে যাওয়া সে খাবার সে মায়মুনকে দেয়। নিজেও খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার খাওয়া আসে না। দু'এক মুঠো জোর করে গিলে এক মগ পানি খেয়ে একদিন কাটিয়ে দেয়।

দিনের বেলা যেমন তেমন কেটে যায়। কিন্তু রাত্রি বেলা জয়গুনের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে রাত্রির জন্যে প্রস্তুত হয়। বাতির তেল না থাকলে মায়মুনকে পাঠিয়ে পাশের বাড়ি থেকে কুপি মেপে তেল ধার আনে। একটা মাল্‌সাতে তুষ সাজিয়ে আগুন দিয়ে রাখে।

রাত্রে জয়গুনের কাছে থাকবার জন্যে শফির মা আসে। সে 'বুড়া মানু' তাই তার ঘুম কম। রাত্রের যে কোনো সময়ে ডাক দিলে তার সাড়া পাওয়া যায়। সে কাছে থাকলে মনে বল পাওয়া যায়। হাসুও দুই রাত্রি ছিল। কিন্তু ও ছেলে মানুষ। সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। সারা রাত্রির জন্যে আর তাকে সজাগ পাওয়া যায় না। শফির মা-র জন্যে জয়গুন সন্ধ্যার আগেই বেশি করে পান ছেঁচে রাখে, যাতে কাসুর কানের কাছে ঠনর ঠনর করতে না হয়।

শফির মা অনেকক্ষণ বসে থাকে জয়গুনের পাশে। তারা মুখোমুখি বসে। আগুনের মাল্‌সার ওপর হাতগুলোকে গরম করে। মাঝে মাঝে কান মুখ ও অন্যান্য অঙ্গে গরম হাত বুলিয়ে শীত তাড়াবার চেষ্টা করে। শফির মা কখনও পান চিবোতে চিবোতে পিচ ফেলে মালসার মধ্যে। তুষের আগুন থেকে ধোঁয়া বের হয়। নানা কথায় সে জয়গুনকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা

করে। তার নিরাশ মনে আশা জাগিয়ে তোলে। থানার ঘণ্টা যখন জোড়ায় জোড়ায় বাজে, তখন সে গুণতে আরম্ভ করে সাথে সাথে। বলে,—বারোখান বাজল। এইবার এট্টু কাইত অই। আত দিয়া দ্যাখ, কাপড়ডা ভিজ্যা প্যাচপেইচ্যা অইয়া গেছে।

শফির মা কাঁথা উঠিয়ে মায়মুনের পাশ দিয়ে শুয়ে পড়ে। তার শীতল শরীরের ছোঁয়া লেগে মায়মুন একবার নড়া-চড়া করে ওঠে। শফির মা বলে—চুপ কইর‍্যা থাক বেডি, অহনি উম অইয়া যাইব।

শফির মা গরম হাত দুটো মায়মুনের গায়ে বুলিয়ে এবার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করে। জয়গুনকে বলে,—আমাগ রক্ত ঠাণ্ডা অইয়া গেছে। খাড়াকখাড়ি গরম অয় না। ওগ রক্ত গরম। আমার শফিরে বুকে লইয়া হুইলে মুহূর্তুকের মইদ্যে উম অয়। তা না অইলে পৌষ মাইস্যা শীতে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে জান কবচ অওনের জোগাড়। মাইন্‌ষে কইতেই কয়—

পৌষের হিমে ভীম দমন,
মাঘের শীতে বাঘের মরণ।

শফির মা শুয়ে শুয়ে গল্প আরম্ভ করে—ভীম একদিন তার মা-রে জিগায়— 'মা, আমার তন্ বড় জোয়ান কে? তার মা কয়— 'আছে একজন। গাঙ্গের পাড় দিয়া আঁটলেই তার দ্যাহা পাইবা। তহন পৌষ-মাইস্যা রাইত। ভীম কতক্ষুণ পর শীতে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে বাড়িতে আহে। মায় জিগায়—দ্যাহা পালি বা'জান? ভীম কয়— 'হ গো মা।'

জয়গুন কাঠি দিয়ে তুষের আগুন ঘেঁটে তাতিয়ে নেয়। আগুনে হাত-পাগুলোকে গরম করে।

ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উত্তুরে হিমশীতল বাতাস ঢোকে। জয়গুনের শরীরের রক্ত জমে ওঠে যেন!

বাতাসে নিবুনিবু করে কুপিটা। জয়গুন উঠে সলতে উস্কিয়ে দেয়। এক প্রস্ত কাঁথা এনে আগুনে গরম করে গায়ের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে কাঁথাগুলো পালটিয়ে দেয়।

করিম বক্‌শ এক সময়ে ডাকে—কাসু কি ঘুমাইছে?

বার দুই ডেকে করিম বক্‌শ ক্ষান্ত হয়। শফির মা ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়গুন ডান হাত বাড়িয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। শফির মা ধড়ফড় করে ওঠে। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলে,—আল্লা-রছুল! কি কাসুর মা? সারাডা রাইত এম্বায় বইস্যা থাকবি? তুই আয়, আমার বালিশে মাথা রাইখ্যা এট্টু ক্যাইত অইয়া থাক। ও এহন চুপ মাইর‍্যা আছে।

করিম বক্‌শ আবার ডাকে—ও কি ঘুমাইছে?

—হ ভাই, এহন ঘুমেই আছে।

নিঝুম রাত। কোনো দিকে সাড়া-শব্দ নেই। অনেকক্ষণ পরে পরে পাখির কল্‌বল্ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। তারপর আবার নিস্তব্ধ। এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরে শোয়া করিম বক্‌শের নিশ্বাস পতন পর্যন্ত গণনা করা যায়। কানের কাছে কাসুর বুকে কফের ঘ্যাড়-ঘ্যাড় শব্দ এবং তার অনিয়মিত হ্রস্ব দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস জয়গুনের আশঙ্কাঘন মনে উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। ঘন কালো অন্ধকার যেন চারদিক থেকে গিলে ধরবার জন্যে হা করে আছে।

শেষ রাতে ভয়ঙ্কর শীত নেমে আসে। জয়গুন আর একবার কাঁথা বালিশ গরম করে কাসুর বিছানা বদলে দেয়। নিজের হাত-পা শরীর তুষের আগুনের তাপে গরম করে। তারপর কাসুর কাঁথার নিচে শুয়ে তাকে নিজের বুকের তাপ দিয়ে গরম করবার চেষ্টা করে।

সপ্তাহ খানেক পরে একদিন ডাক্তার বলেন,—আর চিন্তা করো না, মা। ভয় কেটে গেছে। তোমার ছেলে এবার ভালো হয়ে উঠবে!

জয়গুনের মুখের ওপর থেকে নৈরাশ্যের মেঘ কেটে যায়। আশার আলোয় মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। ডাক্তারের ওপর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে বুক। কিন্তু তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা তার জানা নেই। সে বলে,—বাবা, তুমিই আমার কাসুরে বাঁচাইলা। মরণঘর তন্ তুমিই ওরে ফিরাইয়া আনছ।

ডাক্তার আশ্চর্য হন। তাঁর সমস্ত জীবনে এমন সহজ সোজা কথা কোনো নিরক্ষরের মুখে তিনি কখনও শোনেন নি। ডাক্তার মানুষ বাঁচাতে পারে, এ-কথা বিশ্বাস করে না কেউ।

ডাক্তার বলেন—আমার চিকিৎসা ছাড়াও তোমার শুশ্রূষা অনেক সাহায্য করেছে। তুমি কাছে না থাকলে, সময় মতো ওষুধ-পথ্য না দিলে এ রোগী বাঁচান এত সহজ ছিল না।

কাসু ভালো হয়ে ওঠার সাথে সাথে জয়গুনের কর্তব্যও যেন ফুরিয়ে যায়। একদিন ভোর রাত্রে কাসুকে ঘুমে রেখে সে মায়মুনকে নিয়ে হাসুর সাথে বাড়ি চলে আসে।

জয়গুনের এমনি করে চলে আসার কারণও ঘটেছিল।

শফির মা সেদিন আসে নি। জ্বর হয়েছিল তার। রাত্রে মা-র কাছে থাকবার জন্যে হাসু এসেছিল।

গভীর রাত্রি। হাসু ও মায়মুন ঘুমে অচেতন। কাসুও কতক্ষণ ছটফট করে কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার শিয়রে আগুনের মাল্‌সার ওপর হাত রেখে জয়গুন ঝিমোচ্ছে।

করিম বক্‌শ অন্ধকারে বালিশ থেকে মাথা উঁচিয়ে ঘর ও বারান্দার মাঝের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকায়। কয়েকদিন ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে তার কেমন নেশা ধরে গেছে। কুপির অস্পষ্ট আলোকে জয়গুনের মুখখানা বড়ই সুন্দর লাগে তার চোখে। চোখ দুটো ঘুমে ঢুলুঢুলু, কখনও বুজে আসে। সারা মুখে বেদনার ছাপ যেন সুন্দরতর করেছে তার মুখখানা।

করিম বক্‌শ আস্তে আস্তে বারান্দায় নেমে আসে। আওয়াজ পেয়ে জয়গুন গা ঝাড়া দিয়ে বসে। তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় লম্বা করে টেনে দেয়।

করিম বক্‌শ এসে কাসুর মাথায় হাত দিয়ে শরীরের তাপ দেখে। জয়গুন বুঝতে পারে, কথা বলার ভূমিকা ছাড়া এ আর কিছু নয়। সে একটু দূরে সরে বসে হাসু ও মায়মুন যেখানে শুয়ে আছে।

করিম বক্‌শ বলে—আমারে দেইখ্যা তুমি ঘুমডা দ্যাও ক্যাঁ?

বার তিনেক হল এই একই অভিযোগ।

জয়গুন উত্তর দেয় না।

—আমারে আবার শরম কিয়ের? এত বচ্ছর আমার ঘর করলা, আর এহন আমারেই শরম! মাথার কাপড় উডাও, লক্ষ্মী। হোন আমার কথা।

জয়গুনের বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করতে শুরু করে।

করিম বক্‌শ বলে,—আমার কথা যদি রাখ, তয় একটা পরস্তাব করতে চাই।

জয়গুন নিরুত্তর।

—আইচ্ছা, আমি যদি আবার—

জয়গুন শক্ত একটা কিচু বলার জন্যে মনে মনে মুসাবিদা করে কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বের হয় না।

—তোমারে আবার আমি ঘরে আনতে চাই।

কম্পিত কণ্ঠে জয়গুন বলে—না।

—ক্যাঁ? আমি শরা-শরিয়ত মতোই করতাম।

—শরিয়ত মতো আগে একজনের লগে সাঙ্গা বইয়া হেইখান তন তালাক লইয়া তারপর? ওহোঁ।

—ওয়াতে দোষ কি? লক্ষ্মী, তুমি রাজী অও। তহন কি আম্মুকি করছি ঘরের লক্ষ্মী ছাইড়্যা দিয়া। শরিয়তে আইন আছে এই রহম নিকার।

—শরিয়তে থাকলেও আমি পারতাম না।

—ক্যাঁ? সতীনের ঘর বুইল্যা? যদি একবার মোখ ফুইট্যা কও 'সতীনের ঘর করতাম না' তয় ফুলির মা-রে রাইত পোয়াইলেই খেদাইয়া দিতে পারি। তুমি একবার একটু—

—ওহোঁ।

—ক্যাঁ? ঘরের লক্ষ্মী তুমি। করিম বক্‌শ জয়গুনের একটা হাত ধরে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। জয়গুন ঝাড়া দিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নেয়। পাশে হাসুকে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয়—হাসু হাসু ওঠ।

করিম বক্‌শ চোরের মতো সরে যায়।

বাকি রাতটা জয়গুন বসে কাটিয়ে দেয়। প্রথম মোরগের বাকের সময় সে হাসু ও মায়মুনকে ডেকে তোলে। কাসু ঘুমিয়ে আছে। তার রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে জয়গুন চোখের পানি রাখতে পারে না। কাসুর গালে একটা চুমো দিয়ে তার গালের সাথে নিজের গাল ঠেকিয়ে রাখে কিছুক্ষণ।

সে আঞ্জুমনকে ডেকে কাসুর কাছে রেখে যায়। আঞ্জুমন কিছু বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে,—আইজ যাইবা ক্যাঁ?

—যাইমু না কি করমু আর? এহন ও ভালো অইয়া উডব। তুমি এট্টু নজর রাইখ্য বইন। তোমার ত পোলা নাই। মনে কইর‍্য এইডা তোমার প্যাডের।

জয়গুন বাড়ি এসে প্রথমেই শফির মা-র বিছানার পাশে গিয়ে বসে।

শফির মা বলে—চইল্যা আলি ক্যাঁ? তোরে দ্যাখতে না পাইলে যদি ও চিল্লায়?

—চিল্লাইলে কী করতাম, বইন? যার পোলা হে-ই রাখব। আমার কী! সখেদে বলে জয়গুন।

—আমার ত মনে অয় না করিম বক্‌শ ওরে রাখতে পারব। ঘুমের তন উইঠ্যাই যখন তোরে দ্যাখ্‌ব না, তহন করিম বক্‌শের দিল-কইলজাডা খুইল্যা খাইয়া ফালাইব না!

—তার আমি কী করতাম! হেদিন কইছিলাম—ওরে আমার কাছে আইন্যা কিছু দিন রাহি। তারপর ভালা অইয়া গেলে যার পোলা হে-ই লইয়া যাইত। ব্যারাম তন ওঠলে এট্টু আবদার করব। হেইয়া সইজ্য অইলে তয় ত! কিন্তুক তুমি মত করলা না।

—কেমুন কইর‍্যা করি? আমাগ সূর্যু-দীগল বাড়ি। এই বাড়িতে মানুষ উজাইতে পারে না। আবার এক বচ্ছর ধইর‍্যা পাহারা নাই। এমন সোনার চান মানিক্‌রে এইখানে আন্‌লে যদি এট্টু উন্নিশ-বিশ অয়, তয় বদনাম অইব তোর।

—ক্যাঁ। আমরা তো কতদিন ধইরা আছি। আমাগ কী অইছে?

—আমাগ কতা আলাদা। আমাগ সইয়া আইছে। আর এতদিন বাড়ির পাহারা আছিল। পাহারা যেই দিন তন নাই, হেই দিন তন আমার জ্বর যেন ঘন ঘন ওঠতে আছে! আবার মায়মুনেরও পরের বাড়ির ভাত ওঠল। এইগুলা কি কম চোট্?

সূর্য-দীঘল বাড়ির অমঙ্গল আশঙ্কা করে জয়গুন সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। তবুও তার মন মানে না। তার অন্তর কেঁদে ওঠে। রোগশীর্ণ কাসুর কান্না শুনতে পায় সে তার অন্তরে। স্পষ্ট দেখতে পায়, ঘুম থেকে জেগে কাসু মা-মা বলে কাঁদছে।

অসুখ ভালো হয়ে আসার পর প্রথম চোখ মেলেই সে মা-কে চিনতে পেরেছিল। তারপর যতক্ষণ সে জেগে থাকত, কখনও জয়গুনের বুকে মাথা রেখে, কখনও হাত আঁকড়ে ধরে থাকত। তার বিছানা ছেড়ে জয়গুনের কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। সে কোথাও গেলে কাসু কান্না জুড়ে দিত। দুর্বল হাত-পা দিয়ে কাঁথা বালিশ ছুঁড়তে আরম্ভ করত। আজও জয়গুন তার মনের চোখে দেখতে পায়—কাসু পায়ের লাথি মেরে গায়ের কাঁথা ফেলে দিচ্ছে। করিম বক্‌শ বা আঞ্জুমন কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না।

আসলেও তাই ঘটেছিল। করিম বক্‌শ নানা রকম লোভ দেখিয়েও কাসুর কান্না থামাতে পারে নি।

রমেশ ডাক্তার জয়গুনকে আনবার জন্যে লোক পাঠাতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি করিম বক্‌শের কাছে জানতে পারে, জয়গুন আর আসবে না।

ডাক্তার তাঁর সুন্দর থার্মোমিটারটা কাসুর হাতে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা সে মাটির ওপর ছুঁড়ে ভেঙে দেয়।

ডাক্তার করিম বক্‌শকে ভর্ৎসনা করেন,—শিগ্‌গির ওকে ওর মা-র কাছে পাঠিয়ে দাও। এভাবে ওকে রাখতে পারবে না। এখনও শরীর দুর্বল। এক্ষুণি নিয়ে যাও। দেরি করো না। আমি ওখানে গিয়ে দেখে আসব। ঐ তালগেছো বাড়িটা তো? হ্যাঁ, চিনেছি। ওর মা-র কাছে ভালো থাকবে।

করিম বক্‌শ কাচুমাচু করে। ডাক্তারের আদেশ লঙ্ঘন করার সাহস তার হয় না।

সে যখন কাসুকে কোলে করে নিয়ে যায়, তখন রোদের তেজ বেড়েছে। মাঠের আধা-পাকা মশুর, কলাই ও সর্ষের গাছে শিশির তখনও ঝলমল করছে।

করিম বক্‌শ কাঁসুকে এনে জয়গুনের ঘরের দরজার ওপর ছেড়ে দেয়। হাসু ও মায়মুন এসে কাসুর হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। জয়গুন বসে আছে নিশ্চল। চোখের পানি শুকিয়ে তার দুই গালে দুটি রেখা স্পষ্ট হয়ে আছে। জয়গুন কাসুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় না, বলেও না কিছু মুখে। কাসু দু'হাত দিয়ে তাকে ধরতেই জয়গুন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। হাসু ও মায়মুন পাশে বসে কাসুর পিঠে ও মাথায় হাত বুলায়।

উঠানে করিম বক্‌শ দাঁড়িয়ে আছে। মায়মুনকে উঠানে একখানা পিঁড়ে দিয়ে আসতে বলে জয়গুন।

মায়মুন সসঙ্কোচে পিঁড়ে হাতে বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

করিম বক্‌শের মমতাহীন লাল চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। হাত বাড়িয়ে মায়মুনকে ধরতে যায়। কিন্তু তার হাত কাঁপছে কেন? মেহেরনকে হত্যা করার সময় যে হাত কাঁপেনি, মায়মুনসহ জয়গুনকে মেরে তাড়িয়ে দেয়ার সময় যে হাত তার বিচলিত হয় নি, আজ সেই হাত কাঁপছে কেন? সেই হাতের শক্তি কোথায়? নিজের মেয়েকে স্পর্শ করার শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মায়মুনকে স্পর্শ করার অধিকার যেন হারিয়েছে সে।

করিম বক্‌শের হাতটা আপনার থেকেই নেমে আসে। মাথা নিচু করে সে বাড়ির দিকে পথ নেয়।

শফির মা জ্বরের শরীর নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসে। বলে,–আহা, হুকাইয়া এক্কেরে কাষ্ট অইছে মানিক। খালি আড়গুলা আছে।

–আড় বাঁইচ্যা থাকলে মাংস একদিন অইবই। কাসুর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জয়গুন বলে।

–হ, আল্লায় বাঁচাইয়া রাখুক। আমার যত গাছ চুল আছে, তত বচ্ছর আয়ু যেন খোদায় ওরে দ্যায়।

করিম বক্‌শ এখন রোজ আসে কাসুকে দেখতে। কোনোদিন মাঠের মাঝ দিয়ে তাকে আসতে দেখে কাসু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঝোপের আড়ালে বসে থাকে যতক্ষণ না করিম বক্‌শ চলে যায়। তার ভয়–করিম বক্‌শ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আসে। তার এ বিশ্বাসে ইন্ধন যোগায় মায়মুন। রোজ ভোরে সে পথের দিকে চেয়ে থাকে। করিম বক্‌শকে দেখতে পেলেই সে হুঁশিয়ারি সঙ্কেত দেয়। করিম বক্‌শ ব্যর্থ হয়ে শফির মা-র ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলে। তার ছেঁচা পানে ভাগ বসায়।

–কী করলা, ভাজ? পরস্তাবডা করছিলা? করিম বক্‌শ জিজ্ঞেস করে।

–করছিলাম। কিন্তুক রাজি অয় না। বহুত দিন ধইর‍্যা আমিও চেষ্টা করতে আছি। ঢক-চেহারায় তো কম না। মাইনষে দ্যাখলে এহনও এক নজর চাইয়া দ্যাহে। ষাইডের বান্দে ছান্দেও ঠিক আছে। এহনও নিকা দিলে গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা-কাচ্চা অয়। আমি এত কইর‍্যা বুঝাই, আমার কথা কানেই নেয় না। গদু পরধান কত ঘুরাঘুরি করে! দুই কানি জমিন আর একখান ঘর লেইখ্যা দিতে চাইছিল।

–আমি ভালার লেইগ্যা কইছিলাম। আমার সংসারও চলত, আর আমার পোলা মাইয়াও সুখে থাকত। আমার তিন কানি জমিন ওর নামে দলিল রেজেষ্টি কইর‍্যা লেইখ্যা দিতাম। তুমি আর একবার কইয়া দেইখ্য না। যদি সতীনের ঘর করতে রাজী না অয়, তয় আঞ্জুমনরেও তালাক দিয়া দিতে পারি। এর বেশি আর কি চায়?

–কিন্তুক ও যে কিচ্ছুই চায় না। আমার মোখের উপ্‌রে কইয়া দিছে, –'যেই থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাট্‌তে পারতাম না।'

করিম বক্‌শ এবার ফতুয়ার পকেট থেকে একটা পান বের করে শফির মা-র হাতে দিয়ে বলে–খবরদার কেও যেন না জানে। তোমার ঘরে ডাক দিয়া এই পানডা খাওয়াইয়া দিও। নাগর বাইদ্যার আতে পায়ে ধইর‍্যা এইডা যোগাড় করছি। বান্দরের নউখের কলম আর মানিকজোড়ের রক্ত দিয়া এই পানের উপরে লেইখ্যা দিছে আর কইয়া দিছে, –'সাত রোজের মইদ্যে যদি ও তোমার লেইগ্যা পাগল না অয় তো আমার নামে কুত্তারে ভাত দিও।'

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

পিন্দনের– পরনের। **নাইকল–** নারিকেল। **চিক্কইর–** চিৎকার। **কোনসুম–** কোন সময়। **হাপন–** আপন। **সপর্দ–** সোপর্দ। **মিসকিন–** ফকির, ভিক্ষুক। **আঁডি–** আঠি। **অউয়ত-মউয়ত–** হায়াত-মউত। **বাইন্দা–** বেঁধে। **পরস্তাব–** প্রস্তাব।

সারসংক্ষেপ

মায়মুনকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গায়ের গয়না খুলে নিয়ে ছেঁড়া শাড়ি পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ির নাকি বউ পছন্দ হয়নি তাই এ-কাজ। বউ তাদের খুব ছোট– কাজকর্ম করতে পারে না, দাম্পত্য জীবনের যোগ্য নয় ইত্যাদি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। এদিকে জয়গুনের কাছে খবর আসে কাসুর অবস্থা খুব খারাপ। জয়গুন করিম বকশের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। তখনও কাসুর ফকিরের চিকিৎসা চলছে। করিম বকশ জোড়া খাসি মানত করেছে। কাসু যদি এ যাত্রায় বেঁচে যায় তবে তাকে আজমির শরিফে নিয়ে যাবে বলে করিম প্রতিজ্ঞা করে। জয়গুন হাসুকে পাঠায় ডাক্তার নিয়ে আসতে। গ্রামের বুড়ো ডাক্তার রমেশ চক্রবর্তী। ডাক্তারের যুক্তি তাদের ভালো লাগে না। দেশভাগ হওয়ায় ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে লোকজন। ডাক্তারের স্ত্রীরও খুব ইচ্ছা তারা ভারতে চলে যায়। কিন্তু ডাক্তার এ যুক্তি একদম পছন্দ করে না। ডাক্তার রোগী দেখে বলেন ডবল নিউমোনিয়া। রোগীর সব কথা শুনে ডাক্তার রেগে ওঠে।

জয়গুন নিরন্তর সেবা-শুশ্রুষা করে কাসুর। এই হিম শীতল রাতে কাসুকে গরম করে রাখতেই রাত কেটে যায় তার। সাতদিন পর ডাক্তার জানালেন বিপদ কেটে গেছে। জয়গুনের মুখের ওপর থেকে নৈরাশ্যের মেঘ কেটে যায়। সে কৃতজ্ঞতা জানায় ডাক্তারকে। নিরক্ষর হলেও জয়গুনের স্বাভাবিক বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হন ডাক্তার। করিম বকশ জয়গুনকে আবার ঘরে আনতে চায়। জয়গুন রাজী নয়। একদিন খুব সকালে কাসুকে ঘুমন্ত রেখে জয়গুন হাসু ও ময়মুনকে নিয়ে চলে আসে নিজের বাড়িতে। ডাক্তারের ভর্ৎসনায় কাসুকে রেখে আসে জয়গুনের কাছে। করিম বকশ জয়গুনকে পুনর্বিবাহের জন্য অনুরোধ করে শফির মাকে। কিন্তু জয়গুনের মনের দৃঢ়তার কথা জানায় করিম বকশকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. পৌষের হিম কাকে দমন করে?

ক. ভীম　　খ. বাঘ
গ. মাঘ　　ঘ. শীত

৩৮.রমেশ ডাক্তার পাকিস্তান ছাড়তে চায় না কেন?

ক. স্বদেশপ্রীতি　　খ. রোজগারের প্রাচুর্য
গ. পদের লোভ　　ঘ. প্র্যাকটিসে সুবিধা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম,
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর ঘাটুগান গাইতাম।

৩৯. উদ্দীপকের চেতনা 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. রমেশ ডাক্তার　　খ. মৌলবি সাহেব
গ. খুরশিদ মোল্লা　　গ. জগদীশ ডাক্তার

৪০. উদ্দীপক ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে প্রকাশিত চেতনা–

i. অসাম্প্রদায়িক চেতনা
ii. সাম্প্রদায়িক চেতনা
iii. জাত্যাভিমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. iii

পাঠ-১১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- উপন্যাসের সমাপ্তি কাহিনিটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- করিম বকশের পরিণতির কথা লিখতে পারবেন।
- ভূত-প্রেতের অন্তরালে মানুষের যে দুষ্কর্ম ঢাকা থাকে তার বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

[আঠারো]

–কারা ওইখানে? কেডা, কেডারে? শফির মা চেঁচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।–খবরদার, ফলগাছে কোপ দিলে আজগাই ঠাডা পড়ব মাতায়, কইয়া রাখলাম।

কে একজন বলে–আমরা কিনছি এই গাছ। জিগাও গিয়া হাসুর মা-রে।

শফির মা রাগে গরগর করতে করতে আসে–অ্যাই হাসুর মা, টিয়া-ঠুঁইট্যা আমগাছটাও বেচ্ছস?

–হ, গফুর শেখ নিছে ওডা, দশ ট্যাকায় লাকড়ির লেইগ্যা।

–ওহুঁ, যেই নেউক, ওই গাছ আমি কাটতে দিতাম না।

–ক্যাঁ? ওই গাছ তো আমার ভাগের।

–ওই গাছ তোর তা মুল্লুকের মাইনষে জানে। কী সোন্দর আম অইছে গাছটায়। জষ্টি মাসে পাকব। তুই এই গাছ বেচ্‌লি কোন আক্কেলে? বাচ্চা-কাচ্চারা কি মোখে দিব?

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা চেঁচিয়ে বলে শফির মা হাঁপিয়ে ওঠে।

–কি মোখে দিব আবার? আগে ভাত খাইয়া বাঁচলে তারপর তো আম-জাম।

শফির মা ভেঙচিয়ে ওঠে–তারপর ত আম-জাম! আমের দিনে বেবাকে আম খাইব, আর ওরা মাইনষের মোখের দিক্ চাইয়া থাকব। কর যা তোর মনে লয়। তুই গলায় দড়ি দিলেও আর আমি না করতাম না।

–দুইদিন বাদে গলায় দড়িই দিতে অইব। কি করতাম আর! তোমরাই হে-সুম ধইর‍্যা-বাইন্দা তোবা করাইলা। ঠ্যাং ভাইঙ্গা কতদিন ধইর‍্যা বইস্যা আছি। একটা না, দুইডা না, চাইরখান প্যাডের ভাত আহে কই তন?

শফির মা ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। বাড়ির দক্ষিণ পাশ থেকে গাছ কাটার শব্দ আসে। জয়গুনের বুকের ভেতরেও যেন কুঠারের আঘাত পড়ছে বারবার।

টিয়াঠুঁটে আম গাছটায় আম ধরেছিল এবার খুব। আমও জাতের আম। দুধে মেশালে দুধ নষ্ট হয় না, এত মিষ্টি। আমের তলার দিকটা টিয়ার ঠোঁটের মতো বাঁকা। আর পাকলে ঐ ঠোঁটটাই শুধু লাল হয়।

হাসু ও মায়মুন গাছে বোল দেখে কত খুশি হয়েছিল! আর একটা মাস রয়ে সয়ে বেচলে ওরা খেতে পারত। কিন্তু এদিকে পেট তো আর ক্ষুধার জ্বালায় 'র' মানবে না।

করিম বক্‌শ দুধের হাঁড়ি মাথায় উঠানে এসে ডাকে,–কাসু!

কাসু ততক্ষণে পিছ-দুয়ার দিয়ে পালিয়েছে।

আরো দু-তিন ডাক দিয়েও যখন কাসুর সাড়া পাওয়া যায় না, তখন সে মায়মুনকে ডাকে,–একটা ঘড়ি লইয়া আয় মায়মুন।

জয়গুনের একবার বলতে ইচ্ছে হয়,–আমরা দুধ খাই না। লইয়া যান দুধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় না।

মায়মুন ঘটি নিয়ে আসে।

করিম বক্‌শ এক সের দুধ ঘটিতে ঢেলে দিয়ে বলে,—রোজ এমুন সুম আমি দুধ দিয়া যাইমু। আমাগ ধলা গাইডা বিয়াইছে। কাসুর ভাগ্যে একটা দামড়ি বাছুর অইছে। বাছুরডা ঘাস ধরলে কাসুরে দিয়া যাইমু। কাসু কই গেছে রে?

মায়মুন উত্তর দেয়,—পলাইছে।

করিম বক্‌শ আর দাঁড়ায় না। যেতে যেতে একবার পেছনে তাকায়। জয়গুনের চোখে চোখ পড়তে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

জয়গুন ধমক দেয় মায়মুনকে,—দুধ রাখলি, খাইব কে?

—ক্যাঁ? আমরা।

—হ, তোরা-ই খা। আমি ছুঁইতাম না ওই দুধ।

সকলকে চমকে দিয়ে টিয়া-ঠুঁটে আম গাছটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। দু'একটা পাখির আর্ত চিৎকার ভেসে আসে পাশের ঝোপ থেকে।

নাবিক সিন্দাবাদের ঘাড়ের ওপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাঙলা তেরোশ' পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত-পা শেকলে বাঁধা পরাধীন সে বুভুক্ষু তেরো'শ পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তার পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামেনি। ঘাড় বদল করেই চলেছে একভাবে। হাত-পায়ের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন তেরোশ' পঞ্চান্নে এসেও সে আকাল-দৈত্য তার নির্মম খেলা খেলছে। তাকে আর ঘাড় থেকে নামান যায় না।

দেশে চালের দর কুড়ি টাকার নিচে নামে না বছরের কোনো সময়েই। ফাল্‌গুন মাস থেকে সে দর আরো চড়ে যায়। চড়ে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। চল্লিশ টাকায় গিয়ে ঠেকে। আউশ ধান ওঠার আগে এই দর আর নামে না। ফলে যারা টেনেটুনে দু'বেলা খেত, তারা এক বেলার চালে দু'বেলা চালায়। ফেনটাও বাদ দেয় না, ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দুধ-ভাতের মতো করে খায়। যারা দু'বেলা আধ-পেটা খেয়ে থাকত, এ সময়ে তারা শাক-পাতার সাথে অল্প চাল দিয়ে ঝাউ রেঁধে খায়। ক্ষুধিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। পেটের জ্বালায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অনেকে। আশা—দশ দুয়ারে মেগে এক দুয়ারে বসে খাবে। কিন্তু দশের দশা শোচনীয়। সমস্ত দেশ দিশেহারা। দুর্ভিক্ষে কে দেয় ভিক্ষে?

এ পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ শুধু কি ভাতের? কাপড়েরও। শত কপাল কুট্‌লেও সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্বিগুণ দিয়েও একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। অনেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেয় একই কাপড়ে। তালি খেয়ে খেয়ে ময়লা জমে জমে ভারি হয়ে ওঠে সে কাপড়। বৃষ্টি ও ঘামে ভিজে বিদঘুটে বোটকা গন্ধ ছড়ায়।

জয়গুন অনেক ভেবেছে ভাত কাপড়ের ভাবনা। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে বসে এ ভাবনার অর্থ নেই, সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। মায়মুনের বিয়ের সময়, ছ'মাস আগে তওবা করে সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আজ পর্যন্ত সেই তওবার অমর্যাদা সে করেনি।

—কিন্তু এমনি করেই কি আর দিন চলবে? এমনি করেই কি পেটের জ্বালা জুড়োবে? কাপড় জুটবে পরনের? জয়গুন প্রশ্ন করে নিজেকে।

পেটের জ্বালা এদিকে বেড়েই চলছে দিন দিন। দুই দিন এক রকম কিছুই খাওয়া হয়নি।

কাল রাত্রে খাওয়ার সময় কাসু জিজ্ঞেস করেছিল,—তুমি খাইবা না, মা?

—আমি রোজা আছি। তোরা খাইয়া ওঠ্। তোর ব্যারামের সময় মান্‌তি করছিলাম তিনডা রোজা রাখতাম বুইল্যা।

—রাইতেও খাইবা না তুমি? মায়মুন বলে।

—এই রোজায় দিন-রাইত না খাইয়া থাকতে অয়।

কাসু বিশ্বাস করলেও হাসু ও মায়মুন বিশ্বাস করেনি সে কথা। নিজের পাতের কয়েক মুঠো ভাত হাঁড়িতে তুলে রেখে হাসু উঠে গিয়ে বলেছিল,—আইজ ভুখ্ নাই মা।

হাসুর দেখাদেখি মায়মুনও থালার ভাত রেখে বলে,—আমারও ভুখ্ নাই। দু'দিনের মধ্যে সে ভাত ক'টাই পেটে দিয়ে আছে জয়গুন।

বাড়ির আমগাছ, তেঁতুলগাছ, ঝাড়ের বাঁশ কেটে ছাপ্পোনছাড়া' করে দেয়া হয়েছে। চারটে 'আণ্ডালু' হাঁস বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রি করবার মতো আর কিছুই নেই।

বিকেল হলেই কাসু খেলা ছেড়ে মা-র আঁচল ধরে তার পিছু পিছু ঘুরতে থাকে, তাগিদ দেয়—ভাত রানবা না, মা? আমার ভুখ্ লাগছে। এই দ্যাহ না প্যাটটা কেমুন ছোড অইয়া গেছে।

কাসু হাত দিয়ে পেটটা দেখায়। জয়গুন দেখে, সত্যি পেটটা নেমেই গেছে। সে ফাঁকি দিয়ে বলে—তোর মিয়াভাই মাছ আনলে তাপর পাক করমু। নিত্যি নিত্যি শাক পাতা ভাল্লাগে না।

—কী মাছ, মা? ইলশা মাছ?

—হ, ইল্শা মাছ।

কাসু খুশি হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। হাসু এখনও এলো না। জয়গুন কাসুকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে মায়মুনকে বলে,—মায়মুন, ওরে লইয়া যা। ঝিঁঝিঁ ধইর‍্যা দে গিয়া। ঐ দ্যাখ, হোন কেমুন ডাকে।

দুটো নারকেলের আঁইচা যোগাড় করে কাসুকে নিয়ে মায়মুন শফিদের ঘরের ছাঁচতলায় যায়। দু'হাতে আঁইচা দুটো নিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে—ঠরর্ ঠরর্।

এ রকম শব্দে ঝিঁঝি পোকা আকৃষ্ট হয়! জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শব্দকে কেন্দ্র করে উড়তে থাকে। যখন হাতের কাছের কোনো কিছুর ওপরে বসে, তখন ধরতে বেগ পেতে হয় না।

নিজের অসামর্থ্যের জন্য অবুঝ ছেলের কাছেও লজ্জিত হয় জয়গুন। পেটের ছেলে, তবুও নিজেদের দৈন্য ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে সে সব সময়। হাসু ও মায়মুনকে কম করে খেতে দিলেও কাসুকে খেতে দিতে হয় পুরো। যেন সে অভাবের কথা জানতে না পারে।

কাসু হাঁড়ির খবর জানে না। জান্বার বয়সও তার নয়। তা ছাড়া জানবার মতো কোনো কারণও জয়গুন ঘটতে দেয়নি আজ পর্যন্ত।

জয়গুন শুনতে পায় নারকেলের আঁইচা বাজিয়ে মায়মুন ও কাসু ঝিঁঝি ধরার ছড়া গাইতে শুরু করেছে :

ঝিঁঝি লো, মাছি লো,
বাঁশতলা তোর বাড়ি,
সোনার টুপি মাথায় দিয়া
রূপার ঝুমুর পায়ে দিয়া
আয়-লো তাড়াতাড়ি।
ঝিঁঝি ঝিঁঝি করে মায়,
ঝিঁঝি গেছে সায়বের নায়,
সাতটা কাউয়ায় দাঁড় বায়,
ঝিঁঝিলো তুই বাড়িত্ আয়।
ঝিঁঝির বাপ মরছে
কুলা দিয়া ঢাক্ছে,
ঝিঁঝির মা কানছে,
আয়-লো ঝিঁঝি বাড়িত্ আয়।

কিন্তু এ রকম ফাঁকি দিয়ে আর কত দিন? কাল রাত পোহালেই যখন এক মুঠো ভাত দিতে পারবে না ছেলের মুখে, তখন কি এ অভাবের কথা গোপন থাকবে ছেলের কাছে? ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যখন সে 'ভাত ভাত' করে চিৎকার করবে, তখন মা হয়ে কি জবাব দেবে সে? জবাব না পেয়ে সে কি তখন বুঝবে না যে, তার মা অপদার্থ, খেতে দিতে পারে না। জয়গুন ভাবে এসব কথা। এ ভেবে আরো ব্যথিত হয় যে পেট ভরে খেতে দিতে না পারলে কাসুর কাছে তার বুকভরা স্নেহের কোনো দামই আর থাকবে না। ছেলের আস্থা থাকবে না মা-র ওপর। মা-র স্নেহের ছায়ায় আসার জন্য একদিন সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এবার ক্ষুধার তাড়নায় করিম বক্শের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠবে আবার।

সন্ধ্যার পর তিনপো চাল গামছায় বেঁধে হাসু বাড়ি আসে।

জয়গুন চোখ টিপে হাসুকে জিজ্ঞেস করে,—মাছ কই হাসু? তোরে না কইছিলাম, ইলশা মাছ আন্‌তে?

হাসু কথার ধরন বুঝতে পেরে বলে,—ইলশা কাতলা কোনো মাছই পাইলাম না বাজারে। মাছ মোডে নাই।

দু'দিনের না-খাওয়া জয়গুনের বুকের ভেতর ধড়ফড় করে। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, যেন নাড়ি-ভুঁড়িগুলোও হজম হয়ে যাচ্ছে। চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। গামছায় বাঁধা চাল দেখে তার ক্ষুধা আরো বেড়ে যায়।

জয়গুন সমস্তটা চাল নিয়ে হাঁড়ি বসায় আজ। ভোরের জন্যে রেখে দেয় না কিছুই। এই বেলা খেয়ে কিছু যদি বাঁচে তবে ছেলে-মেয়েরা পান্তা ভাত খেতে পাবে ভোরে। কিন্তু সে আশা কম। তার মনে হয়, একাই সে তিনপো চালের ভাত খেতে পারবে এখন।

কচুর লতির চচ্চড়ি ও ডাঁটা শাক দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খায় সকলে। অনাহারে শুকনো বুকে ভাত ঠেকে জয়গুনের। বারবার পানি খেয়ে সে বুক ভিজিয়ে নেয়।

জয়গুন বলে হাসুকে,—কী চাউল রে! ফেনডা যে ঘাডের পানি মতন। আবার চুকা। দেইখ্যা আনতে পারস না?

—চাউল পাওয়া যায় না বাজারে, তার আবার দেইখ্যা আন্‌মু। কত কষ্টে এই চাউল যোগাড় করলাম। বারো ছটাক বারো আনা। কাইল বাজারে ঢোল দিছিল ম্যাজিস্টর সাব—নয় আনার বেশি এক সেরের দাম নিলে জরিমানা অইব। এই-এর লেইগ্যা বাজারে চাউল নাই। মহাজনরা গোলায় গুঁজাইয়া থুইছে চাউল।

খাওয়া শেষে হাঁড়িতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে সকাল সকাল। দু'দিনের অনাহারের পর ভাত খেয়ে জয়গুন আরো শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আজ তার শরীর ঝিমঝিম করে। চোখ দিয়ে পানি ঝরে শুধু শুধু।

জয়গুন বসে বসেই এশার নামাজ শেষ করে। প্রতিদিনের মতো তসবিহ নিয়ে জপতে আরম্ভ করে। কিন্তু সকল কাজের মধ্যে ঐ এক চিন্তা—কাল রাত পোহালে ছেলে-মেয়েরা মুখে কী দেবে? হাসু কী খেয়ে কাজে যাবে? কাসুর কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার কিছু নেই।

জয়গুনের উত্তরে চাল কিনতে যাওয়ার সাথী লালুর মা দু'দিন এসেছিল। অনেক সাধাসাধি করেছিল ফতুল্লার ধান কলে কাজ করার জন্যে। কিন্তু জয়গুন তওবার কথা ভোলে নি। হাতে পায়ে যে শিকল সে পরেছিল সেদিন, তা খুলবার সাহস তার নেই। শক্তি পায় না। নিতান্ত অসহায়ভাবে সে লালুর মা-র প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ লালুর মা-র বলা কয়েকটি কথা বারবার তার মনে আসে। সে বলছিল,—না খাইয়া জানেরে কষ্টে দিলে খোদা ব্যাজার অয়। মরলে পরে খোদা জিগাইব, তোর আত-পাও দিছিলাম কিয়ের লেইগ্যা? আত দিছিলাম খাট্‌বার লেইগ্যা, পাও দিছিলাম বিদ্যাশে গিয়া ট্যাকা রুজি করনের লেইগ্যা।

লালুর মা কথায় কথায় গ্রাম্য গীতের কয়েকটা লাইনও গেয়ে উঠেছিল সেদিন :

আত আছিল, পাও আছিল,
আছিল গায়ের জোর,
আবাগী মরল ওরে
বন্দ কইর‍্যা দোর।

কথাগুলো আজ তার নতুন অর্থ, নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে জয়গুনের চিন্তাকে নাড়া দেয়। লালুর মা-র প্রস্তাবকে সে বারবার বিবেচনা করে দেখে। ধান কলের কাজ এমন কিছু নয়। ধান ঘাঁটা, ধান রোদে দেয়া, চাল ঝাড়া—এই সব কাজ। রোজ পাঁচসিকা করে পাওয়া যায়। তা ছাড়া খুদ-কুঁড়াও পাওয়া যায় চেয়ে-চিন্তে।

মনের দুই বিরোধী চিন্তার সংঘর্ষের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

মশার কামড় খেয়ে মায়মুন হাত-পা নাড়ছে। জয়গুন তাকায় ঐ দিকে। হাসু বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। সারাদিন খেটে তার আর হুঁশ নেই। মশার কামড়েও তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। কাসু তার মিয়াভাইর গলা ধরে তার গায়ের ওপর একখানা পা চড়িয়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কুপির অস্পষ্ট আলোকে ছেলেমেয়েদের দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তাদের কচি মুখ জয়গুনকে তার পথের সন্ধান বাতলে দেয়, তওবার কথা সে ভুলে যায়। লালুর মা-র প্রস্তাব মাথায় নিয়ে কাল যাবে সে ধান

কলে কাজ করতে। হাতে পায়ে তাকত থাকতে কেন সে না খেয়ে মরবে? ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোনো অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।

জয়গুন সুঁই-সুতো নিয়ে কাপড় সেলাই করতে বসে। কাপড়টা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। এ কাপড় নিয়ে বেরোবার উপায় নেই। হাসুর গামছা বুকে জড়িয়ে গায়ের আঁচলটা আগে সেলাই করে। সেটা শেষ হলে বাকি আঁচলটা সেলাই করে তারপর।

ভোর হয়। ঘুম থেকে জয়গুন ওঠে নতুন প্রাণ, নতুন উদ্যম নিয়ে।

শফির মা-র কাছ থেকে চাল ধার করে রান্না হয়। ছেলেমেয়েকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে জয়গুন বেরিয়ে পড়ে।

ধানখেতের আল ধরে পথ চলে জয়গুন। হাঁটু-সমান উঁচু ধান গাছে ভরা মাঠ। যেন সবুজ দরিয়া। ঝিরঝিরে বাতাস ঢেউ-এর নাচন তোলে। ছড়িয়ে দেয় মাঠের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। দূর-প্রসারী মাঠের দিকে তাকিয়ে জয়গুনের চোখ জুড়ায়।

খেতের কাজে ব্যস্ত চাষীরা তাকায় জয়গুনের দিকে। কিন্তু তার ভ্রুক্ষেপ নেই। গদু প্রধান তার খেত তদারক করছিল। সকলের অলক্ষ্যে সে মাথা নাড়ে আর বলে,—তোরে শাসন করতে পারতাম না! আমার নাম গদু পরধান। এট্টু সবুর কর।

[উনিশ]

সূর্য-দীঘল বাড়ির ভূত ক্ষেপেছে।

রাতে জয়গুনের ঘরের বেড়া ও চালের ওপর ঢিল পড়তে শুরু করে। হাসু, কাসু ও মায়মুন চিৎকার করে ওঠে, শেষে গলা দিয়ে চিৎকারও বের হয় না। ভয়ে তারা মা-কে জড়িয়ে ধরে।

ওদিকে শফির মা-র চিৎকার কোনো যায়।

পরের দিন ভোরে সে বলে—হেসুম কইছিলাম পাহারা বদলাইতে। অখন দ্যা-খ্ কী দশা অয়! গাছগুলা কাটতে মানা করছিলাম। কোনো গাছে কী আছিল, কে জানে? ওগ বাসা ভাইঙ্গা দেওনে রাগ অইছে।

পরের রাত্রেও এমনি ঢিল পড়ে। গ্রামে এই নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেছে। সূর্য-দীঘল বাড়ির কাছ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

গ্রামের বুড়ো সোনাই কাজি বলে—সূর্যু-দীগল বাড়ির ভূত ক্ষেপছে, আর উফায় নাই। সূর্যু-দীঘল বাড়িতে মানুষ উজাইতে পারে না, বুড়া-বুড়ির কাছে হুনছি। সূর্যু-দীগল হাটেরও উন্নতি অয় না। আমার চউখেই দ্যাখলাম, জলধর কুণ্ডু, কুণ্ডেরচরে হাট মিলানোর লেইগ্যা কত ট্যাকা খরচ করল। কত হরিলুট দিল। ব্যাপারিগ মিডাই খাওয়াইল, নট্ট কোম্পানির যাত্রা গানেও দুই এক আজার টাকা খরচ করছিল। কিন্তু কই? হাট আর মিলাইতে পারল না।

থুথুরে বুড়ি হনুফা বিবি বলে,—আমার মামু একবার সূর্যুদীগল মৌপোকের বাসা ভাঙছিল। আমার মনে আছে। গাছের তন নামতে না নামতে আঁড়ির তলা ভাইঙ্গা মধু পইড়্যা গেল। কী তেজ! বাপ্পুসরে!

জয়গুন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রাত্রে শফির মা-র ঘরে আশ্রয় নেয়। ছেলে-মেয়েদের বুকে নিয়ে সারারাত 'আল্লা আল্লা' করে।

অমাবস্যার রাত। করিম বক্শ গালে হাত দিয়ে কুপির সামনে বসে ভাবছে। তার মনের চোখে ভাসে—জয়গুনের ঘরে ঢিল পড়ছে দাড়ুম-দুড়ুম। তার বুকে কাসু ও মায়মুন ভয়ে মিইয়ে গেছে। হাসু পাশে বসে বসে কাঁপছে চোখ বন্ধ করে। জয়গুন আর একা এদের সামলাতে পারছে না। করিম বক্শের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। তার চোখের অব্যক্ত ভাষায় সে যেন সাহায্য চাইছে তার কাছে।

করিম বক্শ গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তাকের ওপর থেকে চারটে গজাল নিয়ে গামছায় বাঁধে। জোবেদ আলী ফকিরের নির্দেশমতো আজ এই অমাবস্যার দুপুর রাতে সূর্য-দীঘল বাড়ির চার কোণে মন্ত্রসিদ্ধ গজাল ক'টা পুঁতে আস্তে হবে তাকে।

সূর্য-দীঘল বাড়ি ঠিক-ঠাক করে জোবেদ আলী ফকির সেই যে একটি পেতলের কলসি দাবী করেছিল, আজ পর্যন্ত তাকে দেয়া হয় নি সে কলসি। বছর বছর পাহারা বদলাবার কথাও সে বলেছিল। তাতেও কান দেয়নি জয়গুন ও শফির মা। এ জন্যে, গোস্বা হয়ে সে করিম বক্শকে জানিয়েছিল,—এইবার দেখুক মজাখান। সাত দিনের মধ্যে বেবাক মিস্মার অইয়া যাইব। করিম বক্শ একটা পেতলের কলসি কিনে দিয়ে এবং অনেক হাতে-পায়ে ধরে জোবেদ আলী ফকিরের রাগ মাটি করেছে।

ফকির গজাল কয়টায় ফুঁ-ফাঁ দিয়ে তুকতাক করে করিম বক্শের হাতে দিয়ে বলে—পরশু অমাবইস্যা। রাইত দুফরের পর—। চাইর কোণে চাইড্ডা—

—আমার ডর করে যে! একলা যাইতে সাবাসে কুলায় না। করিম বক্শ বলে।

—ডর করে! কও কি!

একটু চিন্তা করে ফকির বলে,—আইচ্ছা, হেই দাওয়াইও আছে। করিম বক্শের কাঁধে দুই হাত রেখে ফকির টানা সুরে মন্ত্র পড়ে,—

খাটো কাপড় উলট বেশে
বাণ মারলাম হেসে হেসে।
সেই বাণে মেদিনী কাঁপে,
জল কাঁপে, থল কাঁপে,
চান কাঁপে, তারা কাঁপে,
পাতালের বাসুকী কাঁপে,
আগে ভাগে ভূত-পেরেতে,
জিন ভাগে শেষে।
কালা বাণে ভূত মারলাম,
পেত্নি বানলাম কেশে।

মন্ত্র পড়ে করিম বক্শের বুকে ও চোখে সাতবার ফুঁ দিয়ে ফকির এবার বলে,—ডরের মাজা ভাইঙ্গা দিছি। যাও এইবার, আর ডর নাই। পরশু রাইত দুফরের পর, মনে থাকে যেন। চাইর কোণায় চাইড্ডা—

চারটি গজাল—বাড়ির চার পাহারাদার। ঠিকে-ঠাকে বসিয়ে আস্তে পারলে ভূত-পেত্নীর দৌরাত্ম্য আর থাকবে না।

কুপি নিবিয়ে করিম বক্শ লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরোয়। সে পা ফেলে জোরে, আরো জোরে। কালো রাত্রির জমাট অন্ধকার যেন ভয় পেয়ে তার চলার পথ ছেড়ে দেয়।

ঈশান ও বায়ু কোণে দুটি গজাল পুঁতে সে পশ্চিম দিকে চলে আসে। ঘন অন্ধকার। তার মাঝেও দৃষ্টি চলে করিম বক্শের। —তিনটা ছায়ামূর্তি! ভয়ে তার গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। সূর্য-দীঘল বাড়ির তাল গাছের তলায় সে থমকে দাড়ায়। কাঁপতে কাঁপতে বসে পরে মাটিতে।

ছায়ামূর্তিগুলো ঢিল ছুঁড়ছে আর তারই দিকে সরে সরে আসছে। করিম বক্শ একটা শব্দহীন চিৎকার করে ওঠে। বার কয়েক ঢিপঢিপ করে হৃদ্যন্ত্রটা যেন বন্ধ হয়ে যায়। একটা মূর্তি আরো কাছে সরে আসে তার। করিম বক্শের গায়ে ধাক্কা লাগে। এবার করিম বক্শ চিনতে ভুল করে না। হৃদ্যন্ত্রটা আবার বার দুই ঢিপঢিপ করে চালু হয়ে যায়। হঠাৎ ঘাম দিয়ে তার ভয়ও কেটে যায়। সে দাঁড়ায়। পাশ থেকে খপ করে ছায়ামূর্তির একটা হাত চেপে ধরে,—গদু পরধান! তোমার এই কাম!!...!!

সূর্য-দীঘল বাড়ির তালগাছের তলায় করিম বক্শের মৃতদেহ টান হয়ে পড়ে আছে। আশ-পাশ গ্রামের লোক ছুটে আসে দেখ্তে। মৃতের শরীরে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। সকলেই একমত— সূর্য-দীঘল বাড়ির ভূত তার গলাটিপে মেরেছে।

যে হিম্মত বুকে বেধে জয়গুন এত দিন সূর্য-দীঘল বাড়িতে ছিল, তা আজ খান্ খান্ হয়ে যায় এ ঘটনার পরে।

আজ বারবার করিম বক্‌শের কথাই মনে পরে জয়গুনের। বেদনায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দরদর ধারায় পানি ঝরে গাল বেয়ে। আহা বেচারা! জীবনে কাউকে ভালোবাসেনি। কারো ভালোবাসা পায়ও নি সে।

শফির মা আগে আগে গাঁটরি-বোচকা বাঁধে। জয়গুন জিজ্ঞেস করে,—বাড়ি ছাইড়্যা কই যাইবা?

—আগেত সোনার মানিকগো লইয়া বাইর অ। খোদার এত বড় দুইন্যায় কি আর এট্টু জা'গা পাইতাম না আমরা?

ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে জয়গুন ও শফির মা বেরিয়ে পড়ে। মনে তাদের ভরসা—খোদার বিশাল দুনিয়ায় মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই তারা পাবেই।

চলতে চলতে আবার জয়গুন পেছন ফিরে তাকায়। সূর্য-দীঘল বাড়ি! মানুষ বাস করতে পারে না এ বাড়িতে। দু'খানা ঝুপড়ি। রোদ বৃষ্টি ও অন্ধকারে মাথা গুঁজবার নীড়। দিনের শেষে, কাজের শেষে মানুষ পশু-পক্ষী এই নীড়ে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ঐ উঁচু তালগাছ অনেক কালের অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী এটা।

তারা এগিয়ে চলে।

বহুদূর হেঁটে শ্রান্ত পা-গুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে তারা গাছতলায় বসে। উঁচু তালগাছটা এত দূর থেকেও যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আবার তারা এগিয়ে চলে.....

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আঁইচা– আচ্ছা। **মাতায়–** মাথায়। **মৌপোকের–** মৌমাছির। **হিম্মত–** সাহস। **উফায়–** উপায়। **চাইড্ডা–** চারটা।

সারসংক্ষেপ

আমের গাছে মুকুল এসেছিল। সে গাছটি জয়গুন বিক্রি করে দেয়। জয়গুন আর বাইরে যায় না। তার আয় বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়িতে প্রতিদিন ভাতের অভাব। খেয়ে– না খেয়ে তার সংসার চলে। এখন কাসু আছে সংসারে। ছোট বাচ্চার কাছে লজ্জা পায় জয়গুন– ভাতের অভাবের জন্য। নানাভাবে কাসুকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হয়। কিন্তু ক্ষুধা কতক্ষণ চেপে রাখতে পারে। তেরশ পঞ্চাশ চলে গেছে। কিন্তু স্থায়ী ভাবে থেকে গেছে দুর্ভিক্ষ– ভাতের অভাব। জয়গুন তওবা করেছিল। কিন্তু সে আর কতদিন রক্ষা করতে পারবে এ প্রতিজ্ঞা? অবস্থা এখন এরকম– রাত পোহালে এক মুঠো ভাতও আর দিতে পারবে না সন্তানদের মুখে। সে বুঝতে পারে জীবন রক্ষাই প্রকৃত ধর্ম। কচি বাচ্চাদের শুকনো মুখ হাস্যোজ্জ্বল করতে তাকে আবার নামতে হবে পথে-ঘাটে। সকালে শফির মার কাছ থেকে চাল ধার করে রান্না করে জয়গুন। বাচ্চাদের খাইয়ে– নিজে খেয়ে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে জয়গুন।

সূর্য-দীঘল বাড়িতে ভূত-প্রেতের অত্যাচার শুরু হয়েছে। রাতে ঢিল পড়ে জয়গুনের বাড়িতে। হাসু-কাসু-মায়মুনকে বুকে চেপে তারা রাত কাটায়। করিম বকশ ফকিরের কাছে থেকে তাবিজ আনে। অমাবস্যার রাতে সূর্য-দীঘল বাড়ির চার কোণায় চারটি তাবিজ পুঁতে দিতে হবে। অন্ধকারে করিম বকশ যখন সূর্য-দীঘল বাড়িতে তাবিজ পোঁতার জন্য অপেক্ষা করছে তখন তিনটে ছায়ামূর্তি দেখা যায়। একজনকে সে চিনেই ফেলে। সে গদু প্রধান। পরের দিন সকালে করিম বকশের লাশ পাওয়া যায় সূর্য-দীঘল বাড়িতে। যে হিম্মতে বুক বেঁধে জয়গুন ছিল এ বাড়িতে তা আজ ভেঙে খান খান হয়ে যায়। করিম বকশের কথা ভেবে তার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বেচারা– কারো ভালোবাসা কোনোদিন পায়নি, কাউকে ভালোবাসতেও পারেনি। ছেলেমেয়েদের হাতধরে জয়গুন আর শফির মা বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। খোদার বিশাল দুনিয়ায় একটু ঠাঁই তাদের হবেই– এ প্রত্যাশায় তারা বুক বাঁধে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪১. ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র কোনটি?

ক. জীবন রক্ষা
খ. সংগ্রাম করা
গ. তওবা করা
ঘ. চিন্তার সংঘর্ষ

৪২. গদু প্রধান 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে ভূতরূপে আবির্ভূত হয়েছে কেন?

ক. জয়গুনকে শায়েস্তা করতে
খ. হাসুকে বাগে আনতে
গ. আঞ্জুমানকে শায়েস্তা করতে
ঘ. করিম বক্‌শকে শিক্ষা দিতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

চঞ্চল, চপলা নারী টুকুনজিল। ধর্মযাজক আব্রাহাম তাকে ঘরের বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করতে নিষেধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা টুকুনজিল সে কথা খুব একটা গায়ে মাখে না।

৪৩. উদ্দীপকের ধর্মযাজক 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. মৌলবি সাহেব
খ. গদু প্রধান
গ. জব্বর মুন্সী
ঘ. জহিরুদ্দিন

৪৪. উদ্দীপক ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে–

i. প্রগতির সংকট
ii. মানবতাবোধ
iii. ধর্মীয় কুসংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও iii
গ. iii
ঘ. iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৪৫. 'হাসুলি বাঁকের উপকথা' একটি–

ক. সামাজিক উপন্যাস
খ. পৌরাণিক উপন্যাস
গ. আঞ্চলিক উপন্যাস
ঘ. রাজনৈতিক উপন্যাস

৪৬. উপন্যাসে আঙ্গিক বৈচিত্র্যের উদ্ভব যে কারণে–

ক. জীবনকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখায়
খ. মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে
গ. রাজা-বাদশা আর ক্ষমতাবানদের কথা
ঘ. ভূত-প্রেত আর জ্বীন-পরির কাহিনি

৪৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস–

ক. আলালের ঘরের দুলাল
খ. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ
গ. দুর্গেশনন্দিনী
ঘ. পথের দাবী

৪৮. মায়মুন কোথায় মাছ ধরে?

ক. তেঁতুলতলা
ক. আউশতলা
গ. কুমড়োতলা
ঘ. পানতলা

৪৯. করিম বক্‌শ কী নিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়ায়?

ক. কোঁচ
খ. কদমা
গ. চরকি
ঘ. হুঁকো

৫০. করিম বক্‌শের শত্রু কম ছিল না কেন?

ক. অসামাজিক লোক
খ. মেজাজের কারণে
গ. সন্ত্রাসী প্রকৃতির
ঘ. চালবাজ লোক

৫১. হাসু মা-কে কোন পাড়ায় নামিয়ে দেয়?

ক. মোড়ল | খ. হিন্দু
গ. মুসলমান | ঘ. জাহাজ

৫২.'স্বাধীনতার বার্তা' জয়গুনদের যে স্বপ্ন দেখিয়েছে–

i. ভাত-কাপড় সস্তা হবে
ii. মানুষের দুঃখ থাকবে না
iii. কেউ না খেয়ে মরবে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. ii
গ. iii | ঘ. i, ii ও iii

৫৩. 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়?' –কথাটি মায়মুনকে বলা হয়েছে কেন?

ক. ঘুমের সময় হাঁসের বাচ্চা কোলে রাখায় | খ. হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছেড়ে দেয়ায়
গ. হাঁসের বাচ্চাকে খাঁচায় রেখে আসায় | ঘ. হাঁসের বাচ্চাকে শামুক খাওয়ানোয়

৫৪. "মাছ করে ঝক ঝক ছোট্ট এক ঝিলে
একটা মাছে টিপ দিলে বেবাকগুলা মিলে।" –পংক্তিদ্বয়ের নাম কী?

ক. শোলক | খ. কুট্টি
গ. টিক্কা | ঘ. ফুক্কা

৫৫. রমজানের পরামর্শে হাসু কার কাজে যেতে চায়?

ক. গদু প্রধান | খ. হোসেন দালাল
গ. জব্বর মুনসী | ঘ. খুরশীদ মোল্লা

৫৬. শফি মা-কে ভিক্ষা করতে নিষেধ করেছে কেন?

ক. লোকে মন্দ বলে | খ. রোজগার মন্দ
গ. কষ্টের কাজ | ঘ. অসহনীয় পেশা

৫৭. জয়গুন কার জন্য জলা-খেত থেকে শাপলার ফুল সংগ্রহ করে?

ক. উকিল বাবুর বউ | খ. রাজার মা
গ. রশীদ গৃহিণী | ঘ. গদু প্রধানের শেষ পক্ষের স্ত্রী

৫৮. 'উদলা নৌকা' বলতে বোঝায়–

ক. উন্মুক্ত বা ঢাকনাবিহীন নৌকা | খ. ঢাকনাযুক্ত নৌকা
গ. পাল তোলা নৌকা | ঘ. ছোট কোষা নৌকা

৫৯. মায়মুন বরপক্ষের নিকট হতে কী উপহার পেয়েছিল?

ক. বয়লা, গোলখাড়ু, নাকফুল, নোলক | খ. নাকসাবি, গোলখাড়ু, নাকফুল, নোলক
গ. গোলখাড়ু, জলচৌকি, নাকফুল, নোলক | ঘ. নোলক, গোলখাড়ু, চোখা রূপা, নাকফুল

৬০. সাধারণ মানুষের নিকট পাকিস্তানের স্বাধীনতা কোনরূপে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. বেবাক ফাঁটকি | খ. রেলের ভাড়া কমেছে
গ. অভাব নেই | ঘ. মানুষের আয় বেড়েছে

৬১. কাসুর কী অসুখ করেছিল?

ক. নিউমোনিয়া | খ. জ্বর
গ. কলেরা | ঘ. বসন্ত

৬২. মায়মুনকে শ্বশুরবাড়ির কেউ পছন্দ করেনি কেন?

ক. জালি বউ | খ. কপালের ফের
গ. দরিদ্র পরিবার | ঘ. যৌতুকের অপ্রাপ্যতা

৬৩. করিম বক্‌শ সূর্য-দীঘল বাড়ির কোনখানে থমকে দাঁড়ায়?

ক. তালগাছ তলায় | খ. ঈশান কোণে
গ. আমগাছতলায় | ঘ. বায়ুকোণে

৬৪. বাঘিনীর তেজ মিলিয়ে যায় কেন?

ক. করিম বক্‌শের কারণে | খ. কাসুর নাম শুনে
গ. মসজিদে ডিম দেয়ায় | ঘ. হাসু কদমা আনায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যুথির শ্বশুরবাড়িতে বিধবা ননদ ও তার মেয়ে রয়েছে যারা দিনরাত যুথিকে গঞ্জনা দেয়। ছোটলোক বলে গালি দেয়। যৌতুকের জন্য ইদানিং তাকে চাপও দিচ্ছে। শ্বশুর-শাশুড়ি আর সেইসঙ্গে বিধবা ননদের অত্যাচার সে আর সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে আসে।

৬৫. উদ্দীপকের চরিত্রটির সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. মায়মুন | খ. জয়গুন
গ. মেহেরন | ঘ. আঞ্জুমান

৬৬. এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে বিষয়ে–

i. অহংবোধে
ii. আচরণে
iii. সংকীর্ণতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. ii
গ. iii | ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন?
লালন বলে আমি আমার না জানি সন্ধান
বেদ পুরাণে করছে জারি, যবনের সাঁই হিন্দুর হরি,
এখনো আমি বুঝতে নারি সৃষ্টির সুরূপ কী প্রমাণ?

৬৭. উদ্দীপকের চেতনা 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. রমেশ ডাক্তার | খ. খুরশীদ মোল্লা
গ. জব্বর মুন্সী | ঘ. গদু প্রধান

৬৮. এরূপ চেতনা প্রকাশিত হয়েছে যে বাক্যে–

ক. হিন্দু-মুসলমান আপনজনের মতো কত যুগ ধরে কাটিয়েছে এ মাটিতে।
খ. একের ওপর নির্ভর করে বেঁচে উঠেছে আর একজন।
গ. আমি বুঝতে পারি না কিসের নেশায় যাচ্ছে এরা।
ঘ. এখানে আমরা মা-র কোলে আছি।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কালকেতু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি ব্যাধ চরিত্র। ভাত খেতে না পেয়ে সে বনের পশু ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। কখনো কখনো তার কপালে তাও জুটত না, তাই উপোস থাকতে হত অথবা বন্য কচু, ওল ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করত।

৬৯. উদ্দীপকের ব্যাধ চরিত্রটি 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. হাসু | খ. কাসু
গ. রমজান | ঘ. জহির

৭০. উদ্দীপক ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

i. আঙ্গিক নির্মাণে

ii. সমাজের চিত্রণে
iii. সৌন্দর্য সৃষ্টিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

অবশেষে যথাক্রমে খাবো: গাছপালা, নদী-নালা
গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাত, নর্দমার জলের প্রপাত,
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব-প্রধান নারী।
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি–
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ।
ভাত দে হারামজাদা, তা- না- হলে মানচিত্র খাবো।

ক. হাসুকে কে 'জামাই' বলতে শুরু করেছিল ?
খ. সূর্য-দীঘল বাড়ির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখুন।
গ. উদ্দীপকটি 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? – আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের সমকালীন সমাজকেও গ্রাস করেছে।" –মতামত দিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। আহ্লাদি নামক এক অসহায় তরুণীকে ঘিরে মাসি ও পিসি-র জীবনের করুণ কাহিনি এ গল্পের উপজীব্য। মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ বিশ্ব থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য যে বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে সেটাই গল্পটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুণ্ডা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আহ্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে দুই নিঃস্ব নারীর দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধ খুবই প্রশংসনীয়। দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতি, জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম, নারী হয়ে নৌকাচালনা ও সব্জির ব্যবসায় পরিচালনা প্রভৃতি এ গল্পের বৈচিত্র্যময় দিক।

ক. সবুজ নিশান কিসের আভাস দেয়?
খ. কীভাবে জয়গুনের সুখের স্বপ্ন সফল হয়?
গ. উদ্দীপকের মাসি-পিসি চরিত্রের সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে কে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের কঠোর জীবনসংগ্রাম 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসেরও উপজীব্য।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দির বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না।

ক. ফুড কমিটির সেক্রেটারি কে?
খ. শিন্নি পানসে হয়ে গেছে কেন? –ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত কেবল কষ্টই নয় 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসটি আনন্দময় জীবনেরও প্রতিচিত্র।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে,'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন।'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা– 'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?'
ভুখারি কহিল,'না বাবা!' মোল্লা হাঁকিল–'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত-রুটি নিয়ে মসজিদে দিল তালা।

ক. পঞ্চাশ সনে চাঁদ কীভাবে উঠেছিল?
খ. 'তার বারোমেসে রোজার যে অন্ত নেই।' –কেন?
গ. উদ্দীপকের মোল্লা 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে কোন চরিত্রের প্রতিনিধি? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের মূল ভাবনাই 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে অনুরণিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

নিমকহারাম বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল সে। ঘরের মাঝখানে এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে একসঙ্গে তালাক দিল সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইকা।

ক. গদু প্রধানের কতজন স্ত্রী রয়েছে?
খ. জয়গুন মায়মুনের চুল ছিঁড়তে চায় কেন?
গ. উদ্দীপকের আমেনা ও ফাতেমার সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে জয়গুনের জীবন কীভাবে সম্পৃক্ত? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের সমাজব্যবস্থা প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই প্রতিচ্ছবি।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

এক ধরনের উপন্যাস রয়েছে যা সমাজ জীবনের নানা বিষয়বস্তু, ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতকে অবলম্বন করে রচিত হয়। এতে মানবজীবনের সাথে একান্তভাবে জড়িত আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জীবনঘনিষ্ঠ উপস্থাপনা থাকে। এছাড়া পারিবারিক নানা বিষয় যেমন সহায়-সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতা, আর্থিক টানাপড়েন, সাংসারিক সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রীতি-প্রেম ইত্যাদি অবলম্বন করে এ ধরনের উপন্যাস লেখা হয়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই বাংলা সাহিত্যে এ ধারার প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা।

ক. 'জাগরী' উপন্যাসটি কার লেখা?
খ. আঞ্চলিক উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন ধরনের উপন্যাসকে নির্দেশ করে? –পঠিত রচনার আলোকে মতামত দিন।
ঘ. "উদ্দীপকে কেবল একটি বিশেষ ধারার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।" –আপনার পাঠ্য রচনা আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭

মাওলানা জাফরউল্লাহ এনায়েতপুরির কারামতের শেষ নেই। শরিয়ত মোতাবেক তার ঘরে তিনজন জেনানা আছেন, তবুও নারী জাতি তার দু'চোখের বিষ। নারীকে 'দোজখের আগুন' ফতোয়া দিয়ে তিনি তাদের থেকে দূরে থাকতে বলেন। কখনওবা নারীকে পুরুষের দাসী বর্ণনা করে তিনি কোরানের আয়াত তেলওয়াত করেন। তার মতে মহিলাদের চঞ্চলতা, হাসি, গলার আওয়াজ না-জায়েজ কাজ। ধর্মের ব্যাপারে মাওলানা এনায়েতপুরীর গলা বরাবরই সকলের উপরে।

ক. গোঙাবুড়ি কে?
খ. কাসু কীভাবে মায়ের চিন্তাটাকে মনের মধ্যে তাজা করত?

গ. উদ্দীপকের মাওলানা এনায়েতপুরির সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে ধর্মের আবরণে নারী-নির্যাতনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর উত্তর :

ক.

সবুজ নিশান নতুন জীবনের আভাস দেয়।

খ.

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে জয়গুনের সুখের স্বপ্ন সফল হয়।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের শেষ আমলে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া বিরাজ করছিল। এই দুর্ভিক্ষে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। ফলে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ঘিরে মানুষ স্বপ্ন দেখত। জয়গুনও নতুন দেশ পাকিস্তানকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেছিল। সে মনে করেছে পাকিস্তান হলে ভাত-কাপড় সস্তা হবে। কেউ না খেয়ে মরবে না। মানুষের আর দুঃখ থাকবে না। তাই পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তি জয়গুনের নিকট সুখের স্বপ্ন সফল হওয়া বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

গ.

উদ্দীপকের মাসি-পিসি'র সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের জয়গুন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

মানুষ অস্তিত্বশীল প্রাণী। সে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে। তাকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে অনেক কষ্ট ও দুঃখ স্বীকার করতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশে তাকে প্রতিনিয়তই হতাশ ও বিপর্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়। এর মধ্য দিয়েই মানুষ জীবনে আশার আলো দেখে। ভবিষ্যতের স্বপ্নের বীজ বোনে।

উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্র মাসি ও পিসি কঠিন জীবনসংগ্রামে লিপ্ত। তারা দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। মাসি ও পিসি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আল্লাদিকে রক্ষা করার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে। এক সময় তারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়। এই বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়গুনের জীবন যুদ্ধের সঙ্গে। পারিবারিক ভাঙ্গন আর আকাল উপন্যাসের জয়গুন এবং উদ্দীপকের মাসি-পিসিকে এনে দাঁড় করায় একই কাতারে। সংগ্রামী এই নারীরা নেমে পড়ে পঙ্কিল সমাজের কঠোর বাস্তবতার বিরুদ্ধে। জয়গুন সংগ্রাম করে মানব সমাজে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। এর পাশাপাশি সে নিজের সন্তান হাসু ও মায়মুনকে প্রতিনিয়ত বিরূপ বিশ্ব থেকে আগলে রাখে।

ঘ.

উদ্দীপকের কঠোর জীবন সংগ্রাম 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসেও অনুরণিত হয়েছে।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়। সংগ্রামশীলতাই মানবসমাজকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। সমাজের এই রূঢ়তা থেকে নারীরাও বিচ্ছিন্ন নয়। জীবনের ক্রূরতা তাদের ললিত মধুর রূপটি বদলে দেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অনেক সময়ই তারা নির্মমতার শিকার হয় । কিন্তু নিজেকে বা অন্যকে রক্ষা করতে গিয়ে তারা প্রায়ই সাহসী হয়ে উঠে।

উদ্দীপকে মাসি-পিসি'র জীবন সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। নির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে আর আকালের কারণে তারা জীবনযুদ্ধে নেমেছে। তারা সব্জি ক্রয় করে নৌকা চালিয়ে শহরে নিয়ে বিক্রি করে। এভাবে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। জীবনযুদ্ধে তারা পরাজিত হয়নি। এই একই চিত্র ফুটে উঠেছে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়গুনের জীবনচিত্রে। এ ছাড়া দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতি, জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠিন সংগ্রাম, নারী হয়ে নৌকাচালনা প্রভৃতি 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় দিক।

উদ্দীপকে মাসি ও পিসি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সমাজের বাধানিষেধ উপেক্ষা করে জীবন যুদ্ধে নেমে পড়ে। জীবন বাঁচাতে তারা নৌকা চালায়, শহরে সব্জি বিক্রি করে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের জয়গুনকেও উদ্দীপকের মাসি-পিসির মতো নৌকা চালিয়ে কাজে যেতে হয়। জয়গুনকেও বিরূপ বিশ্বে সন্তান হাসু, কাসু ও মায়মুনকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কঠোর জীবনসংগ্রাম 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসেরও উপজীব্য।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬ এর উত্তর :

ক.

'জাগরী' সতীনাথ ভাদুড়ির লেখা একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।

খ.

আঞ্চলিক উপন্যাস কোনো বিশেষ অঞ্চলের ব্যক্তি মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরে।

উপন্যাস লেখকের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতির রূপায়ণ। কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষ, তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা এবং ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে যে উপন্যাস রচিত হয় তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলে। আঞ্চলিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ অঞ্চলের ব্যক্তি ও সমাজ-মানসকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ.

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু সামাজিক উপন্যাসকে নির্দেশ করে।

উপন্যাস জীবনের খণ্ডাংশ নয়, সমগ্রতাকে ফুটিয়ে তোলে। যে উপন্যাসে সমাজই প্রধান অর্থাৎ ঔপন্যাসিক যে উপন্যাসে সমাজের বিষয়, কাহিনি, চরিত্র ও সামাজিক দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেন– তাই সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাসে এ সমাজের মানুষেরই আন্তঃসম্পর্ক, নানা টানাপড়েন ও বিচিত্র দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সাহিত্য জগতে এক শ্রেণির উপন্যাস রয়েছে যা সমাজ জীবনের নানা বিষয়বস্তু, ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতকে অবলম্বন করে রচিত হয়। এতে মানবজীবনের সাথে একান্তভাবে জড়িত আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি নানা বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া পরিবারের নানা জটিলতা, আর্থিক টানাপড়েন, সাংসারিক সুখ-দুঃখ ইত্যাদি এ ধরনের উপন্যাসের অন্যতম উপজীব্য। 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের আলোচনা অংশেও দেখা যায়, সামাজিক উপন্যাস সমাজকে অবলম্বন করে রচিত হয়। এ ধরনের উপন্যাসে সমাজের বিষয়, কাহিনি, চরিত্র ও সামাজিক দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের আলোচনা অংশের সামজিক উপন্যাসের পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ.

উদ্দীপকে কেবল একটি বিশেষ ধারার উপন্যাসের পরিচয় দেয়া হয়েছে, সামগ্রিক উপন্য সে শিল্পের পরিচয় ফুটে উঠেনি।

উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। এতে বাণীরূপ পায় জীবন ও জগতের প্রতিচ্ছবি। আর প্রতিফলিত হয় দেশ, কাল ও সমাজের বাস্তব চিত্র। পাঠক উপন্যাস পাঠে জীবনের রসমাধুর্য উপভোগ করেন। উপন্যাসের রসমাধুর্য পাঠককে তার পরিচিত জীবন ও চারপাশের জগৎকে নতুন রূপে তুলে ধরে।

উদ্দীপকে একটি বিশেষ ধারার উপন্যাসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এ ধরনের উপন্যাস রচয়িতা সমাজের বিষয়, কাহিনি, চরিত্র ও সামাজিক দ্বন্দ্বকে উপন্যাসে প্রাধান্য দেন। এ ধরনের উপন্যাসে সমাজের মাল-মসলা ও তথ্য-উপকরণের প্রাচুর্য থাকে। আর একেই ঔপন্যাসিক আরও সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। অন্যদিকে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের আলোচনা অংশে উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা হযেছে। এখানে উপন্যাসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গঠনশৈলী প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া উপন্যাসের প্রায়োগিক বিষয়ের বিশ্লেষণও রয়েছে।

উদ্দীপকে কেবল উপন্যাসের একটি ধারার পরিচয় রয়েছে। উপন্যাস-শিল্পের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের আলোচনা অংশে লেখকের জীবনদর্শনসহ সামগ্রিক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের আলোচনা অংশের সমগ্র ভাবটি প্রকাশিত হয়নি, একটিমাত্র বিষয় ফুটে উঠেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭ এর উত্তর :

ক.

গোঙাবুড়ি হচ্ছে কাসুকে ভয় দেখানোর জন্য একটি কল্পিত প্রাণী।

খ.

কাসু সূর্য-দীঘল বাড়ির লম্বা তালগাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে মায়ের চিন্তাটাকে তাজা করত।

সূর্য-দীঘল বাড়িতে মা থাকেন। সেখানে কাসুর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই সে বাড়ির উত্তর পাশটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সেখানে সে সূর্য-দীঘল বাড়ির তালগাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিত। ঐ তালগাছটা দেখে দেখে সে মনের মধ্যে মায়ের চিন্তাটাকে তাজা করে নিত। এভাবে কখনো কখনো কাসুর মনের মধ্যে মায়ের অভাব তীব্র হয়ে উঠত।

গ.

উদ্দীপকের মাওলানা এনায়েতপুরির সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের মসজিদের ইমাম সাহেবের চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় অনেক সময়ই নারীকে নানা অপমান ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। নারীকে নির্যাতিত হতে হয় কখনো ধর্মব্যবসায়ীর অপব্যাখ্যায়, কখনো সামাজিক বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে, আবার কখনো পুরুষের নিষ্ঠুর নির্যাতনে। এ সমাজ ঠুনকো অজুহাতে বিচার ডেকে, নিন্দা করে, তালাক দিয়ে নারীকে ঠেলে দেয় আস্তাকুঁড়ে। আবার বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অবরোধপ্রথার আবর্জনা নারীকে দেয় শারীরিক ও মানসিক পীড়ন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে মাওলানা জাফরউল্লাহ এনায়েতপুরির কেরামতের শেষ নেই। ইসলামি বিধান মোতাবেক তার ঘরে তিনজন স্ত্রী রয়েছে। তবুও নারী জাতিকে তিনি দু'চোখের বিষ মনে করেন। তার মতে নারী হচ্ছে দোজখের আগুন। অন্যদিকে দেখা যায়, 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে জুমার মসজিদের ইমাম সাহেব হাসুর কাছ থেকে ডিম নিতে অস্বীকার করেছেন। কেননা হাসুর মা জয়গুন বেপর্দা চলাফেরা করে এবং একা একাই ট্রেনে করে ময়মনসিংহ যায়। অবশ্য হাসুর পরিচয় জানা অবধি ডিম নিতে ইমাম সাহেবের আপত্তি ছিল না। বস্তুত ধর্মের অপব্যাখ্যায় ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের দিক থেকে মাওলানা এনায়েতপুরি এবং জুমার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে ধর্মের আবরণে সংগ্রামী নারীর অসহায়ত্ব ও নির্যাতনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

আমাদের সমাজে ধর্মব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম প্রায়ই চোখে পড়ে। নিজ স্বার্থ হাসিল করতে তারা কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা ধর্মের সুমহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ইচ্ছেমতো কাঁটাছেড়া করে। ধর্মব্যবসায়ীদের কারণে ধর্ম হয় মরণ ফাঁদ। এই ফাঁদ ফেলে তারা যুগ যুগ ধরে নারীর উপর চালায় অমানবিক নির্যাতন।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, মাওলানা জাফরউল্লাহ এনায়েতপুরি নারীকে দোজখের আগুন বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন এবং তাদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি নারীকে পুরুষের দাসী বলে বর্ণনা করেন। তার মতে মহিলাদের চঞ্চলতা, হাসি, গলার আওয়াজ ইত্যাদি ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। এভাবে তিনি নারীর স্বাভাবিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে দেখা যায়, 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে মসজিদে ডিম দিতে গিয়ে হাসুকে অপমানের শিকার হতে হয়েছে আর জয়গুন হয়েছে উপহাসের পাত্র । এমনকি মাওলানা সাহেব ও গদু প্রধানের অপচেষ্টায় মায়মুনের বিয়ে পর্যন্ত আটকে যায়। পরবর্তী সময়ে জয়গুন তওবা করলে এবং ভবিষ্যতে ঘরের বাইরে কাজ করতে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে মায়মুনের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

উদ্দীপক এবং 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের মাওলানা ও ইমাম সাহেবের ধর্মীয় ব্যাখ্যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে ইঙ্গিত করে। এদের ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণে নির্মমতার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। এই শ্রেণির লোকদের কারণে মানুষের সরল মন ভয় আর কুসংস্কারে ভরে যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে ধর্মের আবরণে নারী নির্যাতনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮

ফুলকলির স্বামী মারা গেলেন হঠাৎ করে। দুধের একটি সন্তান আছে তার। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নির্যাতনে সন্তানসহ সে বাপের বাড়ি চলে আসে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। আবার এদিকে বাপের বাড়ির আর্থিক অবস্থাও খুব একটা সুবিধাজনক নয়। তাই অন্যের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে ফুলকলিকে সংসার চালাতে হয়। স্বাস্থ্য ও যৌবন অটুট থাকলেও পুনরায় বিয়েতে তার আগ্রহ নেই। সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যৎ রচনাই এখন তার সর্ব সময়ের কামনা।

ক. গ্রামের লোকের কিসের উপর আস্থা নেই?

খ. রমেশ ডাক্তার বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে পারেননি কেন?

গ. উদ্দীপকের ফুলকলির সঙ্গে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে কার মিল রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে ভাগ্যাহত নারীর জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯

বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনি কহিছে জোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥

ক. করিম বক্‌শ কাসুকে কী দিতে চেয়েছে?

খ. জয়গুন কেন টিয়াঠুঁটে আমগাছটা বিক্রি করেছে?

গ. উদ্দীপকের ভাবার্থ 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে প্রকাশিত বাৎসল্য রস 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের মূল উপজীব্য।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০

আসপিয়া গরীব ঘরের একজন বৃদ্ধ নারী। বয়সের ভারে ন্যুব্জ। অসহায় অবস্থায় সে মৃত্যুর পথ গুনছে। একমাত্র ননদ ফাল্গুনি ছাড়া তিন কূলে তার আর কেউ নেই। ফাল্গুনির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হলেও দরিদ্র ভ্রাতৃবধূকে সে সাহায্য করে না। উপরন্তু আসপিয়াকে দেখলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। আসপিয়া মনে বড় কষ্ট পায়। ভাইয়ের স্ত্রী যেন ফাল্গুনির দুচোখের কাঁটা। মৃত্যুপথযাত্রী আসপিয়া বলে, এ রকম ননদ যেন আর কারও না হয়।

ক. সূর্য-দীঘল বাড়িতে কে ঢিল মেরেছিল?

খ. 'তারা এগিয়ে চলে।' –কেন? বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের আসপিয়া 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের ফাল্গুনির আচরণ 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের জয়গুনকে স্পর্শ করেনি।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

০১. ক	০২. ক	০৩. ক	০৪. খ	০৫. গ	০৬. ক	০৭. খ	০৮. ক	০৯. ক	১০. খ	১১. ক	১২. খ
১৩. ক	১৪. ক	১৫. ক	১৬. ক	১৭. ক	১৮. ক	১৯. ক	২০. খ	২১. খ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ক
২৫. গ	২৬. খ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. ক	৩০. খ	৩১. ক	৩২. ক	৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. ক	৩৬. ক
৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. ক	৪১. ক	৪২. ক	৪৩. ক	৪৪. খ	৪৫. গ	৪৬. ক	৪৭. গ	৪৮. ক
৪৯. ক	৫০. খ	৫১. ক	৫২. ঘ	৫৩. ক	৫৪. ক	৫৫. খ	৫৬. ক	৫৭. ক	৫৮. ক	৫৯. ক	৬০. ক
৬১. ক	৬২. ক	৬৩. ক	৬৪. খ	৬৫. ক	৬৬. ঘ	৬৭. ক	৬৮. ক	৬৯. ক	৭০. খ		

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

অডিও/ভিডিও

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–

আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর

ড. মো. চেঙ্গীশ খান	**মেহেরীন মুনজারীন রত্না**
সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা)	সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল : chenggish@gmail.com	ইমেইল : meherin2010.bou@gmail.com